সমাজবিজ্ঞান মহাসম্মেলন-২০০৭

রাষ্ট্র, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন

১৮-২০ জানুয়ারি ২০০৭



আয়োজক

সমাজবিজ্ঞান পরিচর্চা ও গবেষণা সংসদ এবং দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন

সমাজবিজ্ঞান মহাসম্মেলন-২০০৭

রাষ্ট্র, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন

১৮-২০ জানুয়ারি ২০০৭

আয়োজক

সমাজবিজ্ঞান পরিচর্চা ও গবেষণা সংসদ

এবং

দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন

সমাজবিজ্ঞান মহাসম্মেলন-২০০৭

রাষ্ট্র, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন

প্রকাশক :

অরুণাভ দাশগুপ্ত
দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন
এবং
শুভাশিস মুখোপাধ্যায়
সমাজবিজ্ঞান পরিচর্চা ও গবেষণা সংসদ

মুদ্রণ:
প্রজ্ঞা প্রকাশনী
৮, নরসিংহ লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সভাপতির শুভেচ্ছাবার্তা

দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন

অরুণাভ দাশগুপ্ত
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন-এ ১৮ থেকে ২০ জানুয়ারী ২০০৭ সমাজবিজ্ঞান পরিচর্চা ও গবেষণা সংসদ কলকাতার সহযোগিতায় যে সমাজবিজ্ঞান মহাসম্মেলন ২০০৭ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার সাফল্য আমাদের সকলের কাম্য। এই আলোচনাচক্রের বিষয়, 'রাষ্ট্র, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন'। চিত্তরঞ্জনের মত একটি প্রান্তিক শহরে যেখানে শিল্প সংস্কৃতির এক পরম্পরা বিদ্যমান, এই সুচিন্তিত আলোচনা সেখানে এক বার্তা বহন করবে। আশা করব সম্মেলনে আগত সকল বিশেষজ্ঞ এই সংস্কৃতির শহরে একাত্মতা অনুভব করবেন। এই সম্মেলনে এলাকার যে সমস্ত মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।

চিত্তরঞ্জন
১লা জানুয়ারি ২০০৭

অরুণাভ দাশগুপ্ত
সভাপতি
সমাজবিজ্ঞান মহাসম্মেলন

স্থানীয় সম্পাদকের বক্তব্য

একবিংশ শতাব্দীতে সমাজবিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই সমাজবিজ্ঞান পরিচর্চা ও গবেষণা সংসদ কলকাতা এবং দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন-এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় সমাজবিজ্ঞান মহাসম্মেলন ২০০৭ এর আয়োজন করা হয়েছে ১৮ থেকে ২০ জানুয়ারি ২০০৭ এই তিন দিন পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সমবেত হবেন বিজ্ঞানী, সমাজকর্মী, ভাষাবিজ্ঞানী এবং ছাত্রছাত্রীরা। জ্ঞানচর্চার অন্য যে কোন শাখার মত সমাজবিজ্ঞান চর্চাও যে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং এই চর্চার অধিকার সমাজমনস্ক যে কোন মানুষেরই আছে এই মতের শরিক হয়েই সংগঠক দুটি সংস্থা এই মহাসম্মেলনের আয়োজন করেছেন এবং অংশগ্রহণকারীরা এই অনুষ্ঠানে সমবেত হবেন। উচ্চ শিক্ষার অঙ্গনে বাংলা ভাষার যথাযথ প্রচলনের স্বার্থে এই ভাষাকেই মহাসম্মেলনে আলোচনা চক্রের মূল হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই প্রচেষ্টায় সংগঠক সংস্থাদ্বয় অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আশীর্বাদ ও সহযোগিতা লাভ করেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ। আন্তরিক চেষ্টা স্বত্ত্বেও অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

কল্যাণকুমার সান্যাল

স্থানীয় সম্পাদক

সমাজবিজ্ঞান মহাসম্মেলন-২০০৭

সমাজবিজ্ঞান পরিচর্চা ও গবেষণা সংসদ

২০০৬-০৮ সালের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি

সভাপতি	:	অধ্যাপক পবিত্র সরকার
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক বুদ্ধদেব চৌধুরী
	:	অধ্যাপক দেবী চ্যাটার্জী
সম্পাদক	:	শুভাশিস মুখার্জী
যুগ্ম-সম্পাদক	:	ড. সুমিতা সেন
		ড. প্রসেনজিৎ দেববর্মণ
কোষাধ্যক্ষ	:	ড. শুভায়ন বসু
সদস্য	:	শ্রীমতী পাঞ্চালী সেন
	:	ড. তীর্থঙ্কর ঘোষ
	:	ড. সুমিতা চৌধুরী
	:	মিঠু নাগ
	:	বিপ্লব চৌধুরী
	:	মেহবুবউল আলম

সমাজবিজ্ঞান মহাসম্মেলন ২০০৭

১৮-২০ জানুয়ারি

দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন

উপসমিতি সমূহ

১. শিক্ষা উপসমিতি
- ক. সত্যব্রত সেনগুপ্ত (আহ্বায়ক)
- খ. ভবতোষ কুণ্ডু
- গ. আবুল হোসেন

২. বাসস্থান উপসমিতি
- ক. নিমাই রায় (উপদেষ্টা)
- খ. মানব শীল (উপদেষ্টা)
- গ. সৌরীন্দ্র নাথ লাহিড়ী (আহ্বায়ক)
- ঘ. পূর্ণেন্দু কুমার দত্ত
- ঙ. মিঠু নাগ
- চ. কল্যাণ সান্যাল

৩. খাদ্য উপসমিতি
- ক. অজয় দাশগুপ্ত (উপদেষ্টা)
- খ. মধুসূদন ঘোষ (উপদেষ্টা)
- গ. অরুণ রায় (আহ্বায়ক)
- ঘ. বরুণ বসু
- ঙ. কল্যাণ সান্যাল
- চ. সাগর চন্দ্র ব্যানার্জী
- ছ. দুর্গাপদ মাল
- জ. অজয় দাস

৪. অর্থ উপসমিতি
- ক. বিপ্লব চৌধুরী (আহ্বায়ক)
- খ. বরুণ বসু
- গ. যুগল কিশোর রায়

৫. পরিবহন উপসমিতি
- ক. সুকান্ত দাস (উপদেষ্টা)
- খ. পূর্ণেন্দু কুমার দত্ত (আহ্বায়ক)
- গ. ক্ষেত্রনাথ রায়
- ঘ. শিবপ্রসাদ মণ্ডল

৬. অভ্যর্থনা উপসমিতি
- ক. বাসুদেব মণ্ডল (উপদেষ্টা)
- খ. মানব চক্রবর্তী (উপদেষ্টা)
- গ. প্রসূন রায় (উপদেষ্টা)
- ঘ. প্লাবন মজুমদার (উপদেষ্টা)
- ঙ. প্রশান্ত কুমার দত্ত (আহ্বায়ক)
- চ. দুর্গাপদ মাল
- ছ. সাগর চন্দ্র ব্যানার্জী
- জ. অপূর্ব কুমার রায়
- ঝ. সাগরিকা নন্দী

৭. সাস্কৃতিক উপসমিতি
- ক. অখিল মজুমদার (উপদেষ্টা)
- খ. স্বপন দে (উপদেষ্টা)
- গ. মিঠু নাগ (আহ্বায়ক)
- ঘ. মঞ্জুলিকা গুপ্তা
- ঙ. সাগর চন্দ্র ব্যানার্জী
- চ. নবনীতা সেনগুপ্ত

৮. প্রচার উপসমিতি
- ক. সুপ্রভাত বাগ্চী (আহ্বায়ক)
- খ. বিপ্লব চৌধুরী
- গ. প্রশান্ত কুমার দত্ত
- ঘ. মুনমুন ব্যানার্জী
- ঙ. শিবপ্রসাদ মণ্ডল

আর্থিক সহায়তায়

ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্সস
পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ইন্ডিয়ান স্কুল অফ সোসাল সায়েন্সস
আস্থা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বিশেষ সহায়তায়

ইন্ডিয়ান স্কুল অফ সোসাল সায়েন্সস
ম্যাকিনটস বার্ন লিমিটেড

যাদের প্রতি আমরা বিভিন্নভাবে কৃতজ্ঞ

ডঃ বৈদ্যনাথ রায়, শ্রীলতা ইনস্টিটিউট, বাসন্তী ইনস্টিটিউট, সুভাষ ঘোষ, সমর দাস, চরণজিৎ সিং, উমেশ ঝা, সুভাষ চন্দ্র মাঝি, সতীশ চন্দ্র মাহাতো, নীলমণি ধর, চূনীবাবু এবং পানুবাবু, আশাবরী সংস্থা এবং ফোক্ এর কর্মীবৃন্দ

প্রজ্ঞা প্রকাশনীর কর্মীবৃন্দ

সমাজবিজ্ঞান মহাসম্মেলন-২০০৭

আয়োজক : সমাজবিজ্ঞান পরিচর্চা ও গবেষণা সংসদ, কলকাতা এবং দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন

প্রথম দিন : ১৮ই জানুয়ারী, ২০০৭

৯.০০ — ১১.০০ : নিবন্ধীকরণ

১১.১৫ — ১২.১৫ : উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

স্বাগত বক্তব্য : অরুণাভ দাশগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন

সভাপতি : পবিত্র সরকার, সভাপতি, সমাজবিজ্ঞান পরিচর্চা ও গবেষণা সংসদ, কলকাতা

উদ্বোধক : রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধান অতিথি : বংশগোপাল চৌধুরী, মাননীয় সাংসদ, আসানসোল লোকসভা কেন্দ্র

: দিলীপ সরকার, মাননীয় বিধায়ক, বারাবনী বিধানসভা কেন্দ্র

: ষোড়শীমোহন দাঁ, মাননীয় নিবন্ধক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশেষ অতিথি : অলকেশ প্রসাদ রায়, মাননীয় সভাপতি, পরিচালন সমিতি, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয় ও মাননীয় মহকুমা শাসক, আসানসোল

: জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্

১২.২৫ — ১২.৩০ : চা-এর বিরতি

১২.৩০ — ২.০০ : পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন-১

বিষয় : রাষ্ট্র

সভাপতি : রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়,

সহসভাপতি : বসন্ত লস্কর

বক্তা : কুমার রাণা, প্রতীচী ট্রাষ্ট

বিষয় : বিভাজিত সমাজে উন্নয়ন প্রগতি : পশ্চিমবঙ্গের চিত্র

বক্তা : মনোহর মৌলি বিশ্বাস

বিষয় : জাতীয় উন্নয়নে সংরক্ষণের ফলিত প্রয়োগ

২.০০ — ২.৩০ : মধ্যাহ্ন ভোজন বিরতি

২.৩০ — ৪.০০ : পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন-২

বিষয় : উন্নয়ন

সভাপতি : পবিত্র সরকার

সহসভাপতি : কিশলয় চৌধুরী

বক্তা : স্বাতী ঘোষ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় : উন্নয়ন ও নারী

বক্তা : রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বিষয় : শিক্ষার মাধ্যমে উন্নয়ন

বক্তা : বিশ্বজিৎ ঘোষ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় : লিঙ্গ প্রগতি-সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গ

৪.০০ — ৪.১৫ : চা-এর বিরতি

৪.১৫ — ৫.৩০ : সমান্তরাল অধিবেশন-১, ২, ৩ এবং ৪

৫.৩০ — ৫.৪৫ : চা-এর বিরতি

৫.৪৫ — ৬.৪৫ : বিশেষ বক্তৃতা

সভাপতি : অরুণাভ দাশগুপ্ত

বক্তা : সন্তোষ রাণা

বিষয় : রাষ্ট্র, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন

৬.৪৫ — ৮.১৫ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

৮.৩০ — ৯.৩০ : রাতের খাবার

দ্বিতীয় দিন : ১৯ শে জানুয়ারী, ২০০৭

৯.৩০ — ১১.০০ : পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন-৩

বিষয় : গণতন্ত্র

সভাপতি : দেবী চট্টোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সহসভাপতি : বৈদ্যনাথ রায়

বক্তা : পার্থ রাহা, ইন্ডয়ান স্কুল অফ্ সোসাল সায়েন্সেস

বিষয় : সেনসরশিপ ও ভারতীয় গণতন্ত্র

বক্তা : অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় : বিশ্বায়ন ও ভারতীয় গণতন্ত্র

বক্তা : শুভেন্দু দাশগুপ্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় : গণতন্ত্র ও উন্নয়ন

১১.০০ — ১১.১৫ : চা-এর বিরতি

১১.১৫ — ১২.৪৫ : পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন-৪

বিষয় : রাষ্ট্র

সভাপতি : বুদ্ধদেব চৌধুরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সহ-সভাপতি : চঞ্চল মজুমদার

বক্তা : ইন্দ্রানী সান্যাল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

: ঈশিতা মুখোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় : লিঙ্গসাম্য উন্নয়ন ও বিশ্বায়ন

বক্তা : প্রভাত দত্ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় : রাষ্ট্র ও উন্নয়ন

১২.৪৫ — ১.৪৫ : মধ্যাহ্ন ভোজন বিরতি
১.৪৫ — ৩.৪৫ : সমান্তরাল অধিবেশন- ১, ২, ৩ এবং ৪
৩.৪৫ — ৪.০০ : চা-এর বিরতি
৪.০০ — ৫.০০ : বিশেষ বক্তৃতা
সভাপতি : মনোহর মৌলি বিশ্বাস
বক্তা : শ্রী বুদ্ধদেব চৌধুরী
৫.০০ — ৬.৩০ : আলোচনা চক্র
৬.৩০ — ৮.৩০ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
৮.৩০ — ৯.৩০০ : রাতের খাবার

তৃতীয় দিন : ২০ শে জানুয়ারী, ২০০৭

৯.৩০ — ১১.০০ : পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন-৫
বিষয় : গণতন্ত্র
সভাপতি : সুহাস চট্টোপাধ্যায়
সহ-সভাপতি : ভবতোষ কুণ্ডু
বক্তা : অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিষয় : গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র
বক্তা : বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
বিষয় : গণতন্ত্র ও উন্নয়ন
বক্তা : অঞ্জলি ঘোষ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
১১.০০ — ১১.১৫ : চা-এর বিরতি

১১.১৫ — ১২.৪৫ : পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন-৬
বিষয় : উন্নয়ন
সভাপতি : শ্রী বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়
সহ-সভাপতি : শ্রী অঞ্জলি ঘোষ
বক্তা : আনু মহম্মদ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
: শ্রী দীপঙ্কর চক্রবর্তী
বিষয় : ভারতে মানবাধিকারের ধারণার বিবর্তন
১২.৪৫ — ১.৩০ : মধ্যাহ্ন ভোজন বিরতি
১.৩০ — ২.৪৫ : সমান্তরাল অধিবেশন-১, ২, ৩ এবং ৪
২.৪৫ — ৩.৩০ : সমাপ্তি অনুষ্ঠান
বক্তা : অমিত মল্লিক, মাননীয় উপাচার্য, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ধন্যবাদ জ্ঞাপন : শুভাশিস মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক : সমাজবিজ্ঞান পরিচর্চা ও গবেষণা সংসদ, কলকাতা
স্থানীয় সম্পাদক : কল্যাণ সান্যাল, সমাজবিজ্ঞান মহাসম্মেলন ২০০৭
সমাপ্তি ভাষণ : অরুণাভ দাশগুপ্ত, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়

সার সংকলন

দারিদ্র্য, পরিবেশ— কল্যাণমূলক ভূগোলের গুরুত্ব

ব্রততী দে
রমানাথ কবিরাজ লেন

ভূগোল তথা ভৌগোলিক অনুসন্ধানের প্রয়াস— সমসাময়িক পরিস্থির সমস্যা বিশ্লেষণ এবং সমাধান, অর্থাৎ পথ দেখানো। সাম্প্রতিক চেতনায় যে সব সমস্যা ধরা পড়েছে ভূগোল তার সঠিক উত্তর দিতে পারছে কিনা, সুরাহার পথ দেখাতে পারছে কিনা এ নিয়ে ভৌগোলিকেরা বারে বারেই প্রশ্ন তুলেছেন। প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আত্মানুসন্ধান এবং আত্মসমীক্ষা শুরু করেছেন অতীত যুগ থেকে যা আজও অব্যাহত।

ভৌগোলিক অনুসন্ধানের দৃষ্টিভঙ্গী

ভৌগোলিক অনুসন্ধানের বিষয়টি বিভিন্ন খোলসে আবৃত— তাই দেশ-কাল পাত্রের ভেদে পরিবর্তিত হয়েছে এর শাখা, এর রূপ। ষাটের দশকের পর থেকে ভৌগোলিক চিন্তাধারায় এক বৃহত্তর পরিবর্তন আসে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত যে কোন বিষয় বিশ্লেষণে সংখ্যাতত্ত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু এর পর যে বিপরীতমুখী স্রোত আসে তার মধ্যে গুরুত্ব পায়— 'প্রাসঙ্গিকতা' (Relevance) শব্দটি। রুস মিচেল 'প্রাসঙ্গিকতা' শব্দটির সংজ্ঞা দেন : সামাজিক সমস্যাগুলির বিষয়ে ব্যবহারিক তাৎপর্য আছে এমন গবেষণাকে প্রাসঙ্গিক বলা চলে।

পরবর্তী '৭০ দশকের কালে নতুন চিন্তাভাবনার লক্ষ্য হল— মানুষ। ফলে ধারণার পরিবর্তিত রূপ এল— "How man lives where he lives to-থেকে এল How man lives and why he lives so. নিয়ন্ত্রণবাদের শক্ত মোড়ক ক্রমে শিথিল হয়ে এল। মানুষের জীবনধারণের মান হয়ে পড়ল গবেষণার মূল বিষয়।

বিষয় নির্বাচনের প্রাসঙ্গিকতা

ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যের খাতি বিগত কয়েক শতাব্দীতে অনেকটাই বদলেছে। বাইরের পৃথিবীতে পরিচয় দারিদ্র্য, অনাহার, অপুষ্টি ইত্যাদি। তাই প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক কিভাবে কোন পথে দেশটা চলছে। তাই দারিদ্র্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর সাথেই গুরুত্বপূর্ণ জীবনধারণের মান, যা দারিদ্র্য নির্ধারণের মাধ্যমে চিহ্নিত। যখনই জীবনধারণের এই বিশ্লেষণে প্রকট হয় বৈষম্য খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে সামাজিক জীবনকুশলতা (Social well being) বা সামাজিক ন্যায় (Social justice)-এর প্রশ্নটি। ফলে অবসম্ভাবী হয়ে ওঠে জনকল্যাণ (welfare) চিন্তাধারাটি।

এই জীবনধারণের মান একই সাথে নির্ভর করে পরিবেশের ওপর তা সে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক যে কোন পরিবেশই হোক না কেন, এর প্রভাব কতটা এবং বৈষম্যের চিত্রটি কেমন তার সমাধান করতে গিয়েই এসে পড়ে উন্নয়ন। বলা ভালো জীবনধারণের মানোন্নয়নের প্রশ্নটি।

সুতরাং, দারিদ্র, তার সাথে পরিবেশের সম্পর্ক এবং উন্নয়নে কল্যাণমুখী ভূগোলের ভূমিকা কতটা সেটাই মূল আলোচনার বিষয়।

ভূগোল এবং সামাজিক জীবনকুশলতা

সামাজিক জীবনকুশলতা একটা অবস্থান, যা জড়িয়ে আছে কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে এবং লক্ষ্য রাখে জীবনযাত্রার হিতাহিতের দিকে। অর্থাৎ কুশল জীবনযাপন এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

জীবনকুশলতা একটি আর্থিক অবস্থা যা মানুষের ন্যূনতম চাহিদাকে পূরণ করতে পারে। এই মৌলিক চাহিদাকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ (প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক) দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়। তবে স্থান ও সময় অনুসারে দারিদ্র্যের স্তর এবং সামাজিক জীবনকুশলতার দিক উভয়ই বদলে যায়।

সুতরাং স্থান, কাল-এর বদল অনুসারে কল্যাণমূলক ভূমিকারও বদল ঘটে। দারিদ্র্য এবং পরিবেশ আলোচনায়— সামাজিক জীবনকুশলতা এবং সমান ভূমিকা (equality) ভৌগোলিক অন্বেষার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

দারিদ্র্য এবং পরিবেশ

আলোচনার বিষয়বস্তু যেহেতু জীবনধারণের মাপকাঠির সাথে বিশেষভাবে জড়িত তাই 'দারিদ্র্য' শব্দটি ভীষণই ব্যঞ্জনাময়। বহু ভৌগোলিকই স্থানভেদে দারিদ্র্য এবং Social well being এর বহু দিক নিয়ে গবেষণা করেছে। ফলে সামাজিক ভূগোলে বারে বারেই গুরুত্ব পেয়েছে পরিবেশ। এই আলোচনায় তাই প্রতিটি উপাদানের আন্তঃসম্পর্ক গুরুত্ব পেয়েছে।

কল্যাণমূলক ভূগোল

'৭০ দশকের পর ভূগোলের একটি নতুন শাখার ওপর জোর দেওয়া হয় তা হল কল্যাণমূলক ভূগোল। বর্তমান অংশে আমাদের যে দুটি উপাদানের সাথে ভূগোলের এই দৃষ্টিভঙ্গী জড়িত, সেখানে গুরুত্ব পাবে :

- সামাজিক উপকরণগুলি কিভাবে বণ্টিত
- আয়ের বণ্টনে সাম্য আছে কিনা
- দারিদ্র্যের তীব্রতা ও বণ্টন কিরূপ

কল্যাণমূলক ভূগোলের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে সামাজিক কল্যাণ (Social welfare)-এর বিষয়টি। তাই সামাজিক অবস্থার (যেমন জীবনযাত্রার মান) দৈনিক বণ্টন সমীক্ষা করার ওপর জোর দেওয়ার পরিবর্তে গুরুত্ব দেওয়া হয় কোন সামাজিক শ্রেণী কিরকম— সামাজিক অবস্থায় আছে তার উপরে। অবশ্যই তা নির্ভর করবে—

● বর্ণনা ● ব্যখ্যা ● মূল্যায়ন ● অধ্যাদেশ (Perception)

● কার্যসম্পাদন (implementation)-এর উপর

সমাজের বৈষম্য আলোচনার মূল বিষয়। তাই দারিদ্র্য এবং পরিবেশ উভয়ের সাপেক্ষে সামগ্রিক সমাজের চিত্রটিই এখান গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচ্য বিষয়সমূহ

● সমসাময়িক পরিস্থিতিতে ভৌগোলিক অনুসন্ধিৎসা

● এই গবেষণা কোন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে রচিত

● গবেষণার মূল উপাদানগুলি— দারিদ্র্য, পরিবেশ এবং কল্যাণমূলক ভূগোল

● সামাজিক অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র্য যার সাথে জড়িত জীবনকুশলতা (well being) এবং সামাজিক ন্যায় (social justice) এর প্রশ্নটি

● সুতরাং দারিদ্র্য পরিমাপ বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে যাতে সামাজিক বৈষম্যের (Social inequality) চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

● মানব সম্পদ উন্নয়নের সমীক্ষার ফল দ্বারা বাস্তব চিত্রের বিশ্লেষণ।

● স্থান এবং কাল (Time and Space)-এর উদাহরণ সহ বৈষম্যের উদাহরণ।

● উপরোক্ত বিষয়টি প্রমাণ করে পরিবেশের গুরুত্বকে

● দারিদ্র্যের সাথে পরিবেশের এই আন্তঃসম্পর্ক নির্ধারিত হবে কিছু indices-এর মাধ্যমে— পুষ্টি, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি যেগুলি আরো উপরিভাগে আলোচিত হবে।

● সামাজিক জীবনকুশলতার আঞ্চলিক বৈষম্যের চিত্রটিই (areas differentiation) এখানে উল্লেখযোগ্য।

● এখানেই কল্যাণমূলক ভূগোলের অনুসন্ধান তথা সমাধানের সার্থকতা।

● পরিশেষে কল্যাণমূলক ভূগোলের আগের এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনামূলক আলোচনায় একই সাথে ধরা পড়বে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের অবস্থা।

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের তাৎপর্য

অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্সটিটিউট অফ এডুকেশন (পি.জি.) ফর উইমেন, চন্দননগর

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র পর্যায়ে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান ছিল একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের প্রকৃতি ছিল ভারতে ঘটে যাওয়া অন্যান্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানগুলির থেকে পৃথক। এটি ঘটেছিল এমন এক সময়ে যখন পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, সোভিয়েত রাশিয়ায় অভ্যুদয় হয়েছে কমিউনিজমের। ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছে কংগ্রেস। এই অবস্থায় চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের প্রকৃতি ও পরবর্তী কার্যধারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক নূতন প্রবাহ নিয়ে আসে যাতে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির সমর্থন উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে। সশস্ত্র জনযুদ্ধের আদর্শ গেরিলা সংগ্রামে রূপ পায়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কৃষকশ্রেণি এই বিদ্রোহে যোগদান করে। ৭০ স্কোয়ার মাইল এলাকা জুড়ে তৈরি হয় মুক্তাঞ্চল। বুদ্ধিজীবী শ্রেণি থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করে। চট্টগ্রামে বুদ্ধিজীবি শ্রেণির সঙ্গে ব্রিটিশ শক্তির রাজনৈতিক মতাদর্শগত সংগ্রামের আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল অর্থনৈতিক সংঘাত যা বিপ্লবের পটভূমি আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্থনৈতিক সংঘাত সামাজিক সংঘাতে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল।

চট্টগ্রামে উপনেবেশিক শাসনে বিদেশী পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে সমাজ জীবন, শিল্প, কৃষি, প্রভৃতির উপর তীব্র চাপের সৃষ্টি হয়। পরিবর্তন ঘটতে থাকে সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যা ক্রমশ পেটি বুর্জোয়া ও কৃষক উভয় শ্রেণিকেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যুদ্ধে উৎসাহ দেয়। চট্টগ্রামে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ শুরু হয়ে যায়। শিল্প ব্যবসায়ী ছাড়া জমিকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে একটি ছোট জোতদার শ্রেণি বিকশিত হয়। অহিংস গণ আন্দোলন পরিচালনায় চট্টগ্রামে কংগ্রেস অগ্রণী হলেও ধীরে ধীরে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ সশস্ত্র বিপ্লবীদের হাতে চলে যায়। কংগ্রেসি আন্দোলনের পাশাপাশি গোপনে চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবী দল যে সমস্ত বিপ্লবের আয়োজন করে তা নিছক সন্ত্রাসবাদ ছিল না। ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি ছেড়ে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল সশস্ত্র জনযুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিল এবং এ কাজে কৃষক শ্রেণির সাহায্য এমনকী সম্ভব হলে বার্মার বিদ্রোহীদের (থারওয়ার্ডি) সাহায্য নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। চট্টগ্রামে অভ্যুত্থানের আগে গ্রামের ঘাঁটি এলাকা তৈরির কাজ চলছিল এবং পরে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল গ্রাম থেকেই, সঙ্গী ছিল কৃষকশ্রেণি। পেটি বুর্জোয়া নেতৃত্বে কৃষক সমর্থনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ছিল চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগ্রাম। এই সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদী সরকার উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

দেশী ও বিদেশী পুঁজির সংঘর্ষ, শ্রেণিগত সংঘর্ষ, শিল্পগত সংঘর্ষ যে সামাজিক ক্ষোভের জন্ম দেয়, সেই ক্ষোভে সামিল হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান দুই পক্ষই। ফলে ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থান হিন্দু মুসলমান যৌথ লড়াই হয়ে দাঁড়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। শুধু হিন্দু মুসলমান নয় বৌদ্ধরাও এতে সামিল হয়েছিল।

চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের মডেলকে অনেকে আইরিশ বিপ্লবের মডেল বলেছেন কিন্তু এটি আইরিশ বিপ্লবের মডেল ছিল না। এই বিপ্লবের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রকৃতি ক্রমশ একটা বিবর্তনের পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই বিবর্তনের পরিণতিতে মাষ্টারদা কমিউনিষ্ট সাহিত্য পড়তে শুরু করেছিলেন। আরও পরে মতাদর্শগত বিবর্তন চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের বিপ্লবীদের অধিকাংশকেই মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। চট্টগ্রাম

অভ্যুত্থানের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গেলে পুঁজির সংঘর্ষের পাশাপাশি বিশেষ করে আলোচনা করা উচিত জমি সমস্যা নিয়ে। বাংলায় কৃষক শ্রেণির অবস্থার সঙ্গে আয়ার্ল্যান্ডের কৃষকদের অবস্থার অনেকটা মিল ছিল। জমিদারদের সঙ্গে জমির সম্পর্ক ছিল না। মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি, ফলে ক্রমাগত খাজনা বাড়তো, কৃষক উচ্ছেদ হত, দুর্ভিক্ষ ও কৃষকবিদ্রোহ হতো এবং ইংরেজ ও আইরিশ জমিদারদের সাহায্য করতো ব্রিটিশ সরকার। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল কৃষকেরা। এঙ্গেলস আর্যাল্যান্ড প্রসঙ্গে বলেছিলেন আর্যাল্যান্ডে হোম-রুল ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেকটা শক্তি এসেছে জমির লড়াই থেকে। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় যে জমি সমস্যা থেকে শাসকশ্রেণির বিক্ষোভ এখানে অন্য একটি মাত্রা পেয়েছিল। কৃষক ও ছোট জোতদারদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে সামিল হওয়া তাই স্বাভাবিক ছিল চট্টগ্রামে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে জমিদারী এস্টেটগুলির ভাঙন ও তার ইতিহাস এবং Land Revenue কমিশনগুলির রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখলে এটা বোঝা যাবে। কৃষক এবং ছোট জোতদার ছাড়া সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘর, শ্রমিক শ্রেণি কৃষক শ্রেণি থেকে বহু যুবক ও কিশোর এই আন্দোলনে যোগ দেয়। সক্রিয়ভাবে যোগদানকারী প্রথম শ্রেণির বিপ্লবীদের নামের তালিকা দেখলে এটা আরও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়।

অনুশীলন যুগান্তর দল ছাড়া বাংলায় অন্যান্য যে সব গুপ্ত সমিতিগুলি ছিড় চট্টগ্রাম বিদ্রোহীরা ঐসব গুপ্ত সমিতির পথ বর্জন করে। ব্যক্তিহত্যা নয় সশস্ত্র গণসংগ্রামই ছিল এর অভিষ্ট। গ্রামকে আশ্রয় করে, গ্রামীণ মানুষকে আশ্রয় করে জনযুদ্ধের যে ইতিহাস চট্টগ্রামের বুকে রচিত হয়েছিল তা সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলির সামনে এক নতুন ইশারা দিয়েছিল। এর আগে বাংলার কোন গুপ্ত বিপ্লবী দল এ ধরনের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালাতে পারে নি বরং সাধারণ শ্রমিক কৃষকদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব বজায় ছিল। I.R.A. (Indian Republican Army)-এর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা রেভলিউশনারী কাউন্সিল গড়ে তোলে তা দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র জনযুদ্ধের পথ নেয়। আন্দোলনের ধারাপথে শোষিত শ্রেণির সঙ্গে কৃষক সমাজের সঙ্গে থেকে দীর্ঘদিন গেরিলাযুদ্ধ চালাতে চালাতে মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদী যুবকদের বুর্জোয়া শ্রেণীচরিত্র ক্রমশ পাল্টে যায় তাঁরা মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। আদর্শ হিসাবে তাঁরা চিন ও রাশিয়ার যুবসমাজের বিপ্লবী আদর্শকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। বুর্জোয়া নেতৃত্বে এ অভ্যুত্থান শুরু হলেও তা শেষে কৃষক শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত জনতার অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত দিয়েছিল। চট্টগ্রামে কমিউনিষ্ট পার্টি ও মার্কসবাদী কৃষক আন্দোলনের বীজ থেকে দেখা দিয়েছিল সাম্যবাদের চেতনার অঙ্কুর।

গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আসানসোলের বস্তিবাসী

ড. সন্দীপ ঘটক
আসানসোল গার্লস কলেজ

গণতন্ত্র ও অধিকার দুটি পরস্পর যুক্ত ধারণা। গণতন্ত্রের ভিত্তিই হল অধিকার। তাই গণতন্ত্রের সাফল্যও কার্যকারিতা উভয়ই নির্ভর করে অধিকারের উপর। এই কারণেই অধ্যাপক ল্যাস্কির অভিমত হল যে, একটি রাষ্ট্র পরিচিতি লাভ করে অধিকার প্রতিপালনের মধ্যে দিয়েই। গণতন্ত্রের মুক্ত পরিবেশেই মানুষ তাঁর মর্যাদা লাভ করে আর অধিকার ভোগের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, খুঁজে পায় তার জীবনের প্রকৃত অর্থ। কেবল অন্ন-সংস্থান করতে পারলেই মানুষ মানুষের মতো বাঁচতে পারে না। মানুষ হিসাবে তাকে বাঁচতে হলে এমন একটি সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন যেখানে সে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মোপলব্ধি করতে পারে। এই কারণেই মানবাধিকারের প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব।

মানবাধিকার বলতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-নির্ধন, নারী-পুরুষ প্রভৃতি নির্বিশেষে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহকে বোঝায়। দীর্ঘ ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে বর্তমানে মানবাধিকার এক সংহত রূপ লাভ করেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যত এমন কতকগুলি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল, যেগুলির মাধ্যমে মানবাধিকারের ধারণা পরিপুষ্ট লাভ করেছিল। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি হল—১২১৫ সালের মহাসনদ, ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদনপত্র, ব্রিটিশদের অধিকারের বিল, ১৬৮৯ সালের গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লব, ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব প্রভৃতি। পরিশেষে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় রাষ্ট্রসংঘের সাধারণসভায় গৃহীত মানবাধিকার-সংক্রান্ত বিশ্বঘোষণা-পত্রের মধ্য দিয়ে।

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা নগর পরিকল্পনার পরিমার্জন ঘটাচ্ছি। ঝাঁ-চকচকে প্রশস্ত রাস্তা, শপিং মল, মাল্টি কমপ্লেক্স বিল্ডিং, আই.টি. পার্ক প্রভৃতি বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে সাজিয়ে তুলছে আমাদের নগরগুলিকে। ঠিক তারই পাশে নগরগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে বসবাসকারী বস্তিবাসীরা বয়ে নিয়ে চলেছে এক অমানবিক করুণ জীবন। আসানসোলের সমগ্র জনগণের ৩৭.৬৮ শতাংশ হল বস্তিবাসী। এই বস্তিবাসীরাই আসানসোলের অসংগঠিত শিল্পে শ্রমিক যোগানের মূল সূত্র। এদের কেউ বা আমাদের মা, কেউ বা আমাদের ভাই, আবার কেউ বা বোন। দীর্ঘ দিন ধরে এদের সাথে আসানসোলের যোগসূত্র। কিন্তু তবুও তাদের জীবন চরম অনিশ্চয়তা-পূর্ণ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এমন কি পরিশ্রুত পানীয় জল প্রাপ্তির হাজার যোজন দূরে আসানসোলের বস্তিবাসীরা।

এই প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণাপত্রে যে বিষয়টি আলোচনা করা হবে তা হল ভারতের মতো এই বিশাল গণতান্ত্রিক দেশে আসানসোলের বস্তিবাসীরা মানবাধিকার অর্জনে কতটা সমর্থ হয়েছে এবং এই গণতান্ত্রিক দেশ তাদের কাছে কতটুকু মানবাধিকার পৌছে দিতে পেরেছে।

সমাজ জীবনে যৌন রোগের প্রভাব

মহুয়া বাগচি মিত্র

S.T.D অর্থাৎ Sexually Transmitted Diseases বা যৌন রোগ, এটি মূলত এক সংক্রামক ব্যাধি যা যৌনাঙ্গ থেকে ছড়ায়। রোগ অনেক ধরনের হয়। প্রধান লক্ষণীয় যৌন রোগ গুলি হল :

1 (Ano Genital Ulcer)
অ্যানো জেনিটাল আলসার

(Syphilys) সিফিলিস | (Chancriod) স্যাঙ্করেড | (Granuloma venereum) গ্রানুলোমা ভেনেরিয়াম | (Lympho Granuloma) লিম্ফো গ্র্যানুলোমা | (Herpes Progenetali) হারপিস প্রগনেটালি

2 (Genital Urethral Ulcer)
জেনিটাল/ইউরেথ্রাল আলসার

(Gonorrhoea) গনরিয়া | (Chlamydial) ক্ল্যামাইডিয়াল | (Trichomoniasis) ট্রাইকোমোনিয়াসিস | (Bacterial vaginasis) ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজাইনাসিস(| (Candidiasis) ক্যানডিডিয়াসিস(

(3) (Ano Genital wart) → (Candy lome Acuminate)
অ্যানো জেনিটাল ওয়ার্ট → ক্যানডিলোম আকুমিনেট

(4) (Inguinal Bubo) → (Lympho granuloma)
ইনগুইনাল বিউবো → লিম্ফো গ্রানুলোমা

● এই যৌন রোগগুলির মধ্যে কতকগুলি আছে সারার যোগ্য আবার কতকগুলি সারে না যেমন HIV. Hepatitias B, Scabish এমন কতকগুলি যৌন রোগ যেগুলি নির্মূল করা যায় না বা বেশ সময় সাপেক্ষ।

● এই রোগ রক্ত পরিবর্তনের (Blood transfusion) এর মাধ্যমেও হতে পারে।

● এইবার আসা যাক S.T.D ক্লিনিক এবং সমাজজীবন তার ভূমিকা সম্পর্কে।

যে সমস্ত পুরুষেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় অতি অসংযমী জীবনযাপন (Hign-Risk Behaviour) করে থাকেন। বিশেষ করে যুব সম্প্রদায় শিক্ষার অভাবে, স্বাস্থ্য সচেতনতারর অভাবে অধিক নারীর সাথে মিলিত হয় শারিরীক ভবে তাদের মধ্যে যৌন রোগের সম্ভাবনা প্রবল থাকে। এরাও কিন্তু কেউ বিশেষভাবে ক্লিনিক এ early stage-এ আসে না। এর ফলে রোগটি সারার সম্ভাবনা কমতে থাকে। এরা নিজেদের যৌন রোগ সম্বন্ধে না জানার বা কম জানার প্রভাবে সমাজের বিভিন্ন অংশে রোগটি ছড়াতে থাকে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে চিত্রটি একটু অন্যরকম। তারা পুরুষ সঙ্গীর থেকেই হোক বা স্বাস্থ্য সচেতনতা কম থাকার জন্যই হোক, নিজেদের গোপন রোগ সম্বন্ধে বাড়িতে আলোচনা করেন কম এবং কিছু ক্ষেত্রে বাড়িতে জানালেও তা অগ্রাহ্য করা হয়। মহিলাদের শারীরিক গঠনগত কারণ কিছু কিছু যৌন রোগ যেমন Cervics-এ Ulcer বা Wart যা সরাসরি পুরুষ সঙ্গীটির থেকে আসে তার কোন Symptoms না থাকায় দীর্ঘদিনের অবহেলায় তা Cancer-এ পরিণত হয়।

আবার অনেকক্ষেত্রে Syphilis মহিলাদের প্রথম অবস্থায় ধরা না পড়ায় তাদের বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয় যা একটি মহিলাকে তার সমাজে বাঁজা আখ্যা দিয়ে একঘরে করে দেওয়া হয়। সে স্বামীর দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে বিতাড়িত হয়ে দেহব্যবসায়ী হতে বাধ্য হয়। তার বা তার সন্তানের আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য।

পরিসংখ্যান বলছে ১৫-৪৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ১৫% হচ্ছে কোন না কোন যৌন রোগে অক্রান্ত।

HIV একটি অন্যতম যৌন রোগ যা অন্যান্য যৌন রোগের মত নিরূপণ করা যায় না দেখে। এটি Counselling করে, রক্ত পরীক্ষা করে তবেই ধরা পড়ে এবং এটিই সবচেয়ে বড় সামাজিক ব্যাধি আজকে। HIV ৯০% হয় যৌনক্রিয়ার দ্বারা। HIV সংক্রামক রোগীর মধ্যে ২০০৩-এর NACO রিপোর্ট অনুযায়ী মোট জনসাধারণের ১৪.৯৩ লাখ যৌন রোগী।

পরিসংখ্যানগত ভাষায় প্রত্যেক বছরে ৪ কোটি New S.T.D Case হচ্ছে যা সামাজিক ভাবে এক ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে বিশ্ব জুড়ে। NACO-র ২০০৩ রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষের পুরুষ যৌন রোগীর সংখ্যা ৯.৩০ লাখ, মহিলা ৬.২০ লাখ মোট ১৫.৫০ লাখ।

সরকার সচেতনতার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যেমন, ব্লক স্তরে গিয়ে সচেতন করা, প্রচারপত্র বিলি করা, জেলায় জেলায় Voluntury Counselling and Testing Centre (V.C.T.C) গড়ে তোলা, বিদ্যালয় পাঠক্রমের মধ্যে জীবনশৈলী (Sex Education) বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয় আমাদের কিছু দায়বদ্ধতা থাকে সমাজের

প্রতি। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তারা যদি আরো বেশী করে তৃণমূল স্তরে গিয়ে মানুষকে বোঝাতে পারেন যে যৌন রোগ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার দিন আর নেই, আমাদের সবাইকে পরবর্তী প্রজন্মকে একটি সুস্থ সমাজ উপহার দেবার জন্য S.T.D Clinic সম্বন্ধে আরো বেশী করে জানা দরকার।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

- Sexually Transmitted Infections and AIDS in the Tropics— O.P. Arya and C.A. Hart.
- Dr Sankar Kumar Dey— M.O.I.C S.T.D Clinic and Technical Co-Ordinator AIDS Hooghly District Hospital.

আসানসোল রাণীগঞ্জ কয়লা খনি ও বিপন্ন মানুষ— এক ঝলক

শংকর চট্টরাজ

ই-২/৪ কোন্নগর আবাসন সমবায় কমিতি

'রিও-ডি-জেনিরো'-র পরিবেশ মহাসম্মেলনের থেকে অনেকটা রাস্তা হেঁটে এলেও আমরা এখনও কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন না পরিবেশ বহতা (Sustainable)। পৃথিবীর সুস্থতার মূল্যের নিরিখে অপ্রতুল উন্নয়ন কোন দিনই টিকে থাকতে পারে না। ক্রমাগত প্রকৃতিকে শোষণ করে সম্পদ আহরণের চেষ্টা ধাক্কা খাবেই। খনি থেকে সম্পদ সংগ্রহের ঘটনা হল মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু সবসময়ই সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্যের কাছে প্রকৃতির অবস্থান হার মেনেছে। তার ফলও আমরা হাতেনাতে পাচ্ছি।

নতুন যুগের সামনে দাঁড়িয়ে শিল্পায়নের গতিকে ঘুরিয়ে দেওয়া কখনই ইতিবাচক পদক্ষেপ নয়। পরিবেশেব সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনীতির এগিয়ে চলাই হল লাভজনক পদক্ষেপ। সেক্ষেত্রে পরিবেশেব কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। পরিবেশের প্রাথমিক উপাদানগুলি যথা— ভূমি, বায়ু এবং জলের যথেচ্ছ ব্যবহারে গাছপালাহীন স্থলভাগ এবং মরুভূমির মত প্রকৃতি তৈরী, ভূমিক্ষয়, দূষণকারী গ্যাসের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র জলবায়ু অঞ্চলের পরিবর্তন, জলচক্রের বিকৃতি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের স্থানান্তরণ ও বিলুপ্তি ইত্যাদি ঘটা পরিবেশকে ক্রমশ বিরল জীববৈচিত্র পূর্ণ করে তুলছে যার ফল সামগ্রিক পরিবেশের বিনাশ।

এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হেলে মানুষকে নিজেকেই সচেতন হতে হবে এবং পরিবেশ সচেতনতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে যদিও ইতিমধ্যে অনেকটাই ক্ষতি হয়ে গেছে।

শিল্পাঞ্চল ও খনি অঞ্চলে এই পরিস্থিতি অতি ভয়াবহ। সবেমাত্র শেষ দশক থেকেই পরিবেশ ধ্বংসের থেকে সংরক্ষণের ওপরে আলো পড়তে শুরু করেছে।

১৯৮৬ সালের পরিবেশ সুরক্ষা আইন (ধারা নং ৫ এবং ২৫) এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কিন্তু অনুসারী কার্যকলাপ আরও জোরদার হওয়া উচিত।

আসানসোল, রাণীগঞ্জ কয়লাখনির বিস্তীর্ণ এলাকার অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। জমির একটা বড় অংশ ক্রমশ বসে যাচ্ছে এবং মাটির তলার আগুন এই খনি অঞ্চলের গোটা পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলেছে। যদিও এই সমস্যাগুলো খনি নিরাপত্তা আইনকে মেনে চললে অনেকটাই এড়ানো সম্ভব। যে সমস্ত এলাকাগুলি ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেগুলি মাটি ফেলে সমান করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। পরিত্যক্ত 'ওপেন কাষ্ট' প্রকল্পগুলিকে জৈবিকভাবে (Biological) পুনরুদ্ধার করা উচিত। যে সমস্ত 'ওপেন কাষ্ট' প্রকল্পগুলি বর্তমানে কার্যকর সেগুলিকে ক্রমাগত 'ব্যাকফিলিং (Back filling)' করা উচিৎ। প্রাকৃতিকভাবে এই সমস্ত খনি অঞ্চলকে পুনরুদ্ধার করার সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হল বনসৃজন। ই.সি.এল. কর্তৃপক্ষ এবং সরকারী বন-দপ্তরের এই কাজটি গুরুত্বের সঙ্গে করা উচিত।

মাটির তলার আগুন মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তৎপর হওয়া উচিৎ। আগুন মোকাবিলার ক্ষেত্রে পরিখা খনন, মাটি খুঁড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা আলাদা করে দেওয়া, বালি জাতীয় জিনিস দিয়ে বিস্তীর্ণ অংশ মুড়ে ফেলা ইত্যাদি পদ্ধতির দ্রুত প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ভূ-অভ্যন্তরস্ত খনির ক্ষেত্রে জল মগ্নতা আরেকটি সমস্যা। এই সব ক্ষেত্রে পাম্পের সাহায্যে মাটির তলা থেকে জল বের করে ফেলতে হবে। না-হলে ঐতিহাসিক মহাবীর কোলিয়ারীর ঘটনা আমাদের বারবারই চোখে দেখতে হবে।

আমাদের মেনে নিতেই হবে প্রকৃতির কোল থেকে কয়লা উত্তোলন একটি বাঞ্ছনীয় ও নিবিড় কার্যকরী জমির ব্যবহার ফলে তা এড়ানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা যা করতে পারি তা হল বনসৃজনের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা, ওপেন কাষ্ট প্রকল্পের জমা জলে মৎস চায, বসে যাওয়া জমিগুলিকে পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে নতুন কৃষিক্ষেত্র গড়ে তোলা বা বনভূমির বিস্তার ঘটানো— এইভাবে পরিবেশ ধ্বংসের আমরা সামান্য খেসারৎ দিতে পারি মাত্র।

চলতি দশকে খনি অঞ্চলে জমি অবনমনের ফলে পুরো এলাকাই বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। সরকার (কেন্দ্রীয় ও রাজ্য) বা ই.সি.এল. কর্তৃপক্ষ কেউ-ই এই সমস্ত বিপন্ন লোকেদের পুরোপুরি দায়িত্ব নিতে চায় না ফলে ঘর-ছাড়া মানুষেরা ক্রমেই জমি-জমা হারিয়ে প্রান্তিক মানুষে পরিণত হচ্ছে। এছাড়াও রাণীগঞ্জ, বরাকর অঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত ই.সি.এল. কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে নীচের স্তরের কয়লা আহরণের জন্য গভীরতর করে মাটি খনন করে চলেছে, ফলে কৃষিক্ষেত্র বনজঙ্গল এবং জলভাগ ক্রমশ ধ্বংস দূষিত হচ্ছে।

আর এসবের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা মানুষদের রুজি-রোজগার বন্ধ হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে সংস্থাটি স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়ে কিছু ক্ষতি পূরণও হয়তো দিচ্ছে যা সব সময় প্রয়োজনের তুলনায় অল্প। কুলটির কেন্দুয়া বাজার, আসানসোলের কালি পাহাড়ি, সাতগ্রামের নাগেশ্বর, জামুরিয়া বাজার, গৌরান্ডি, জামবাদ, বারাবনির সামডী ও রাণীগঞ্জের কাশিনাথপুর, সালানপুরের বরিয়া বা সংগ্রাম-গড় ইত্যাদি হল কয়েকটি চোখে পড়ার মত উদাহরণ। ১৯৯০ সালে সাঁকতোড়িয়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় ধ্বসের ফলে পুরোপুরি ভূ-গর্ভে চলে যায়। নাগেশ্বর খনি অঞ্চলে পুকুরে এক ফোঁটাও জলের দেখা মেলে না।

আসানসোল, রাণীগঞ্জ শিল্পাঞ্চলের মাটি খুঁড়লেই কয়লা পাবার সম্ভাবনা থেকে আরেক বিপত্তির উৎপত্তি, তা হল অবৈধ কয়লা খাদান। এর পিছনে সক্রিয় কয়লা মাফিয়া থেকে শুরু করে দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষও। ২রা সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এই রকম একটি সংবাদকে কেন্দ্র করে ঝড় ওঠে প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগের সমস্ত স্তরেই।

সেগুলি থেকে মাটি কেটে যথেচ্ছ কয়লা তোলার ফলে রেল লাইনের নীচের অংশ ক্রমশ ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ফলে এই লাইন দিয়ে যাতায়াতকারী বিভিন্ন সুপার ফাস্ট ট্রেনের যাত্রাপথই বিপদ্জনক হয়ে উঠেছে। যে কোন সময় ঘটতে পারে বিরাট কোন দুর্ঘটনা। রাণীগঞ্জ থেকে বরাকর পর্যন্ত এবং বারাবণী-চিচুরিয়া-পাণ্ডবেশ্বর এলাকার প্রধান রেল লাইনের দু-পাশে অসংখ্য অবৈধ কয়লা খাদান রয়েছে।

১৯৯৭ সালে ডি.জি.এম.এস. জানিয়েছিল অন্তত ৩৪টি জায়গায় লাইনের নীচের মাটি এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে এবং ১৭০টিরও বেশি অঞ্চল যেকোন দিন হঠাৎ বসে যেতে পারে। কিছু জায়গায় কয়লাখনির মধ্যে থাকা মিথেন গ্যাস বাতাসের সংস্পর্শে আসায় মাটির তলার আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে নিকটেই থাকা ইন্ডিয়ান অয়েলের বারউনি-হলদিয়া পরিশোধিত তেলের মাটির তলায় পাইপ লাইনে আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটে যাবার মারাত্মক সম্ভবনা রয়েছে। উড়ে যেতেই পারে সমগ্র আসানসোল ও রাণীগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকা। বেশ কিছু এন.জি.ও. সচেতনতা বাড়ানো এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি পেশ ইত্যাদি করলেও সরকারী তরফে এখনো গাফিলতি কমেনি। আলোচনার শেষ হয়তো দেখতে পাব একটি বড়সড় দুর্ঘটনার পরেই।

মানবিক সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায় হল 'শূন্য দুর্ঘটনা সম্ভাবনাময় অঞ্চল' (Zero Accident Potential Zone) তৈরী। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে দুর্ঘটনা ঘটে যায় তিনটি অবস্থার মিলনে যা হল 'পরিবেশ', 'ব্যবস্থাপনা ও যন্ত্র', এবং সবশেষে ব্যক্তি ও তার ব্যর্থতা, ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নির্দেশের বা সঙ্কেতের ভুল ব্যাখ্যা, অমনযোগিতা ও সর্বোপরি লোভ। সুতরাং, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে পারি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এবং বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে। দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা উন্নয়নের বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে রাণীগঞ্জ আসানসোল কয়লাখনি একটি জাতীয় অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় অঞ্চলে পরিণত হতে পারে।

সামাজিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ঃ একটি বিকল্প প্রতর্ক

তুহিনকান্তি দাস

শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সীতানন্দ কলেজ, নন্দীগ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর

সামাজিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণের সম্পর্ক জটিল ও বহুমাত্রিক। আপাতদৃষ্টিতে, উভয়ে সম্পর্করহিত হলেও প্রথম বিষয়টির সুনিশ্চিতকরণ বহুলাংশে দ্বিতীয় শর্তটির ওপর নির্ভরশীল। যদি কোন সমাজে অসাম্য-বৈষম্যের প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ জাত, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গভিত্তিক হয়, তাহলে সেই অসাম্য-বৈষম্যের নিরসনকল্পে সংরক্ষণের নীতি প্রযুক্ত হতে পারে। সামাজিক উন্নয়ন সমাজস্থ সদস্যবর্গের 'সক্ষমতাবৃদ্ধি' ও 'ক্ষমতায়নে'র দ্যোতক। এঁদের সক্ষমতাবৃদ্ধি ও ক্ষমতায়ন ঘটলে সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট সুযোগের কাঠামোয় সমভাবে ভাগ বসানো সম্ভব হয়। তাই ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণ বা সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য এটি আবশ্যিক বলে বিবেচিত হয়। জাত, ধর্ম, বর্ম ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যে ক্লিষ্ট কোন একটি সমাজে সামাজিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করার মাধ্যমরূপে 'সংরক্ষণ'-এর নীতি প্রযুক্ত হতে পারে কিনা তা আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভারতের মতো বহুস্তরে বিন্যস্ত একটি সমাজ জাত, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও শ্রেণীগত অসাম্যের শিকার স্মরণাতীত কাল থেকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সেই বঞ্চনাকে বৈধতা প্রদানেরও চেষ্টা হয়েছে ধর্মশাস্ত্রকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার দ্বারা। সাময়িকভাবে মানুষ তা মেনে নিলেও সংগঠিত হয়েছে প্রতিবাদী আন্দোলন। যুগান্তের সঞ্চিত বঞ্চনা সামাজিক উন্নয়নের ধারণাকে চূড়ান্তভাবে ব্যঙ্গ করে। সেই বঞ্চনার অবসান ঘটানোর তাগিদে এবং সমতার ভিত্তিতে সমাজ নির্মাণের তাগিদে ভারতরাষ্ট্রের পরিচালকবর্গ 'সামাজিক সংরক্ষণ'-এর নীতি গ্রহণ করেন এবং রাজনৈতিক ভবে তার প্রয়োগ ঘটান। ভারতীয় সংবিধানে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত একাধিক বিধিবন্দোবস্তের উল্লেখ আছে। পাশাপাশি, ভারতরাষ্ট্র কর্তৃক একাধিক কমিশনের নিযুক্তি ঘটেছে সংরক্ষণের সামাজিক ভিত্তি অনুসন্ধানের তাগিদে। 'সামাজিক ন্যায়' প্রতিষ্ঠার জন্য সংরক্ষণের প্রশ্নটি বারে বারে ফিরে এসেছে এবং একমাত্র বিকল্প রূপে গৃহীত হয়েছে। মাপকাঠি হিসেবে 'জাত'-ই স্বীকৃত, শ্রেণীগত উপাদান নয়।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর তাগিদে সংরক্ষণের নীতি গৃহীত হওয়ায় সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের

সূত্রপাত ঘটেছে। সেই সংকট জন্ম দিচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের। সংরক্ষণনীতির বিরোধীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে এর দ্বারা মেধার অপমৃত্যু ঘটছে, মধ্যমেধার চাষাবাদ চলছে এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যেই 'বিকশিত অগ্রসর সম্প্রদায়'-এর সুফল লাভ করছে বাকীরা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আছে। বারে বারে সংরক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করে এবং আর্থিক উপাদানকে অগ্রাহ্য করে রাজনৈতিক প্রবক্তারা তাঁদের ভোটব্যাঙ্ককে সুরক্ষিত করতে চাইছে ও শাসনের বৈধতা প্রতিষ্ঠায় ব্যগ্র হচ্ছে। আর তাই উচ্চবর্ণের সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন লাভ করছে ভিন্ন মাত্রা। মনে রাখতে হবে, সংরক্ষণপন্থী ও সংরক্ষণ বিরোধীদের এই আন্দোলন সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে প্রযুক্ত।

কোন একটি সমাজের সংখ্যাধিক্য মানুষ যদি উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সামিল না হয় তবে সার্বিক উন্নতিকে সুনিশ্চিত করা সম্ভব নয়। অন্তত ভারতের বিদ্যমান বাস্তবতা সে কথাই বলে। ১৭ থেকে ২৩ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারা উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত, বিশ্বে তাদের গড় ২৬.৭ শতাংশ। ভারতের ক্ষেত্রে সেই হার মাত্র ৬.২। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ৮০ শতাংশ এসেছে ২০ শতাংশ পরিবার থেকে। প্রতি দশ হাজার জনসংখ্যা পিছু সরকারী মোহরপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যার গড় বিশ্বে ১৫। এদেশে মাত্র ৫। ১৭৭টি দেশের মধ্যে মানবসম্পদ উননের বিচারে ভারতের অবস্থান ১২৭-এ। এই পশ্চাৎপদতা অতিক্রমের জন্য 'সংরক্ষণমূলক বৈষম্যের নীতি গ্রহণ আবশ্যিক। কারণ, ভারতীয় সমাজের প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ যে অবস্থার মুখোমুখী, তাঁদের অবজ্ঞা করে সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, আর্থিক বৈষম্যে পীড়িত সমাজে 'মেধার নির্মান যে সম্ভব তা ইন্দিরা সাহানি মামলায় সুপ্রীম কোর্টের প্রদত্ত রায় থেকে স্পষ্ট। প্রদত্ত রায়-এর বক্তব্য হলো, 'আমাদের মতো অভিজাততান্ত্রিক সমাজে মেধা কোন অন্তঃস্থানিক গুণ নয়, উচ্চবর্ণজাত পরিবেশ প্রভাবিত ফলমাত্র'। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী ILAIH লিখেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের শিক্ষার যোগ্য সুযোগ দিয়েছিল তখন থেকে ঐ দেশের সামগ্রিক উন্নতির গতি ত্বরান্বিত হয়েছিল। প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন ১৯৪৭ সালে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য কিছু ইতিবাচক সুবিধার বন্দোবস্ত করেছিলেন। লক্ষ্য ছিল উন্নয়নের যজ্ঞে সবার অংশগ্রহণ। এই প্রসঙ্গে ভারতের সুপ্রীমকোর্টের একটি মামলার রায়ের অংশটি স্মরণ করা যেতে পারে। উক্ত রায়ে সংরক্ষণকে 'ইতিহাসগত ভাবে নির্মিত বৈষম্যের প্রতিকারকল্পে গৃহীত একটি সাংবিধানিক পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে যা কোন ব্যক্তিগত অনুকম্পা প্রদর্শনের বিষয় নয়। এটি পশচাদপদ সম্প্রদায়ের সাংবিধানিক অধিকার এবং সরকাররে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মাত্র।' ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে সামাজিক ন্যায় স্থাপনের যে ইঙ্গিত আছে, তা বাস্তবায়ণের একটি মাধ্যম হলো 'সংরক্ষণ'।

সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের 'ক্ষমতায়ন' এবং 'সক্ষমতা' বৃদ্ধির দ্বারা সামাজিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করা সম্ভব। ভারতের মতো অসাম্য-বৈষম্য পীড়িত সমাজে 'সংরক্ষণ'-কে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে ইঙ্গিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব।

স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় ও তার সমাজ-অর্থনৈতিক প্রভাব

শুভ্রাংশু সাঁতরা
গবেষক, প্রতীচী (ইন্ডিয়া) ট্রাস্ট

আমাদের দেশের সামাজিক ব্যাধিগুলির মধ্যে প্রধান তিনটি হল— দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতা। এই তিন ধরনের ব্যাধি আলাদা আলাদা ভাবে যেমন মানুষের জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তেমনি এগুলি আবার একে অপরের সাথে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। অর্থনৈতিক অভাব যেমন দরিদ্র মানুষগুলিকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তেমনি সেই পরিবারগুলির কাছে স্বাস্থ্যহীনতা একটি বড় অভিশাপ রূপে দেখা দেয়।

স্বাস্থ্যহীনতা সামাজিক ভাবে পশচাদপদ মানুষদের ক্ষমতাকে কিরূপ সীমাবদ্ধ করে রেখেছে এবং চিরাচরিত অবদমন ও শোষণের মধ্যে কিভাবে বেঁধে রেখেছে তা আলোচনা করা ছাড়াও প্রবন্ধটিতে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়ের ব্যাপ্তি ও সমাজ জীবনে তার প্রভাবের দিকটিও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণভাবে দরিদ্ররা এর শিকার তো হনই কিন্তু এই অসাম্যগুলি নারীদেরকেই বেশি প্রভাবিত করে। দরিদ্র নারীদের ক্ষেত্রে আবার এই অসাম্য দুই দিক থেকে আসে— তাঁরা দরিদ্র হিসাবে বঞ্চিত হন আবার নারী হিসাবেও।

দেশের মানুষের বিশেষত দরিদ্র জনসাধারণের স্বাস্থ্যর অবস্থাটি অনেকটাই নির্ভর করে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার রূপায়ণের উপর। তাই সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যেখানে যত দুর্বল সেখানেই মানুষের স্বাস্থ্যজনিত অসহায়তা তত বেশি। সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাটি মজবুত থাকলে সেখান থেকে জনসাধারণ সরাসরি সুবিধাগুলিতো পানই সেই সঙ্গে বিকল্প ব্যবস্থাগুলিকেও তুলনামূলকভাবে অধিক দায়বদ্ধ হতে দেখা যায়। প্রবন্ধটিতে সেই দিকটির একটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিভাজিত সমাজে উন্নয়ন প্রগতি ঃ পশ্চিমবঙ্গের চিত্র

কুমার রাণা

উন্নয়ন (Development) ও বৃদ্ধি (Growth) সমার্থক নয়; অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হলেই উন্নয়ন ঘটবে এমন কোনো সুনিশ্চিত কথা যে বলা যায় না তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এখনো অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস যে, গড় অর্থনৈতিক বৃদ্ধি দিয়েই সমাজের প্রগতি মাপা ও তাকে আরো অগ্রসর করা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গেও এই ধারণাটি কিছু কিছু মহলে বেশ জোরালো।

কিন্তু বাস্তবত যা দেখা যায়, উন্নয়ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বৃদ্ধির উপর নিভর তো করেই না— বরং বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষে তার প্রভাব বিভিন্ন রকম ভাবে পড়ে। আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রবিশেষের দ্বারা তা বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের সমাজে উন্নয়নের এই প্রভাবকারী ও প্রভাবিত হওয়ার দিকগুলি আমরা দেখতে পাই তার বিভিন্ন খণ্ডাংশগুলির মধ্য দিয়ে। একদিকে যেমন তার আছে ভূগোলের উপর আধারিত নানান তীব্র বিভাজন, তেমনি আবার আছে নানান জনবিন্যাসের বিভাজন। বহুক্ষেত্রেই আবার ভৌগোলিক বিভাজনগুলি জনবিন্যাসগত বিভাজনের সঙ্গে মিলে যায়।

প্রস্তাবিত আলোচনাটিতে আমরা এই বিবিধ বিভাজনগুলির সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্কগুলি পরীক্ষা করার চেষ্টা করব।

রাষ্ট্র, শিক্ষা ও পূর্ব মেদিনীপুরের আদিবাসী উন্নয়ন — একটি বিশ্লেষণ

সন্দীপ ঘটক
আসানসোল গার্লস কলেজ

রাষ্ট্র এবং উন্নয়ন এই দুটি ধারণা যেন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। রাষ্ট্রের ধারণাটির সাথে উন্নয়নের ধারণাটিও গভীরভাবে যুক্ত। এমন কি উন্নয়ন সম্ভবত বাস্তবের সামনে এসে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের হাত ধরেই। সভ্যতার সূচনা পর্ব থেকেই আজ পর্যন্ত উন্নয়নের মুখ্য দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতেই থেকে গেছে। আধুনিক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্বই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখা। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ উন্নয়নের স্বপ্ন দেখে রাষ্ট্রের মাধ্যমেই। এবং সম্ভবত রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে কার্যকরী উন্নয়নের কথা ভাবাই যায় না।

উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক ধারণা। উন্নয়ন অর্থনৈতিক হতে পারে, রাজনৈতিক হতে পারে, সামাজিক হতে পারে এবং সাংস্কৃতিকও হতে পারে। উন্নয়নের ব্যাখ্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। তবে সমস্ত বিতর্কের উর্দ্ধে উঠে একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে, পূর্বের অবস্থা থেকে কিছুটা ভালো জায়গাতে পৌছে যাওয়াই হল উন্নয়নের নির্দেশক তা সে অর্থনৈতিক হোক, রাজনৈতিক হোক আর সামাজিক বা সাংস্কৃতিক হোক।

শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয় সমগ্র ভারতবর্ষের জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হল আদিবাসী জনজাতি। আদমসুমারীর তথ্য একথা প্রমাণ করে যে, বর্তমানে এই আদিবাসী জনসংখ্যার হার দ্রুত ক্রমবর্দ্ধমান। আমরা জানি, যে কোন সমাজের উন্নয়নের প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপই হোল শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়ন। প্রকৃত এবং কার্যকরী শিক্ষা চিনিয়ে দেয় উন্নয়নের সঠিক বা প্রকৃত পথ। এমনকি উন্নয়নের সুফল সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে গেলেও প্রয়োজন হয় শিক্ষার। এককথায় শিক্ষার গুরুত্ব অভাবনীয়।

শিক্ষার এই গুরুত্ব উপলব্ধি করেই প্রতিটি রাষ্ট্রই শিক্ষা ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। সমাজের প্রতিটি সম্প্রদায়ের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র গ্রহণ করে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হল আদিবাসী সম্প্রদায়। আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী আদিবাসী জনজাতির মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে উল্লেখযোগ্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পানিপারুল গ্রাম পঞ্চয়েতের অধীনস্থ আদিবাসী গ্রামগুলির অবস্থা অত্যন্ত করুণ। ৯৮.৭৭ শতাংশের বেশি আদিবাসী নিরক্ষরতার অন্ধকারে দিনযাপন করছে। চরম দারিদ্র্যের সাথে তারা নিয়মিত সংগ্রাম চালাচ্ছে। শিক্ষার আলো তাদের কাছে পৌছে দেবার কোন প্রচেষ্টাই দেখা যায় না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবন্ধে যে বিষয়টি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, তা হল পূর্ব মেদিনীপুরের পানিপারুল গ্রাম পঞ্চয়েতের অধীনস্ত আদিবাসী গ্রামগুলিতে সরকারী শিক্ষা প্রকল্পগুলি কতদূর তাদের কাছে পৌছেছে, যার ফলে তারা শিক্ষার দিক দিয়ে এগিয়ে যাবার কথা ভাবছে। অথবা আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সরকারী প্রকল্পগুলি কতটা সাফল্য পেয়েছে।

উন্নয়ন ও সংরক্ষণ — ভারতীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন

অধ্যাপিকা কৃষ্ণা গুহ
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, মালদহ উইমেন্স কলেজ, মালদহ

''উন্নয়ন'' এই ধারণাটি বহু ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়— সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও উন্নয়নের ধারণাটিকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকে বহু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন র‍্যাডিক্যালিষ্টদের মতে উন্নয়ন হল কর্মচাঞ্চল্য ও সৃজনশীলতার বিকাশ। সমাজ বিজ্ঞানের জনক অগাষ্ট কোঁতের মতে উন্নয়নের সাথে ''জ্ঞানের উন্মেষ'' বা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের বিষয়টি জড়িত, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উন্নয়নের বিষয়টি ''উৎপাদন শক্তি''-র বিকাশের সাথে বিষয়টি যা উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার ফলশ্রুতি। অর্থনীতিবিদগণ উন্নয়ন বলতে মাথাপিছু আয় এবং মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিকে বুঝিয়ে থাকেন। জনসংখ্যাবিদ্গণ ''কাম্য জনসংখ্যা'' এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে সুষম বণ্টনকেই উন্নয়নের প্রধান মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করেছেন। সাম্প্রতিক কালে বিশেষ করে গত দুই দশকে মানবিক উন্নয়নের (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট) কতগুলি মাপকাঠির ভিত্তিতে উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

এছাড়াও সাম্প্রতিক কালে ইকোলজিক্যাল এ্যাপ্রোচ এর ভিত্তিতে সাস্টেন্যাবল ডেভেলপমেন্ট বা স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণাটি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে এককথায় বলা যায় উন্নয়ন বলতে একই সাথে গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় ধরনের বিকাশ ও অগ্রগতিকে নির্দেশ করে।

অন্যদিকে ''সংরক্ষণের'' ধারণাটিও একমাত্রিক নয়। সাধারণভাবে সংরক্ষণ বলতে বিশেষ কিছু ব্যবস্থা বিশেষ কিছু গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট করাকে বোঝায়। ভারতীয় সমাজে ''সংরক্ষণ'' বিষয়টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলেও আলোচ্য প্রবন্ধে সংরক্ষণের ধারণাটিকে মূলত দুর্বল ও পশ্চাদপদ শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণ অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে মূলত তপশিলি জাতি, আদিবাসী, দুর্বল শ্রেণীর পাশাপাশি কিছু সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং পরবর্তীকালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে (২০০৬) অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ও বি সি) আরও বেশী সংরক্ষণের প্রশ্নে ''উন্নয়ন ও সংরক্ষণের'' সম্পর্কে বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে। যদি ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায় তবে উন্নয়ন ও সংরক্ষণের মধ্যে সম্পর্ক একমুখী নয় দ্বিমুখী কখনও পরস্পরবিরোধী কখনও পরস্পরের পরিপূরক। আলোচ্য প্রবন্ধে এই দ্বিমুখী সম্পর্কের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং মূলত মানবিক উন্নয়নের মাপকাঠির ভিত্তিতে আলোচ্য বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সিভিল সোসাইটির গণতন্ত্র ও তার আকাঙ্খিত নীতি সূত্রগুলি

অধ্যাপক শিবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, হরিপাল, হুগলী

একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'দ্বি-মেরু' ব্যবস্থার উদ্ভব, ঠাণ্ডা লড়াই পরবর্তীকালে এক মেরুকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, সন্ত্রাসবাদ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সামনে কতগুলি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। অপরদিকে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি আকাঙ্খা, গণতন্ত্রের রূপ ও আঙ্গিক নিয়ে আধুনিককালে নিত্যনতুন গবেষণা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি রক্ষার প্রশ্নে রাষ্ট্রশক্তিগুলির সংঘবদ্ধতা বর্তমানে চোখে পড়ার মতো।

বস্তুত গণতন্ত্রে সমস্যা যত বেড়েছে সঙ্কট সমাধানের পন্থা হিসাবে আধুনিক চিন্তাবিদ্রা নানাপ্রকার মডেল নীতিসূত্র বা তার নিত্য নতুন প্রয়োগ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। এদের মধ্যে তিনটি সর্বাধিক জনপ্রিয় ডেলিবারেটিভ্ ডিমোক্রেসী, ইন্টারনেট ডিমোক্রেসী ও ব্যালেন্স রিপ্রেজেনটেশন। বক্তব্য, যুক্তিশীলতা ও বাবহার যোগ্যতার দিক দিয়ে এরা আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বার্তাবাহী। বস্তুত পক্ষে এত কিছু সত্ত্বেও যে কাম্য ও গ্রহণএযাগ্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আশা করা হয়েছিল। তাতে যেন কোথায় একটা ফাঁক রয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অতিথি' গল্পের নায়ক 'তারাপদ'র চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন 'তারাপদ হরিণশিশুর মত বন্ধন ভীরু; আবার হরিণের মতই সংগীতমুগ্ধ।'' উদারনৈতিক গণতন্ত্রের রূপ ও প্রকৃতিও যেন তারাপদর চরিত্রেরই অনুগামী। সেও যাবতীয় বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চায়; আবার বন্ধনের মধ্যেই সে তার নিজ সত্ত্বাকে অনুভব করে, বিকশিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মেরীয়ন ইয়ং এই সমস্যা সমাধানে গণতন্ত্রের সাবেকি মডেলের সংস্কারের দাবি করেন। ইয়ং এর মতে 'ইনক্ল্যুসিভ ডিমোক্রেসী' এক সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক ব্যবস্থা দাবি করে, যার রাজনৈতিক দর্শন হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা। পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রের এই মডেলটি খুবই জনপ্রিয়। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে যে মৌল প্রশ্নগুলি আজ উঠছে তা হল :

১। একটি বহুজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক জনসমাজে কোন

জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব হওয়া উচিত?

২। প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে একটি জনগোষ্ঠীর কতগুলি আসন থাকা উচিত?

৩। একটি জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি অপর জনগোষ্ঠীর প্রতি কতটা সহনশীল হতে পারে।

৪। আনুগত্যের প্রশ্নে তারা কতটা কাছাকাছি আসতে পারে।

এই ধরণের গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা প্রশাসক ও রাজনীতিবিদ্ দ্বারা গৃহীত হলে গণতন্ত্রের সার্বিক বিকাশ সম্ভব।

বনসংরক্ষণ ও আদিবাসী উন্নয়ন

বরেন্দ্রনাথ গিরি
ইতিহাস বিভাগ, রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি কলেজ

ভারত উপমহাদেশের শতকরা পাঁচভাগের বেশি 'আদিম উপজাতির বসবাস। নৃতাত্বিক গবেষণা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি ভারতীয় ঐতিহ্যে ধর্ম, ভাষা, শোণিত, আচার, জাতিগত, সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে প্রাচীনকাল থেকে আদিবাসী সমাজ যাযাবর বৃত্তি ও রাজনৈতিক কারণে ভারতের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে বসতি স্থাপন করেছে; যে কারণে বর্তমান ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যে কমবেশি আদিবাসী সমাজের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনকাল পর্বে মাত্রাতিরিক্ত শোষণ, অর্থ লোলুপতা ইত্যাদি আদিবাসী সমাজকে বিরল থেকে বিরলতর জাতিতে পরিণত করেছে। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকবর্গ আদিবাসী সমাজেকে 'বিশেষ যত্ন করার' নামে ভারতের মূল জাতিদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকারের 'বনসংক্রান্ত' আইনগুলি ছিল বৃটিশ কূটনীতির চরম পরাকাষ্ঠা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কাষ্ঠ সম্পদের উপর একাধিপত্য স্থাপনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার জঙ্গল আইন প্রণয়ন করে আদিবাসী সমাজকে বিদ্রোহের সম্মুখীন করেছিল সন্দেহ নেই। উন্নত সভ্যতার দ্বারা আদিবাসীরা আক্রান্ত হওয়ার ফলেই তারা আজ মনোবল ও জীবনীশক্তি হারিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত। ভারতের আদিবাসী সমাজের গোষ্ঠীগত সংস্কৃতিকে বন, জঙ্গল, সংরক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা— এই প্রশ্ন আজ বড়ই প্রাসঙ্গিক।

নৃতত্ববিদগণ আদিবাসী সমাজের গোষ্ঠীগত সংস্কৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'ন্যাশন্যাল পার্ক' পরিকল্পনার তত্ত্ব তুলে ধরেন। নৃতত্ববিদ রিভার্স, ভেরিয়ের এলুইন জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে অরণ্য ও পাহাড় অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের উন্নয়নের তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে 'বস্তার মডেল' উল্লেখযোগ্য।

'বাস্তুতন্ত্রে' বনসংরক্ষণ, বনসৃজন হল জৈব বৈচিত্র ও প্রাণী মণ্ডলের বেঁচে থাকার একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ। আর্থিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হল অরণ্য সংরক্ষণ। অরণ্য হল বিভিন্ন পশু, পাখি, বণ্যপ্রাণী ও আদিবাসীদের প্রধান আবাসস্থল। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য যেমন বনসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তেমনি ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, আচার, রীতিনীতি, আদর্শ, বৈচিত্রখণ্ডিত নান্দনিক শিল্পকলার স্বার্থে আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন একান্তভাবে প্রয়োজন। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন রূপের সমাহার লক্ষ্য করা যায়, সেখানে অরণ্যের অধিবাসী আদিবাসী সমাজের 'নেগ্রিটো' বর্গের শিল্পকলার দানকে কোনমতে লঘু করে দেখার উপায় নেই। নিবিড় বনপ্রকল্প, উৎপাদন ভিত্তিক বনপ্রকল্প, কৃষি ভিত্তিক বনপ্রকল্প, আইনগত বনসংরক্ষণ— নিঃসন্দেহে উন্নয়নের আদিবাসী শ্রেষ্ঠ পন্থা।

পরিবেশ বনাম মানবাধিকারঃ গোবিন্দপুর রেল কলোনির উচ্ছেদ, একটি তথ্যানুসন্ধান

মিতা চৌধুরী ও মোহিত রায়
'বসুন্ধরা', ১০ সেকেণ্ড রোড, ইস্টার্ন পার্ক, সন্তোষপুর

পরিবেশের ব্যাপারে মানুষ ইদানীং বেশ সচেতন হয়ে উঠেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সচেতনতা অতি সংবেদনশীলতায় পরিণত হয়ে মানুষকে অন্যান্য আর্থ সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে উদাসীন করে তুলেছে।

মানুষের বিকাশের একটা স্তরে এসে মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে চিন্তা শুরু করল। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি ইতিমধ্যে প্রকৃতি ও পরিবেশে যথেষ্ট আঘাত হেনে ফেলেছে। এই পরিবেশ ভাবনা এসেছে প্রথমত উন্নত দেশগুলির জনমানসেই। কালক্রমে ১৯৭২ এ সুইডেনে 'বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনের' হাত ধরে তা প্রবিষ্ট হয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলির জনমানসে।

আধুনিক সভ্যতার বিকাশ তো আসলে পৃথিবীর জনগণকে সুস্পষ্ট দুটি ভাগে ভাগ করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলতে বিরাট জনবিস্ফোরণ, অথচ সম্পদের সীমিত জোগান সৃষ্টি করেছে এক বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী, সেইসঙ্গে এক বিশাল প্রান্তিক গোষ্ঠী। জনগণের এক অংশ প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায় সচেতন। গড়ে উঠেছে অতি সংবেদনশীল কিছু পরিবেশ সংগঠন। দেশের বাস্তব আর্থ সামাজিক সমস্যা উপেক্ষা করে এই সংগঠনগুলি বিভিন্ন সময়ে আদালতে উপস্থিত হচ্ছে জনস্বার্থ মামলা নিয়ে। আদালতের রায় কখনো কখনো প্রান্তিক

জনগোষ্ঠীকে চরম দুর্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করছে। পরিবেশ ও উন্নয়নের নামে উচ্ছেদ তাই আজ আর বিরল ঘটনা নয়। পুনর্বাসনের উপযুক্ত ও সুসংহত ব্যবস্থা ছাড়াই উচ্ছেদ যে শুধু এই জনগোষ্ঠীকে নিজস্ব বাসস্থানহারা করছে তাই নয়, জীবনধারণের আরও অনেক মাত্রাতেই তাঁরা ভীষণভাবে আহত হচ্ছেন। বাসাহারা, জীবিকাহারা, শিশুসন্তানের শিক্ষাব্যবস্থাহারা— নিরাপত্তাহীন এই প্রান্তিকতা জনগোষ্ঠীকে করে তোলে বিষাদময় হতাশাগ্রস্থ এক মানবগোষ্ঠী। স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশ, উন্নয়ন এবং উচ্ছেদ প্রসঙ্গে নীচের প্রশ্নগুলি এসে যায় ঃ

এই উচ্ছেদ কতখানি নীতিসঙ্গত? পুনর্বাসন আর ক্ষতিপূরণ হলেই কি উচ্ছেদ যুক্তিযুক্ত? কী ধরনের পুনর্বাসনই বা হওয়া উচিত? যে উন্নয়ন আর পরিবেশ সংরক্ষণের নামে এই উচ্ছেদ তাতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের উপকার কতটুকু?

এইরকমই এক উচ্ছেদের ঘটনা হল, রবীন্দ্র সরোবর সংলগ্ন গোবিন্দপুর রেল কলোনির বস্তি উচ্ছেদ। এই উচ্ছেদ এক প্রান্তিক দিশাহারা জনগোষ্ঠীকে পরিচিত আশ্রয় থেকে নিয়ে ফেলেছে অপরিচিত, অনিশ্চিত এক পরিমণ্ডলে।

কলকাতার 'বসুন্ধরা' সংগঠন এই উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে আগাগোড়া যুক্ত ছিল।

এই আলোচনাপত্র সেই আন্দোলনের তথ্যের বিশ্লেষণ। উচ্ছেদ, পুনর্বাসন ও মানবাধিকার এবং সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, আদালতের রায়ের যৌক্তিকতা ইত্যাদি সম্পর্কিত এক তথ্যানুসন্ধান।

শহর ও শহরতলীর মহিলা হকারদের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব ও রাষ্ট্রের ভূমিকা

জয়তী ভট্টাচার্য ও সুমনা দাস
অর্থনীতি বিভাগ, বিবেকানন্দ মহিলা মহাবিদ্যালয়, বড়িষা

কোনো একটি রাষ্ট্রে প্রান্তিক গোষ্ঠী তাঁরাই, যাঁরা প্রচলিত আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সুফল থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত। প্রান্তিকতার ভিত্তি হতে পারে সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্ম বা লিঙ্গ। এই ভিত্তিগুলি যে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এমনটা নয়, তবে একটি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রান্তিকতার মূল ভিত্তিকে চিহ্নিত করা হয়তো কঠিন নয়। সেই বিচারে বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন এমন এক গোষ্ঠীর মানুষেরা যাঁরা মূলত অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রান্তিক হলেও লিঙ্গ বৈষম্য হেতু নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যেও এঁরা প্রান্তিকতর। আমরা এখানে আলোচনা করব মহিলা হকারদের নিয়ে, শহর বা শহরতলিতে বিভিন্ন দ্রব্যের পসরা সাজাতে যাঁদের অহরহ দেখা যায়। বিক্রীত দ্রব্যের প্রকৃতি বা কাজের ধরন (mode of operation) এর ভিত্তিতে এঁদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) সবজি, ফল বা মাছ বিক্রেতা— যাঁদেরকে বিভিন্ন বাজার (market place) এর আশেপাশে ফুটপাথ দখল করে বেচাকেনা করতে দেখা যায়;

(২) রাস্তার ধারে ঝুপড়ি, চা, খাবার বা অন্যান্য টুকিটাকি দ্রব্যের দোকানোর মালকিন;

(৩) বাড়ি বাড়ি ঘুরে নানা ধরনের জিনিস ফেরি করা মহিলাবর্গ। এঁদের মধ্যে তাঁরাই আমাদের আলোচনার অন্তর্গত হবেন যাঁদের বিক্রীত দ্রব্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে উৎপাদিত।

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রথম গোষ্ঠীর মহিলারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় গোষ্ঠীদের থেকে অনেকটা আলাদা। সাধারণত এঁরা গ্রামের নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষ এবং অধিকাংশই নিরক্ষর। অপরদিকে, বাকি দুটি গোষ্ঠী মূলত শহর বা শহরতলির নিম্ন বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এঁদের শিক্ষার মান অপেক্ষাকৃত বেশি। বলা বাহুল্য যে আমাদের আলোচিত গোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্তর্গত। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন দ্বিতীয় বা তৃতীয় গোষ্ঠীর সম্প্রসারণের সঙ্গে বিশ্বায়নের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্বায়নের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল যে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিস্তার, এ নিয়ে দ্বিমত পোষণের সুযোগ বোধ হয় খুব একটা নেই। অনেক ক্ষেত্রে এই বিস্তার ঘটেছে সংগঠিত ক্ষেত্রের পরিপূরক হিসেবে আবার কখনও এই ক্ষেত্রের গুরুত্ব বেড়েছে সংগঠিত ক্ষেত্রের বিকল্প হিসেবে। সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগ সংকোচন অনেক পরিবারকেই বাধ্য করেছে বিকল্প অবলম্বন খুঁজে নিতে এবং এই পরিবারগুলির মেয়েরাও উপার্জনের রাস্তা খুঁজে নিয়েছেন বা নিতে বাধ্য হয়েছেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। 'Street Vending' বা হকারের কাজে পুঁজির প্রয়োজন কম এবং অর্থনীতির ভাষায় অবাধ প্রবেশ (free entry) এর অধিকার আছে। কিন্তু পাশাপাশি অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে সবচেয়ে সমস্যাসঙ্কুল জীবিকাও এটি। এর সবচেয়ে বড় কারণ হল রাষ্ট্রের বিচারে এঁরা 'সমাজবিরোধী' না হলেও এঁদের মধ্যে অনেকেই 'অনধিকার স্থান অধিগ্রহণকারী' (illegal occupants)। সুতরাং এঁদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান দূরস্থান-এঁদের উচ্ছেদ নাগরিক প্রশাসনের অন্যতম কর্মসূচীর মধ্যে পড়ে। অনেক গবেষকই street vendor-দের কাজের ব্যয়-সুবিধা (cost benefit) বিশ্লেষণ করে এঁদের প্রতি প্রযোজ্য প্রশাসনিক বা আর্থিক নীতি গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। বর্তমান আলোচনায় আমরা যে উপগোষ্ঠীর উপর গুরুত্ব দিচ্ছি তাঁরা হলেন মহিলা হকার— পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে যাঁরা নেহাৎ নগণ্য নন। কিন্তু আলোচ্য প্রান্তিক গোষ্ঠীর মধ্যেও এঁরা প্রান্তিকতর— বিভিন্ন দেশের তথ্য প্রমাণাদি অন্তত সেইরকমই ইঙ্গিত করে। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যখন এঁরা, তখন 'ব্যয় সুবিধা'র বিশ্লেষণটি হতে হবে আরও গভীর ও অধিক মাত্রাযুক্ত। কারণ আধুনিক উন্নয়ণের তত্ত্বে নারী উন্নয়নের অন্যতম 'agent' হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই বিশেষ স্থানটি অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। আলোচ্য মহিলাবর্গ এই নির্দিষ্ট পেশাটিতে থাকার ফলে মানব উন্নয়নের বিভিন্ন

মাপকাঠিগুলি কীভাবে প্রভাবিত করতে পারেন তা আলোচনা করা আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। একজন মহিলা হকারের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নির্ণয়ের জন্য এই অনুসন্ধান অপরিহার্য। তবে বর্তমান আলোচনা একটি বৃহত্তর গবেষণার উপক্রমণিকা মাত্র।

পরিবেশ রক্ষা, বিচারব্যবস্থা ও গণমাধ্যম— চিন ও ভারতের অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা

সুশান্ত মজুমদার
গবেষক ও বিজ্ঞান লেখক

পৃথিবীতে একথা স্বীকৃত যে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণাপত্রে যেমন রিও ডিক্লারেশন, আরহাস ডিক্লারেশনে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে পরিবেশ রক্ষার বিষয়গুলি সবচেয়ে ভালোভাবে মোকাবিলা করা যায় যদি সেখানে দেশের নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে। কিন্তু পরিবেশ রক্ষার বিষয়গুলিতে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাস্তবে তখনই সম্ভব, যদি সেই দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে।

একটি রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিচারব্যবস্থা এবং গণ ও প্রকাশমাধ্যম পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই আলোচনাপত্রে দুটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র— চিন ও ভারতবর্ষে, এই দুটি প্রতিষ্ঠান গত তিনটি দশক ধরে পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করছে, তা আলোচিত হয়েছে।

দুটি দেশের বিচারব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনাকে (পরিবেশ রক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে) দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত, দু-দেশের সংবিধানের বিভিন্ন ধারার আলোচনা, যার মধ্যে দিয়ে একদিকে বেরিয়ে আসে চিনের বিচার বিভাগের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা এবং অন্যদিকে ভারতবর্ষের সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলির স্বাধীনতার বিষয়টি। দ্বিতীয় যে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হচ্ছে চিন ও ভারতের বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত আইন এবং এই সমস্ত আইনকে প্রয়োগ করার জন্য তৈরি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আইনপ্রদত্ত অধিকার। এ প্রসঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার কেন্দ্রগুলির পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটিও উঠে এসেছে। ক্ষমতার পৃথকীকরণের অভাবে সাধারণ মানুষ কী ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়েন এই আলোচনা পত্রে তার উল্লেখও রয়েছে।

আলোচনার শেষ অংশে দুটি দেশের প্রকাশ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। চিনের ক্ষেত্রে ইয়াংসি নদীতে বাঁধ, দাই কিংয়ের বিখ্যাত বই 'ইয়াংসি! ইয়াংসি!' প্রকাশ (১৯৮৯) এবং তার পরবর্তী ঘটনা এবং ভারতবর্ষে নর্মদা বাঁধের আন্দোলন সম্পর্কে গণ ও প্রকাশমাধ্যমগুলিতে বিভিন্ন আলোচনা— এই দুইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

ওরা থাকে ওধারে

রাহুল রায়
পরিবেশকর্মী, নারকেলবাগান, খাগড়াজোল

পৃথিবীতে প্রায় ১৮ লক্ষেরও বেশি মানুষ প্রতি বছর নিজের চেনা পরিবেশ ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কারণগুলো আমাদের জানা। খরা, বন্যা, মাটির ক্ষয়, গাছ কাটা, ভূমিকম্প, সুনামি, পারমাণবিক দুর্ঘটনা, বিষাক্ত বর্জ্য দূষণ ইত্যাদি। ওপরের হিসেবটা একটু অন্যরকম করে বললে দেখা যাবে যে পৃথিবীতে প্রতিদিন প্রায় ৫,০০০ জন মানুষ নিজের ভিটে থেকে উৎখাত হচ্ছে। পৃথিবীর কোনও অঞ্চলই এই বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। এক একটি অঞ্চল এক এক রকম ভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। বিখ্যাত পরিবেশ সাংবাদিক মার্ক টাউনসেন্ড (২০০২) জানিয়েছিলেন যে এ পর্যন্ত পরিবেশ বিপর্যয়ে উৎখাত হয়েছে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষ। এরা 'পরিবেশ শরণার্থী'। দূষিত পরিবেশের বলি। এদের না আছে অনেক ক্ষেত্রে নাগরিক কোন অধিকার, না আছে পরিচয়, না আছে কোনও জীবিকা।

এখানে মনে প্রশ্ন জাগা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয় যে 'পরিবেশের বলি' কারা? আর কারাই বা 'পরিবেশ শরণার্থী'? আসলে পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে বিপদগ্রস্ত মানুষেব সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা মোটেও পরিষ্কার নয়। কারও মতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়জনিত পরিবেশ দুর্ঘটনার কবলে পড়া মানুষদের এ তালিকা থেকে বাদ রাখাই উচিত। কারণ আক্ষরিক অর্থে, দুর্ঘটনা শব্দটিতে এক 'সম্ভাবনা' বা 'যদি হয়' গোছের ব্যাপার আছে। কিন্তু কাউকে যখন 'বলি' বা 'শরণার্থী' বলা হয়, ধরে নেওয়া হবে যে তার পেছনে মানুষেব ইচ্ছাকৃত বা হঠকারী কোন কাজ আছে। আবার কিছু দুর্ঘটনা আছে যাকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক। কিন্তু তাকে খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় তা ঘটেছে মানুষের কাজের ফলেই। যেমন—১৯৯৫ সালে চিন দেশে ইয়াংসি নদীর বন্যায় বহু মানুষ মারা গিয়েছিল। বন্যা এক প্রাকৃতিক

ঘটনা। কিন্তু চিন দেশে ইয়াংসি নদীর দুধারে নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে মাটির ক্ষয় বেড়ে যায়। ক্ষয়ে যাওয়া মাটি জমে ওঠে ইয়াংসির বুকে। নদী ক্রমশই অগভীর হয়। কমে আসে তার জলধারণ ক্ষমতা। এর ফলে দেখা দিয়েছিল বিধ্বংসী বন্যা। এরকম ঘটনায় বিপদগ্রস্ত মানুষকে কি 'পরিবেশের বলি' বা 'পরিবেশ শরণার্থী' বলা যাবে না? আর এখানে এটা ভুললেও চলবে না যে দূষিত পরিবেশের বলি কেবল মানুষই নয়, অন্যান্য পশুপাখি ও গাছপালাও হতে পারে। কিন্তু তাদের নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা কতটা?

এটা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে পৃথিবী জুড়ে পরিবেশ শরণার্থীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। প্রতি মিনিটে পৃথিবীতে ১৭৫টি শিশু জন্মাচ্ছে। এদের প্রত্যেকের মুখে রাষ্ট্রকে খাদ্য তুলে দিতে হয় বা দেওয়া উচিত। এই শিশুদের প্রতি ১০০ জনে ৯৭ জনই এমন দেশে জন্মায় যেখানে আর্থিক অবস্থা বেহাল, খাদ্য-পানীয় প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম, শহরগুলো ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর ও বাইরে থেকে আসা শরণার্থীর চাপে ধুঁকছে। এমনকী এই অঞ্চলগুলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর খুব দ্রুত বিকাশশীল ৫০টি শহরের ৪০টিই রয়েছে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে। ২০০২ সালে পাওয়া রেড ক্রস-এর এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীতে প্রায় সাড়ে চার কোটি শরণার্থীর ৫৮ শতাংশ পরিবেশ বিপর্যয়ের বলি। এই গ্রহে এখন প্রতি ২৫০ জন মানুষে ১ জন পরিবেশ শরণার্থী। ক্লাউস টপফার, 'ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম-এর চিফ এক্সিকিউটিভ-এর মতে ২০১০ সালে পরিবেশ শরণার্থীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৫ কোটি এর মানে প্রতিদিন প্রায় ৮৫০০ জন শরণার্থী বেড়ে যাওয়া।

পৃথিবীর নানা পরিবেশ সমস্যা নিয়ে ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে রাষ্ট্রসংঘ থেকে পৃথিবীর মানুষের কাছে একটি করে পরিবেশ বার্তা ঘোষিত হয়। ২০০৬ সালের পরিবেশবার্তা ছিল Deserts and Desertification : Don't Desert Drylands. উদ্দেশ্য পরিবেশ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের বিপন্নতা কমানো। রাষ্ট্রসংঘ থেকে বার বার বলা সত্ত্বেও পরিবেশের নানান বিপন্নতা কিন্তু ঠেকানো যাচ্ছে না। পৃথিবীর জলবায়ু গেছে বদলে। পরিবেশ ক্রমশই হচ্ছে বিপন্ন। নানাপ্রকার দূষণে চারিদিক ছেয়ে যাচ্ছে। বিপন্ন পরিবেশে বিপর্যস্ত মানুষ বাঁচার আশায় নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে নতুন কোন আস্তানার খোঁজে যেতে চাইছে। কিন্তু যাবে কোথায়? বিপন্নতা তো সর্বত্র। বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন— ইউক্রেন-এর চেরনোবিল-এর পারমাণবিক দূষণ, আমাদের দেশে ভোপালে মিক গ্যাস দূষণ, জাপানের মিনামাটা উপকূলের বর্জ্য পারদ দূষণ, আমেরিকায় লাভ ক্যানাল ও মিসিসিপি নদীর ধার ঘেঁষে পেট্রোরাসায়নিক দূষণ, পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা নদীর ভাঙনে মানুষের বিপন্নতা, ঝাড়গ্রামের অদূরে চিচুরগেড়িয়া-তে পাথর ভাঙা কলের দূষণে আদিবাসীদের মৃত্যু, দুর্গাপুর ও বাঁকুড়ার স্পঞ্জ লোহা কারখানার ব্যাপক দূষণ এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদার রাসায়নিক কারখানার দূষণে মানুষের সার্বিক বিপন্নতা ইত্যাদি এমন আরও অনেক। এসব দেখে সত্যি করেই মনে ভয় জাগে যে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ বার্তা ব্যর্থ করে সমস্ত পৃথিবীটাই এভাবে পরিবেশ শরণার্থী অঞ্চল না হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় পাঠ্যবইয়ের গুরুত্ব

কৌশিক চিনা, পিনাকী চ্যাটার্জী, অভিনিবেশ কুমার, পত্রলেখা ভট্টাচার্য এবং দেবব্রত মজুমদার

শেখার সাথী (জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র)

জীবনকেন্দ্রিক ও শিশুকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যবই অপরিহার্য বলে আমাদের ধারণা। তাই আমরা আমাদের কাজের শুরুতেই কিছু বই তৈরি করে নিচ্ছি। পাশাপাশি সেই বইয়ের ব্যবহারের চেষ্টাও চালাচ্ছি। এই কাজ করতে গিয়ে আমরা আরও অনেকের সংস্পর্শে আসছি যাঁরা জীবনকেন্দ্রিক ও শিশুকেন্দ্রিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে নিশ্চিত। তাঁদের মধ্যে অনেকে বলছেন শিশুশিক্ষায় পাঠ্য বইয়ের ভালোমন্দ তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, যত্নশীল শিক্ষণই বড় কথা; ইচ্ছা থাকলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী শিখন-সামগ্রী তৈরি করে নিয়েই শেখাতে পারেন। তাছাড়া কত ভালো ভালো শিশুপাঠ্য রয়েছে, সেগুলো পড়লেই যথেষ্ট হবে, পাঠ্যবই চলনসই একটা কিছু হলেই হল। মাধ্যমিক স্তরের কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে যাঁরা যত্নশীল তাঁরাও অনেকে পাঠ্যবই সম্পর্কে অনেকটাই উদাসীন। তাঁরা বলেন পাঠ্যের বাইরের পড়ার জগৎই, পড়ার আসল জগৎ। ব্যক্তিগত নিষ্ঠা ও নিপুণতা দিয়ে তাঁরা তাঁদের চারপাশে এমন কিছু উদাহরণ গড়ে তোলেন যাতে তাঁদের কথা অনেকাংশেই সঠিক বলে মনে হয়। সাধারণ গ্রামের স্কুলে পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন এমন এক একজন শিক্ষক-শিক্ষিকা হয়ত যখন তখন ১৫-২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর নাম করে দিতে পারেন যারা প্রচলিত পাঠ্যবই পড়েই বড় হয়েছে, খুব ভালো শিখেছে। আবার আমাদের মতই অনেকে বলেন খুব ভালো এবং জীবনকেন্দ্রিক ও শিশুকেন্দ্রিক বই না হলে যথেষ্ট ভালো শিক্ষণ সম্ভব নয়। দু-চার জন ব্যতিক্রমই মাত্র পাঠ্যের বাইরের জগতের বই ব্যবহার করে তা থেকে অনেক শেখে।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে চাইছি সাধারণভাবে স্কুলের ছেলেমেয়েরা কী ধরনের কতগুলো বই পড়ে। এজন্য আমরা ''আমাদের স্কুলজীবনে বইয়ের ব্যবহার''— বিষয়ে একটা সমীক্ষার কাজে হাত দিয়েছি। সেই অনুসন্ধানে স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে তারা কোন ক্লাসে পড়ার সময় কতগুলো পাঠ্য বই এবং কতগুলো অন্য বই পড়েছে। এই সমীক্ষার ক্ষেত্রে 'পাঠ্য বই' বলতে স্কুল থেকে যেসব বই দেওয়া হয় বা স্কুলের বইয়ের তালিকায় যেসব বইয়ের নাম থাকে সেগুলো বোঝাচ্ছে। 'মানে বই', 'ছাত্রবন্ধু', 'প্রশ্ন বিচিত্রা' জাতীয় বই এই তালিকায় থাকবে না। অন্য বই বলতে

বোঝতে চাওয়া হয়েছে 'মানে বই', 'ছাত্রবন্ধু', 'প্রশ্ন বিচিত্রা' জাতীয় বই, গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা-ভ্রমণকারিনী-জনপ্রিয় বিজ্ঞান জাতীয় বই ও পত্র-পত্রিকার সংকলন ইত্যাদি।

আমরা সচেতন যে 'মানে বই', 'ছাত্রবন্ধু', 'প্রশ্ন বিচিত্রা' জাতীয় বই আর গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা-ভ্রমণকাহিনী-জনপ্রিয় বিজ্ঞান জাতীয় বই ও পত্র-পত্রিকার সংকলন দুটো আলাদা ধরনের বই। তথ্য সংগ্রহের সময় এ দুই ধরনের বইকে একই তালিকায় রাখা হয়েছে। তবে তথ্য বিশ্লেষণের সময় নানা রকম 'নোট বই' আর 'অন্য বই' আলাদা স্থান পেয়েছে। মূখ্যত আমরা দেখতে চেয়েছি শিক্ষাজীবনের এক একটা পর্বে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহৃত বইয়ের সংখ্যায় ''পাঠ্য বই ঃ নোট বই ঃ অন্য বই''— এই অনুপাতটা কত। এই অনুপাত থেকেই 'ভালো' পাঠ্য বই তৈরি কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অনেকটা বোঝা যাবে।

মূলত গ্রামাঞ্চলের তিনটে স্কুলে এই সমীক্ষা করা হয়েছে। দুটো স্কুল হুগলিতে, একটা হাওড়ায়। এছাড়াও নানা স্কুলের অল্প কিছু ছাত্রছাত্রী ও কয়েকজন উচ্চশিক্ষিতের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই সমীক্ষার পদ্ধতি, ফল এবং সেই ফলে কতটা ত্রুটি থাকতে পারে তার একটা অনুমান (estimate) দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই আলোচনা পত্রে।

শিশুর শিক্ষা ঃ চেনা থেকে অচেনায় যাওয়ার বাস্তবসম্মত পথ

পৃথা ব্যানার্জী, শুভ্রা মজুমদার, গৌতম কর এবং দেবব্রত মজুমদার

শেখার সাথী (জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র), ডিহিবাগনান

শিশুর শিক্ষা তার চেনা জগৎ থেকে শুরু হবে— শিশুশিক্ষার আধুনিক তাত্ত্বিকদের মধ্যে এ নিয়ে বড় একটা দ্বিমত নেই। নিজের চারপাশ দেখতে দেখতে আর কাছের লোকদের কথা শুনতে শুনতে শিশু বড় হয়ে ওঠে। এসব তার কাছে দিন-রাত্রির মত স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতা তার লেখাপড়া শেখার শুরুতেও থাকা দরকার। একথাও সবাই মানেন। কিন্তু কীভাবে এই স্বাভাবিকতা পাঠ্যে আনা সম্ভব? বই বাদ দিয়ে শিশুর কাছাকাছি জগতে যা আছে তা দিয়ে শিশুর শিক্ষা শুরু হলে সেটা অনেকাংশে সম্ভব হতে পারে। এই ভাবনায় অনেকে এভাবে শিশুশিক্ষা শুরু করেছেন। কিন্তু এ ধরনের চেষ্টা বেশি ব্যাপ্তি পায়নি। এতে শিক্ষক-শিক্ষিকার যে দক্ষতা ও নিষ্ঠা লাগে তা খুব বেশি মানুষের পক্ষে দেখানো সম্ভব নয়। তাছাড়া যাঁরা বই বাদ দিয়ে শিশুর শিক্ষা এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাঁরাও তা বেশি দূর নিয়ে যেতে পারেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরে যখন বই এসেছে তখন শিশু বইয়ের সাথে আগের পদ্ধতির সার্থক সমন্বয় ঘটাতে পারে নি, আর পাঁচজনের মতই মুখস্থনির্ভর হয়েছে। তাই যখনই প্রথম বই আসবে তখনই তার সাথে শিশুর এতকালের শিক্ষার সামঞ্জস্য করার প্রশ্ন উঠবে। ফলে শুরুতেই এমন বই আনতে পারলে ভালো হয়, যা শিশুর সেই সময়ের জীবন ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বর্ণপরিচয়ের আগে যদি শিশুকে চেনা জিনিসের ছবির বই দেওয়া যায় তো ভালো। ছবি দেখে কীসের ছবি তা যেন পরপর বলতে পারে শিশু। সেই কথা যদি শিশুর কানে ছড়ার মতো শোনায় তো আরও ভালো। বইয়ের সাথে শিশুর মনের একটা টান তৈরি হবে। এরপর দেখতে হবে কোন বর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ শিশুর কাছে বেশি পরিচিত। সেইসব শব্দ যদি ছবি দিয়ে বোঝানো যায় তাহলে আরও ভালো। শিশু শুরুতে ঐসব ছবি দেখেই শব্দগুলো বলবে। সেই উচ্চারণ যদি ছড়ার ছন্দ আনে তাহলে আরও সুবিধে হবে, স্বাভাবিকতা বজায় রাখার। পাশে লেখা বর্ণ, মাত্রা আর শব্দ দেখতে দেখতে ঐ চিহ্নগুলোর সাথে শিশুর আংশিক পরিচয় হয়ে যাবে। তারপর তাকে বলতে হবে বর্ণ আর মাত্রাগুলোর নাম। অনেক সহজে শিখতে পারবে শিশু। শুধু বর্ণপরিচয় নয়, তারপরও কিছুদিন শিশুর চেনা জগতের কথাই তার বইতে থাকা উচিত। মাতৃভাষা ব্যবহারে তার আত্মবিশ্বাস জন্মাবার আগে অচেনা জিনিস বা বিষয়ের কথা লিখিত ভাষায় পড়তে হলেও তাকে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হওয়ার পরিশ্রম করতে হয়। তাই শুরুতে দরকার শিশুদের নিজের জীবনকেন্দ্রিক বই। বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুর পরিবেশের পার্থক্যের জন্য বিভিন অঞ্চলের জন্য কিছুটা আলাদা বই। অনেকেই এর প্রয়োজন বুঝেছেন, কিন্তু এই প্রস্তাব মানছেন না। তার কারণ হিসাবে তাঁরা যেসব আশঙ্কা প্রকাশ করছেন সেগুলো হল, এমন করলে ঃ

কেন্দ্রিয়ভাবে পরীক্ষা নেওয়া যাবে না।

বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুরা পরস্পরকে চিনতে শিখবে না।

কেন্দ্রিয়ভাবে, একই প্রশ্নে সব শিশুর পরীক্ষা নিয়ে কী লাভ হয় তা বোঝা মুশকিল। বাস্তবে এতকাল বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুদের একই বই পড়ানোর ফলে তারা পরস্পরকে চিনতে শিখেছে নাকি পড়ার মাধ্যমে অন্যকে চেনা যায় এটাই বুঝতে পারেনি, সেটাও এক প্রশ্ন। তবে এসব নিয়ে পরীক্ষা করা উচিত কিনা সে বিষয়ে বিচার-বিবেচনা আশু প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই এই আলোচনাপত্র। ন্যাশনাল কারিক্যুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (এন সি এফ)-২০০০৫-এর প্রাসঙ্গিক বক্তব্য তুলে ধরে এবং দু-চারটে অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে এখানে আলোচনা করেছি। বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুর জন্য কিছুটা আলাদা বই দিয়ে শুরু করার পর কীভাবে ও কোন পর্যায়ে সবার জন্য একই বই আনা বাস্তবসম্মত হতে পারে তা নিয়েও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় ঘরোয়া ভাষা ঃ প্রয়োজনীয়তা ও প্রয়োগের কয়েকটা দিক

শাশ্বতী মজুমদার, শুভ্রা মজুমদার, পিনাকী চ্যাটার্জী, গৌতম কর ও দেবব্রত মজুমদার
শেখার সাথী (জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র), ডিহিবাগনান

আমাদের শিশুদের যে ভাষায় শিক্ষা শুরু করতে হয় তার নাম 'মান্যচলিত ভাষা'। প্রকৃত অর্থে তা একটা বিশেষ অঞ্চলের 'অভিজাতদের' কথ্যভাষা। তাই অনেকটা অচেনা ভাষায় লেখা বই দিয়ে ঐসব অঞ্চলের 'অনভিজাতদের' ও অন্য অঞ্চলের সব শিশুর বর্ণপরিচয় হয়। ফলে অনেকেরই বর্ণপরিচয় ঠিকমত হয় না এবং অনেকেই বই পড়তে শেখে না। তারা পড়া ছেড়ে দেয়। যারা ঐ প্রথম ধাক্কাটা যা হোক করে কাটিয়ে ওঠে, তারা কিছুতেই ঐ মান্যচলিত ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করা শিখতে পারে না, প্রাণপণে নোট মুখস্থ করতে বাধ্য হয়। এই সমস্যা কমপক্ষে একশ' বছর আগে থেকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ১৯০৫-০৭ সালে বাংলাকে চারটে উপভাষা অঞ্চলে ভাগ করে চার অঞ্চলের জন্য চার রকম ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই প্রস্তাবকে রবীন্দ্রনাথসহ তখনকার শিক্ষিত বাঙালিরা তীব্র নিন্দা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, 'ভাষাভাগ বিরোধী' আন্দোলন হয়েছিল ও সেই আন্দোলনে অনেকেই অংশ নিয়েছিলেন যাঁরা গ্রামের গরীব কৃষিজীবী, মুখ্যত যাঁদের শিক্ষার সুবিধা করার উদ্দেশ্যে এই ভাগাভাগির প্রস্তাব। যে কমিটি ঐ বিভাজনের কথা বলেছিল সেই কমিটি নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল যে ভাষার সমস্যাতে আটকে যাওয়ার জন্য বাংলার 'নিম্নবর্গের' মানুষরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে পারছে না, এই ভাবনা থেকেই ঐ প্রস্তাব।

লক্ষ্য করার বিষয়, 'ভাষাভাগ বিরোধী' আন্দোলনে অনেকেই অংশ নিয়েছিলেন যাঁদের ছেলেমেয়েরা 'ঘরোয়া ভাষা'য় পড়তে না পারার কারণেই নিরক্ষর থেকে যাচ্ছিল। কিন্তু তখনকার স্বদেশী 'এলিট' শ্রেণির 'জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক গ্রাস' তাঁদের চিন্তাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করেছিল। অবিভক্ত বাংলায় চার রকম ভাষায় শিক্ষা শুরু হলেও সাধারণ ঘরের সব শিশু 'ঘরোয়া ভাষা' পেত না ঠিকই, তবে সকলেই কিছুটা সুবিধা পেত তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া চার রকম ভাষায় শুরু করার পর ক্রমে ক্রমে আরও অনেক স্থানীয় ভাষায় বই তৈরির কথাও তখনকার প্রস্তাবে ছিল। অবশ্য সে প্রস্তাব কার্যকর করার মত অবস্থা সেদিন ছিল কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

শতবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজ পরিস্থিতি অনেকটা বদলেছে, অনেকেই বলছেন শিশুর ঘরোয়া ভাষার শিক্ষারম্ভ প্রয়োজন। ন্যাশনাল কারিক্যুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (এন সি এফ)-২০০৫ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর অবস্থাটা হয়ত এক লাফে অনেকটা বদলেছে। কারণ ঐ দলিলে প্রত্যেক শিশুই যাতে তার ঘরোয়া ভাষায় শিক্ষা শুরু করতে পারে তার জন্য জোরালো সওয়াল আছে ঃ ...And when we talk of home language (s) or mother tongue(s), it subsumes the languages of home, larger kinship group, street and neighbourhood, i.e. languages(s) a child naturally acquires from her/his home and societal environment...

তাই আজ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন 'শিশুর ঘরোয়া ভাষায় তার প্রাথমিক শিক্ষার বই' দিয়ে শুরু করলে শিশু কত বছরে ভাষার মূল কাঠামো সম্পর্কে অনুভূতি লাভ করতে পারবে? তারপর তাকে তার নিজের ভাষার সাথে মান্যচলিত ভাষার সম্পর্ক শেখাতে আর কত বছর লাগবে? এভাবে কী সত্যিই তার সুবিধে হবে, নাকি তার পক্ষে পরে মান্যচলিত ভাষায় নানা বিষয় শেখা কঠিন হয়ে যাবে? এসব নিয়ে পরীক্ষা করে না দেখলে সঠিক অবস্থা বোঝা যাবে না, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে পরীক্ষার অনেক পূর্বপ্রস্তুতি দরকার। দেখতে হবে, শিশুদের যেন ক্ষতি হয়ে না যায়। আরও প্রশ্ন, উপযুক্ত বই তৈরি এবং শিক্ষক-শিক্ষণ সম্ভব হবে তো?

এই সব বিষয়ে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে এই আলোচনাপত্র। অদূর ভবিষ্যতে শিশুর শিক্ষা তার ঘরোয়া ভাষায় শুরু করা সম্ভব এবং তা করলে শিশুর অনেক সুবিধা হবে— এমন সম্ভাবনা দেখছি আমরা। কীভাবে, তা বলব এখানে।

শিশুর সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা ঃ বিকল্প পথের সন্ধানে

অঞ্জনা মজুমদার, অভিনিবেশ কুমার, কৌশিক চিনা, পৃথা ব্যানার্জী এবং দেবব্রত মজুমদার
শেখার সাথী (জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র), ডিহিবাগনান

শিশুশিক্ষার পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞান বলতে বোঝায় ইতিহাস ও ভূগোল। অতীতের সমাজ ও পরিবেশ নিয়ে ইতিহাস। বর্তমানের সমাজ ও পরিবেশ নিয়ে ভূগোল। অতীতে কী করার ফলে কী ঘটেছে তা জানা ও বর্তমানে কী করলে ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে তার আন্দাজ পাওয়ার জন্য ইতিহাস চর্চা, যাতে সেই আন্দাজ কাজে লাগিয়ে বর্তমানের কর্মপন্থা স্থির করা যায়। বর্তমানের প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি জানা, বোঝা ও উন্নততর পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য ভূগোল শেখা। কিন্তু আমাদের ইতিহাস-ভূগোল চর্চায় এসব ভাবনা স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক স্তর থেকে কলেজ পর্যন্ত অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীর কাছে ইতিহাস মূলত মুখস্থ করার বিষয়। ছাত্রছাত্রীর মূল্যায়নও নির্ভর করে তার মুখস্থ করার ক্ষমতার উপর। ফলে ইতিহাস চর্চার মূল উদ্দেশ্য প্রায় ব্যর্থ। ভূগোলের ক্ষেত্রে অবস্থাটা একটু ভালো হলেও যথেষ্ট ভালো নয়।

শিশুর ইতিহাস-ভূগোলের চর্চাও বিজ্ঞানসম্মতভাবে হতে পারে।

অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান থাকতে পারে তাতে। সমাজ ও পরিবেশের অতীতকে শিশুর কাছে আকর্ষণীয় করা যায়। তার জন্য দেখতে হবে, অতীত সম্পর্কে জানতে গিয়ে শিশু যেন বার বার ধাক্কা না খায়। বরং সে যেন অনুভব করে যে এমনটা হয়ে থাকা খুবই সম্ভব। আর অতীত সম্পর্কে বহু ক্ষেত্রেই মানুষের জ্ঞান যে খুব অসম্পূর্ণ সেটা যেন শিশুও অনুভব করতে পারে। তার যুক্তিবোধ দিয়ে সেও যেন ভাবার সাহস পায় কোনটা ঘটে থাকা সম্ভব। অতীত সম্পর্কে জানার পদ্ধতি কি তাও যেন সে অনুভব করা শুরু করে। সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করে সে শিখতে চাইলেই ভালো হয়। নিজের বর্তমান পরিবেশের মধ্যেই সে চেষ্টা করা যায়— এই অনুভব যেন তার মনে আসে।

এজন্য সুদূর অতীত থেকে শিশুর ইতিহাস পাঠ শুরু করলে হবে না, তা শুরু করতে হবে তার চেনা পরিবেশের ইতিহাস দিয়ে। আবার চেনা পরিবেশের বর্তমান জানার মাধ্যমেই হবে ভূগোল চর্চা। ভূগোল শেখার জন্য শিশুকে কাছাকাছি নানা জায়গায় ঘুরতে দিতে হবে। কোথায় কি আছে তা কীভাবে দেখতে হয় তা বাস্তবে দেখা আর বইতে দেখার সম্পর্ক বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। শিশু যত জায়গা দেখবে তার ম্যাপ আঁকবে। কোথায় কি দেখল তা ছোট ছোট ছক করে লিখতে শিখবে সে। এভাবে তার শিক্ষা ক্রমশ জীবনমুখী হয়ে উঠবে।

বর্তমানের পর আসবে সাম্প্রতিক অতীত। তা জানার সময়েই শিশুর মনে প্রশ্ন জাগবে কেন এই পরিবর্তন? এই পরিবর্তন কী হঠাৎ সাম্প্রতিক কালেই শুরু হল? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মধ্যেই ইতিহাস চর্চার সার্থক শুরু হতে পারে। এইভবে শুরু হলে ধাপে ধাপে পাঠ্য বিষয়ের দেশ-কাল এর পরিধি দূর অতীতে পৌঁছোবে। এভাবে শিশুকে সমাজবিজ্ঞানে আগ্রহী করে ইতিহাস ও ভূগোল বই লেখা যায় কী? বইয়ের সাহায্যে কী কার্যকরভাবে বোঝানো সম্ভব যে পড়া আসলে কাজ শুরু করার জন্য? শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক-অভিভাবিকাদের পক্ষে কী এ ধরনের বই ও তা ব্যবহারের তাৎপর্য বুঝতে পারা সম্ভব?

এই সব বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে এই আলোচনাপত্রে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বইতে যেসব বিষয় আছে, প্রায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে শেখার সাথী এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বই লিখেছে। তবে ইতিহাস ও ভূগোলকে দুটো আলাদা বিষয় হিসাবে দেখার বাধ্যবাধকতা এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগে বাধাও দিয়েছে। এই বইয়ের পরিচয় দেওয়া এবং শিশুশিক্ষায় ইতিহাস ও ভূগোল বিষয় দুটোকে একেবারে মিশিয়ে দেওয়ায় কত উপকার হতে পারে তার আলোচনাও এই পত্রে আছে।

শিশু পাঠ্যের সামাজিক বৈষম্য দূর করায় শেখার সাথীর বই

মিতা চৌধুরী, শুভ্রা মজুমদার, পত্রলেখা ভট্টাচার্য ও দেবব্রত মজুমদার

শেখার সাথী (জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র), ডিহিবাগনান

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরনের স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে প্রাথমিক স্তরের নানা ক্লাসে নানা রকম বই পড়ানো হয়। অবশ্য আশি শতাংশের বেশি স্কুলে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বই ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও অনেক বিখ্যাত লেখক-লেখিকার অনেক শিশুপাঠ্য বই আছে। শিক্ষা-সচেতন বাবা-মায়েরা শিশুদের সেসব বই পড়তে উৎসাহ দেন। এই সব বইতে লেখক-লেখিকারা অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের বাস্তবতাকে স্থান-কালের সীমায় বিশ্বস্তভাবে চিত্রিত করেছেন। ফলে সমাজের ধর্মীয় সংস্কার ও কুসংস্কার, জাতিভেদপ্রথা, আর্থিক বৈষম্য, পিতৃতান্ত্রিকতা ইত্যাদি ত্রুটি সেসব লেখায় চলে এসেছে। একটু খুঁটিয়ে দেখলে অধিকাংশ বইতে মোটামুটিভাবে পাঁচ ধরনের সামাজিক বৈষম্য বেঝা যায়—

● ধর্মীয় ঃ অন্য ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মকে উপরে তুলে ধরার প্রবণতা।

● জাতি, পারিবারিক পেশা ইত্যাদি সামাজিক বিচার ঃ যারা 'মানসিক শ্রম কিংবা পরশ্রমজীবি' তাদের পরিবারের শিশুরা বই পড়বে অনুমান করা হয়, কায়িক শ্রমজীবী শিশুদের পক্ষে বইকে 'আমার বই' ভাবা সম্ভব হয় না।

● আর্থিক অবস্থান ঃ 'আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল' পরিবারের শিশুরা বই পড়বে অনুমান করা হয়, গরীব শিশুর পক্ষে বইকে আপন ভাবার উপকরণ বইতে তেমন থাকে না।

● লিঙ্গ ঃ লিঙ্গভেদে মানুষের কাজ আলাদা আলাদা আর মেয়েদের শক্তি ও বুদ্ধি কম— বইতে এমন ভাবনার আবহ থাকে।

● ভাষা ঃ কলকাতা ও কাছাকাছি শহরের কথ্যভাষা (মান্যচলিত ভাষা) বইতে ব্যবহার করা হয়।

হয়ত ধর্মীয় বিচারের ত্রুটির প্রতিবাদ করতেই কিছু কিছু ব্যক্তিগত /অসরকারি সংগঠনের উদ্যোগে ইসলাম ধর্মকে উপরে তুলে ধরে বর্ণপরিচয় ও পরবর্তী পর্যায়ের বই বেরিয়েছে। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হয়নি। একই ত্রুটির অন্য পিঠ সামনে এসেছে প্রকৃত অর্থে ত্রুটি কমেনি। বরং সচেতনভাবে ত্রুটি আনা হয়েছে।

অনেক বইয়ের রচয়িতারা এসব বৈষম্য পছন্দ করেন না। কিন্তু তবুও তাঁরা এমনটাই করে ফেলেন। এমন একটা সামাজিক পরিবেশে আমরা থাকি যে বিশেষভাবে সচেতন হয়ে এসব ত্রুটি এড়ানোর চেষ্টা না করলে এগুলো লেখার মধ্যে ঢুকে পড়ে। যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় পাঠ্য বইয়ের রচয়িতারা কাজ করেন তাও তাঁদের কোন কোনও ত্রুটি আনায় বাধ্য করে কী? এই সমস্ত প্রসঙ্গের বিশ্লেষণসহ কেন এমন ঘটে আর কী করলে এমন ঘটার সম্ভাবনা কমবে— এসবের সন্ধানে গত কয়েক বছর ধরে কাজ করে চলেছে আমাদের সংগঠন শেখার সাথী।

এন সি আর টির ন্যাশনাল কারিক্যুলাম ফ্রেমওয়ার্ক-২০০৫ এ বলা হয়েছে, শিক্ষা শুরুর সময় প্রত্যেক শিশুকে তার পরিবেশের সাথে

ভালোরকম মানানসই বই দিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় ঘরোয়া ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। অন্যান্য সামাজিক বৈষম্যগুলো বইতে না থাকা নিশ্চিত করতে হবে। তার জন্য বই লেখা শেষ করার পর নানা সংস্কৃতি শিশুদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য করার জন্য বইতে কয়েকটা নাম বা বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রবণতার কথা ন্যাশনাল কারিক্যুলাম ফ্রেমওয়ার্ক-২০০৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "...In syllabus designing and textbook writing, the items showing sensitivity to culture differences often come in as afterthoughts rather than as in-built features of the process."

প্রচলিত বইয়ের এসব সমস্যার বিশ্লেষণ করে ও ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক-২০০৫ এর প্রাসঙ্গিক বক্তব্যগুলো তুলে ধরে শেখার সাথীর বইগুলো কতটা পরিমাণে ঐ সমস্যাগুলো থেকে মুক্ত হয়েছে তা বিচার করা এ আলোচনাপত্রের উদ্দেশ্য। শেখার সাথীর বইয়ের উদাহরণ দিয়ে এখানে দেখানো হয়েছে যে ন্যাশনাল কারিক্যুলাম ফ্রেমওয়ার্ক-২০০৫-এর দাবি মতো

- শিশুর কাছের পরিবেশের প্রসঙ্গে
- প্রত্যক্ষ উৎপাদনী শ্রমের প্রসঙ্গে
- শিশুর ঘরোয়া ভাষায়

বই লেখা হলে অনেক ধরনের সামাজিক বৈষম্যমুক্ত পাঠ্য রচনা করা সহজ হয়। যথাযথ বিষয় ও ভাষায় লেখার সুযোগ না পেলে শুধু মনে মনে সচেতন হয়ে সব রকম সামাজিক বৈষম্য এড়িয়ে বই লেখা কঠিন, হয়ত অসম্ভব।

প্রাথমিকের পাঠক্রম 'অসংরক্ষিত' করে শিক্ষায় 'সংরক্ষণ'-এর প্রয়োজন দূর করতে হবে

অরিজিৎ বিষ্ণু, অভিনিবেশ কুমার, পূবালি জানা, গৌতম কর ও দেবব্রত মজুমদার

শেখার সাথী (জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র), ডিহিবাগনান

সংবিধানের ৯৩তম সংশোধনীর ভিত্তিতে তৈরী উচ্চশিক্ষায় অন্যান্য অনগ্রসর জাতির জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণের বিল বিগত বাদল অধিবেশনে লোকসভায় পেশ হল। এর বিরুদ্ধে সংরক্ষণ বিরোধীদের আন্দোলনও অব্যাহত। অন্যদিকে তফসিলি জাতি, জনজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্তদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু শ্রেণিই সংরক্ষণের সুবিধা পেয়ে আসছে এবং এরই ফলে এই শ্রেণিগুলির মধ্যেই তৈরি হচ্ছে এক ধরনের বর্ণবৈষম্য। এর প্রকাশ দেখা যাচ্ছে কিছু জায়গায় দলিতদের মধ্যে বঞ্চিত গোষ্ঠীর আন্দোলনে। হয়ত অন্যান্য অনগ্রসর জাতির জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ হবে কয়েকটা ধাপে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার প্রায় ৬০ বছর পরেও কেন এই অবস্থা? একথা ভাবতে হবে। কেননা, কারণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সমস্যার সমাধান-প্রচেষ্টা, সমস্যার উপর একটা প্রলেপ দিতে পারে মাত্র। যাঁরা সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন করছেন, তাঁদের মুখ্য যুক্তি সংরক্ষণে 'মেধা'-র অপমৃত্যু ও অপচয় হচ্ছে। যাঁদের যুক্তিগুলো শুনে মনে হয় 'মেধা' যেন ঐতিহাসিক ও আর্থসামাজিক কারণ বহির্ভুত এক বিষময় বস্তু। আবার যাঁরা তাঁদের আন্দোলন বন্ধ করতে বলছেন, তাঁরাও কখনও এই সমস্যার গোড়ার গলদের কথাটার বিশ্লেষণ করতে পারছেন না। ফলে আলোচনার মুখ্য বিষয় হয়ে উঠছে কত শতাংশ সংরক্ষণ সঠিক, কোন জাতি সংরক্ষণের যোগ্য বলে স্বীকৃতি পেতে পারে ইত্যাদি। আবার তফসিলি জাতি ও জনজাতির জন্য সংরক্ষিত আসন পূরণ করতে গিয়ে বহু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন ঃ কেন তথাকথিত নিম্ন শ্রেণির মানুষেরা উচ্চশিক্ষার প্রবেশদ্বারেই আসতে পারছে না?

'গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা'র দৃষ্টিভঙ্গি কখনও কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে না। তথাকথিত নিম্ন শ্রেণির মানুষদের জীবন দৈহিক কর্মনির্ভর। অথচ আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা একান্ত ভাবেই বইমুখী, একটুও কর্মমুখী নয়। যাঁরা তথাকথিত 'মানসিক শ্রম' অথবা 'পরশ্রম' নির্ভর, শিক্ষা বইমুখী হলেই তাঁদের ছেলেমেয়েদের সুবিধে হয়। তাই বলতে হয় আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম কার্যত 'উঁচু' জাতের লোকদের ছেলেমেয়েদের জন্য সংরক্ষিত। তথাকথিত নিম্ন শ্রেণির শিশুদের নিজস্ব কথ্য ভাষায় তাদের বর্ণপরিচয়ের সুযোগ নেই। তাদের পাঠ্য বিষয়ের সাথে তাদের নিজেদের জীবনের মিল নেই। হতাশায় দিন দিন তারা শিক্ষাঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থকে। এই অবস্থা বদলাতে তথাকথিত 'নীচু' জাতের ছেলেমেয়েদের নিজেদের পাড়ার ভাষায়, চেনা জীবনের কথায় বর্ণপরিচয়ের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। তাদের যেসব কাজ জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজন মেটায়, হাতে কলমে করার জন্য সেইসব কাজ এবং পড়ার জন্য সেইসব কাজের কথা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এভাবে শিক্ষা শুরু করলে কি ঐ শিশুরা আধুনিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তর কেন হ্যাঁ-বাচক, সেটাই এই আলোচনা পত্রের অন্যতম প্রধান বিষয়। ২০০৫ সালে শিক্ষা বিষয়ে National Curriculm Framework (NCF)-2005 প্রকাশিত হয়েছে। তার সাহায্য নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম এমনভাবে উন্নত করা সম্ভব যার ফলে একই সাথে প্রাথমিকের পাঠক্রম 'অসংরক্ষিত' হওয়া শুরু হবে ও প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান সংস্কৃতি গড়ে ওঠা শুরু হবে। তবে পাঠক্রম পরিবর্তনের এই প্রস্তাব যতক্ষণ না কার্যকর হচ্ছে ততক্ষণ 'দুধের অভাবে ঘোল'-এর মত তথাকথিত নিম্ন শ্রেণির মানুষদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে হবে। সর্বক্ষেত্রে আধিপত্যকারী উঁচু শ্রেণির লোকদের উপর নতুন পাঠক্রম চালু করার জন্য চাপ বজায় রাখতেও অনগ্রসর শ্রেণির মানুষদের সংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষণ বজায় রাখা দরকার।

NCF-2005 প্রকাশিত হওয়ার আগে থেকেই শেখার সাথী এই ধরনের শিশুশিক্ষার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত সে কাজ আকারে খুবই ছোট, তবে NCF-2005 প্রকাশিত হওয়ার পর তা বৃহত্তর মাত্রা পেয়েছে। সেই কাজের কথাও এই আলোচনাপত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক।

পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায় সম্পর্ক স্থাপন ঃ একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

ঋদ্ধি ভট্টাচার্য
ইতিহাস বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা

পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া উপঅঞ্চল (Sub-region) গঠিত বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি (আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশ) পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম নিয়ে। এই উপ-অঞ্চলটির আয়তন ৬৮৮.৬ হাজার বর্গ কিমি, জনসংখ্যা প্রায় তিরিশ কোটি এবং মাথাপিছু গড় আয় তিনশো মার্কিন ডলারের সামান্য বেশি। এই উপ-অঞ্চলটিকে পৃথিবীর সব থেকে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অঞ্চলের একটি বলে গণ্য করা হয় এবং এখানকার মানব উন্নয়ন সূচকও বিশেযত ভারতের উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলিতে খুব কম। আবার অন্যদিকে এই অঞ্চলটিরই গঙ্গা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা পৃথিবীর উর্বর অঞ্চলের অন্যতম। প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদেও (হাইড্রো-পাওয়ার, কয়লা, হাইড্রোকার্বন প্রভৃতি) অঞ্চলটি সমৃদ্ধ। ফলে সব মিলিয়ে এই অঞ্চলটিকে পৃথিবীর সস্তা শক্তির ভাণ্ডার বলা চলে। এছাড়াও এই অঞ্চলে রয়েছে প্রচুর খনিজ সম্পদ, বন সম্পদ, প্রাণী ও সামুদ্রিক সম্পদ, এবং সুগঠিত বন্দর ব্যবস্থা। এখানে বিপুল মানবসম্পদকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে একটি পরিশ্রমী শ্রমিক বাহিনী গঠন করা সম্ভব। শুধু ভৌগোলিক প্রকৃতি, যেমন— পাহাড়, অরণ্য ও নদী দিয়েই অঞ্চলটি যুক্ত নয়, একই রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও (যেমন, বন্যা, খরা ও পরিবেশ দূষণ) অঞ্চলটিকে বিপর্যস্ত করে।

এই উপ-অঞ্চলের সম্ভাব্য ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সমস্যার একসঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য ১৯৯৬-এ প্রতিষ্ঠিত হয় একটি উপ-আঞ্চলিক চতুর্ভুজীয় সহযোগিতা ব্যবস্থা (South Asian Growth Quadrangle বা SAGQ)। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, ভারতের উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলি ও পশ্চিমবাংলা নিয়ে এটি গঠিত। এই উপ অঞ্চলটিতে অনেকে আবার 'পূর্ব দক্ষিণ এশীয় উপঅঞ্চল' (Eastern South Asia Subregion-ESAS) আখ্যা দিয়েছেন। এই অঞ্চলেরই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা ব্যবস্থা 'সার্ক' গত দু দশকেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু উন্নতি ঘটাতে পারেনি। তাই দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার প্রবৃদ্ধিজাত ত্রিভুজ বা উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ব্যবস্থা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার কূটনৈতিক মহলেও বৈদেশিক ঋণ দাতাদের (যেমন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও জাপান দারিদ্র দূরীকরণ সংস্থা) প্রণোদনায় SAGQ গঠন করা হয়।

SAGQ এর গঠন নতুন হলেও ঐতিহাসিক দিক থেকে বলা যায়, এই পূর্ব দক্ষিণ এশীয় ভৌগোলিক এলাকাটিতে খুবই প্রাচীন কাল থেকে একটি যোগসূত্রের অস্তিত্ব আছে। কারণ এই অঞ্চলের মানুষের জীবনধারা ও সংস্কৃতি (কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের কিছু অংশ ছাড়া) প্রায় একই রকম, ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াতের মধ্যে যোগাযোগও অব্যাহত। কিন্তু প্রথমে ইংরেজ এবং পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জন ও দেশভাগের ফলে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে।

এই অঞ্চলের অতীত যোগাযোগের লিখিত সূত্র খঁজতে গেলে আমাদের কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। সেখানে ভারত ও নেপালের মধ্যেকার উন্নত বাণিজ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। নেপাল ও তিব্বতের বিভিন্ন পণ্য পূর্ব ভারতে আসতো পাহাড়ী পথ দিয়ে। নেপাল, ভারত ও তিব্বতের বাণিজ্যে মধ্যবর্তী ভূমিকা পালন করেছে। এই তিব্বত ও নেপালের পণ্য উত্তর ভারত থেকে আসতো আফগানিস্তান, এমনকি মধ্য এশিয়া পর্যন্ত। ভারতের কিছু পণ্যের নেপালে খুব চাহিদা ছিল (যেমন— মশলা, নুন, সিল্কের কাপড়)। ভারত আবার নেপাল থেকে ভেষজ, চামড়া ও কিছু ধাতু আমদানি করতো। ঔপনিবেশিক আমলেও ইংরেজরা নেপালের মধ্য দিয়ে ভারত ও তিব্বতের বাণিজ্য বৃদ্ধির যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। নেপালের গুর্খা রাজারা স্বাতন্ত্র্যের নীতি অনুসরণ করতে শুরু করলে ধীরে ধীরে এই বাণিজ্য কমতে থাকে।

উত্তর-পূর্ব ভারত ও ভুটানের যোগাযোগের লিখিত প্রমাণ প্রথম পাওয়া যায় ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে। তখন ভারতের এক ধর্ম গুরু পদ্মাসম্ভব ভুটানে বৌদ্ধ ধর্ম স্থাপন করেন এবং তা ধীরে ধীরে ভুটানের সামাজিক ও ধর্মব্যবস্থার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধর্মীয় ও সামাজিক যোগাযোগ ছাড়াও ভারত ও ভুটানের বাণিজ্যিকসম্পর্ক ছিল এবং এই বাণিজ্যে আসাম ও কুচবিহার বিশাল ভূমিকা পালন করতো। এমনকি আসাম ও অরুণাচল প্রদেশের মাধ্যমে ভারতের পণ্য তিব্বত ও চীনের উনান অঞ্চল ও বার্মাতেও যেতো। কিন্তু বৃটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা এবং দেশভাগের ফলে নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টির কারণে এই যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়।

এই অতি দরিদ্র অঞ্চলকে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে উন্নতির নতুন প্রচেষ্টা গ্রহণের বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে। এই অঞ্চলের মধ্যে সহযোগিতার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যেমন— বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, পরিবহণ ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পরিকাঠামোগত উন্নতি ও শক্তি এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে। এছাড়াও এই উপঅঞ্চলের সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পর্ক স্থাপন আরও সহজ হবে এবং একটি বৃহৎ এশীয় গোষ্ঠী গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার মধ্যে দিয়ে এই এলাকাটিকে পৃথিবীর একটি উন্নত এলাকা হিসাবে গড়ে তোলার ভিত্তি রচনা করা সম্ভব হবে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও ভেবে দেখা দরকার। বিশ্বায়ন কর্মসূচির মাধ্যমে পৃথিবীর উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি আজ তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে নতুন কায়দায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও লুণ্ঠনের কলঙ্কিত অতীতকেই আবার ফিরিয়ে আনতে চাইছে। এই

পটভূমিকায় কার্যকরী প্রতিরোধী আঞ্চলিক বা উপআঞ্চলিক গোষ্ঠিবদ্ধতা সঠিকভাবে পরিচালিত হলে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বায়ন কর্মসূচির বিরুদ্ধে দেশগুলির স্বার্থরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। সাম্প্রতিককালে লাতিন আমেরিকা ও কিছু পরিমাণে আফ্রিকায় তার প্রমাণ মিলেছে। আমাদের আলোচ্য উপঅঞ্চলের ক্ষেত্রেও, এশীয় ব্যাংক প্রভৃতি বিশ্বায়নের হাতিয়ারগুলি প্রাথমিকভাবে সমর্থন জানালেও, সেটা ঘটানোর বাস্তব সম্ভাবনা বিরাজ করছে। সে ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট সবার ভেবে দেখা দরকার।

সমাজ উন্নয়নে নারীর ভূমিকা

সোমা বাগ
শিক্ষিকা, পার্বতীপুর বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক), হাওড়া

উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক গতিশীল ধারণা। তবে যে মাত্রাতেই একে ব্যাখা করা হোক না কেন, এর শুরু একটি নির্দিষ্ট স্তর থেকেই। যাকে আমরা বলি ব্যক্তি উন্নয়ন। যার পরবর্ত্তী ধাপে রয়েছে সামাজিক উন্নয়ন। এ দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। বরং একের সমষ্টিগত রূপেই অপরের প্রকাশ। অনেকটা বিন্দু বিন্দু করে সিন্ধু দর্শনের মতো। তবে এই দুই স্তরের মধ্যে সেতুর মতো কাজ করে পরিবার। একটি পবিার একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত উন্নয়নকে সহজেই সামাজিক উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ব্যক্তিকে সমাজের প্রয়োজনীয় মানব সম্পদে পরিণত হওয়ার পথকে প্রশস্ত করে। এই ব্যক্তি যদি পরিবারের কোনো নারী হয়, তবে পরিবারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের রূপটি সামগ্রিক ভাবে পরিস্ফুটিত হয়। যা পরবর্তী পর্যায়ের ব্যক্তি উন্নয়নের পথকে সুগম করে দেয়। একটি নারীর উন্নয়ন মানে, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা, সমাজ সচেতনতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সকল দিকেই তার উন্নয়ন। যা নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটায়। তবে এই উন্নয়ন একটি চক্রে সম্পূর্ণ হয়ে থেমে যায় না। বরং চক্রবৎ সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে থাকে। এই উপলব্ধির আলোচনা প্রসঙ্গেই প্রবন্ধটির উপস্থাপনা।

জাতিভেদ প্রথা, উন্নয়ন এবং রাষ্ট্র

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
আনন্দচন্দ্র কলেজ, জলপাইগুড়ি

জাতিভেদ প্রথা আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এক কুরুচিসম্পন্ন মানসিকতার প্রতিফলন। এই প্রথা আবহমানকাল ধরে আমাদের চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা লালিত পালিত হয়ে সমাজের অন্তর্গত সর্বহারা সম্প্রদায়ের মানববর্গকে প্রতিনিয়তই কুরে কুরে খাচ্ছে। এই প্রথা সমাজসৃষ্ট এমন একটি চিরাভ্যস্ত রূপ যার দ্বারা শুধু মেহনতী মনুষ্যবর্গই আক্রান্ত হয় না; সমগ্র সমাজব্যবস্থার কাঠামোই ভঙ্গুর হয়ে যায়। কারণ, যে কাঠামো মানুষকে শান্তির ছায়া নীড় দান করে সুস্থিত জীবনে পদার্পণ করানোয় অঙ্গীকারবদ্ধ সেখানে এই সামাজিক ব্যবস্থা নামক অবয়ব যখন জাতপাতের মতো হীনজঘন্য প্রথাকে প্রশ্রয় দান করে মানুষে মানুষে হানাহানি, দাঙ্গা, বিভেদ প্রথা আনয়ন করে তখন বলতে আর বাধা থাকে না যে সমগ্র সমাজব্যবস্থাই একটা ভেঙে যাওয়া চির খাওয়া বর্বরোচিত মনোভাবাপন্ন কিছু উচ্চবিত্ত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মানুষের কুৎসিত নগ্ন রূপ।

এই জাতিভেদ প্রথার মূল কারণ একাধিক। সেগুলিকে এভাবে সূত্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

যথা— (ক) মানুষের মধ্যে অন্ধকুসংস্কার, (খ) ভ্রান্ত ধারণা, (গ) শিক্ষার অভাব, (ঘ) সনাতনী ধারণা, (ঙ) বিবেকবুদ্ধিবর্জিত অমানবিক জীবনাচরণ, (চ) জ্ঞানানুশীলনের অভাব, (ছ) সংহতির অভাব— এ সবের একত্র সমাবেশে জাতিভেদপ্রথা বৃহদাকার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এই প্রথা আমাদের সমাজব্যবস্থায় একটা অভিশাপ স্বরূপ। এই প্রথার কুফল বড়ই ভয়াবহ; কারণ—

(ক) এই জাতিভেদ প্রথা মানুযে মানুযে বিভেদ, বৈষম্য সৃষ্টি করে।

(খ) এই প্রথা মানুযেব মধ্যে পশুত্ববোধ জাগ্রত করে।

(গ) এই প্রথা মানুষকে অনাস্থাশীল করে তোলে।

(ঘ) মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ফাটল ধরায়।

(ঙ) মানুষের মধ্যে হিংসার বীজ রোপন করে।

(চ) নিম্নবর্গ তথা সাধারণ জনমানব নিরাপত্তার অভাব বোধ করে।

(ছ) খেটে খাওয়া মানুষের 'জাতিভেদ' নামক কু-প্রথার পক্ষাবলম্বনে যারা তাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাব।

(জ) সমাজ নৈরাজ্যের অসুস্থ পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে।

(ঝ) মানুষের মধ্যে মূল্যবোধের অভাব ঘটে। সে মূল্য অবশ্যই মানবিক।

(ঞ) সহায় সম্বলহীন মানুষ অস্তিত্বের সংকটে ভোগে।

(ট) সমাজব্যবস্থার চাপে নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা হারিয়ে যায়।

(ঠ) কিছু সংখ্যক মানুষ হীনমন্যতায় ভোগে। তার ফলে তাদের পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়।

এই জাতিভেদ প্রথা যাতে সমাজ থেকে উচ্ছেদ হয়ে যায়, এই

কুপ্রথা যাতে সমাজে থেকে চিরতরে বিনষ্টির পথে যায় তার জন্য সমাজের তথা ধনতন্ত্রী মানবগোষ্ঠীর মধ্যে উন্নয়নমূলক পরিবর্তন ঘটার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সুদূর অতীতকালে এমনকি মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে আমরা এই জাতিভেদাভেদ লক্ষ্য করে আসছি। কারণ শুধু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবক্ষেত্রেই নয়, মধ্যযুগের সাহিত্যেও যখন জাতিভেদের কথা উল্লিখিত দেখি তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না মধ্যযুগেও এর চল ছিল। 'মনসামঙ্গল-কাব্যে মনসা দেবী হয়েও উচ্চবর্ণে স্থানলাভের আকাঙ্ক্ষায় যখন চাঁদসদাগরকে দিয়ে মর্ত্যে পুজো প্রচার করে নিজ মহিমার আপিত্য ঘোষণা করলে ক্রূর হিংসা স্বভাবের রূপ পরিগ্রহ করেন তখন বিস্ময় জাগে। শুধু তাই নয়, 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কালকেতু পালায় কায়স্থ, গোপ, মুসলমান-এ সমস্ত ভিন্ন জাতের মধ্যে সাম্প্রাদয়িক দিক প্রদর্শন করলেও বিজাতীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন আমাদের জাতিভেদের কথা স্মরণ করায়। যদিও শ্রীচৈতন্যদেব ''রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু কৃষ্ণ স্বরূপম্''— রূপে ষোড়শ শতাব্দীতে সমগ্র মানব জাতিকে নবভাবের প্লাবনে ভাসিয়ে তাদের অন্তরাত্মাকে পরিশুদ্ধ করে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও এখন সমাজের কিছু অসভ্য মাতব্বর গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ এই কদর্যরূপকে দিনে দিনে বহুগুণে বর্ধিত করে সমাজকে অবিশুদ্ধ করে তুলছে।

এই অবিশুদ্ধরূপ যাতে সহজে দ্রুতগতিতে বিশুদ্ধির রূপ ধারণ করে সে দিকে দেশের সমস্ত মানুষকেই দৃষ্টি দিতে হবে। তবেই সমাজ থেকে এই ধূলিমলিন পাপাচার বিদূরিত হবে। যথা (ক) মানুষে মানুষে মৈত্রীবদ্ধ সংঘ গঠন করতে হবে। (খ) এক মানুষেব বিপদে আরেক মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে, তার সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে হবে। (গ) সকল মানুষকে দয়া মায়া মমতার মানবিক চেতনায় আশ্লিষ্ট হতে হবে। (ঘ) সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদী মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। সর্বদা সৎভাবনার দ্বারা চালিত হয়ে ন্যায়নীতিবোধ আক্রান্ত হতে হবে। (ঙ) সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ, ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচার বোধ গড়ে তুলতে হবে। (চ) নিজস্ব আত্মশক্তিতে আস্থাশীল হতে হবে। রাষ্ট্রশক্তির কাছে মানুষের সম্মানকে বজায় রাখতে হবে। (ছ) বিবেকবোধ জাগ্রত করতে হবে। স্মরণে রাখতে হবে—

''যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'

'অপমানিত'/'গীতাঞ্জলি'

রবীন্দ্রনাথেব এই বাণী, মন রাখতে হবে

বিবেকানন্দের সেই যুগন্ধর বাণী— ''জীবে প্রেম করে যেই জন।/সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।।'' — তবেই দেখা যাবে সমাজের তথা রাষ্ট্রিক পরিকাঠামোয় হীনচেতা কিছু মানুষ এই কু-প্রথানুসারী হতে গিয়েও অজস্র মানুষদের দ্বারা প্রতিহত হয়ে চৈতন্যোদয় ঘটাবে, নিজেদের অসভ্য মন-মনন মেজাজের আমুল রূপান্তরের জন্য প্রয়াসী হবে। এইভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠী যদি জীবনকে বৃহৎ ব্যপ্তির আলোকে বিলীন করতে পারে, তবেই মানুষ যেমন আপন দৈন্যকে অতিক্রম করতে পারবে, তেমনি পারবে পৃথিবীকে সর্বসুন্দর, মঙ্গলময়, সর্বমালিন্যমুক্ত স্বচ্ছ পবিত্র আনন্দময়রূপে গড়ে তুলতে।।

জাতীয় উন্নয়নে সংরক্ষণের ফলিত প্রয়োগ

মনোহরমৌলি বিশ্বাস
ভি আই পি নগর, কলকাতা

গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বসবাস করার ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠে মানুষের সমাজ। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিরই আছে আলাদা আলাা সত্তা। প্রতিটি মানুষই সমাজ নির্মাণের উপাদান। একটি উপাদানের সাথে আরেকটি উপাদানের আছে বহুবিধধ আত্মসম্পর্ক। এই সম্পর্ক কখনও সরল, কখনও জটিল। আত্মসম্পর্ক তৈরিতে প্রভাব বিস্তার করে ভৌগোলিক পরিবেশ, স্থানীয় জলবায়ু, গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা সুযোগ প্রভৃতি বিষয়। ব্যক্তি উন্নয়নে এবং বংশগত উজ্জ্বল পরম্পরা সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রতিযোগিতার জন্ম হয়। প্রতিযোগিতায় যাঁরা সামনে থাকেন তাঁরা ধরে রাখতে চান নিজেদের অবস্থান। আবার পিছনে থাকাদের মধ্য থেকে কেউ বা চলে আসেন সামনে এবং সামনে থাকারা কেউ চলে যান পিছনে। একদল আবার পিছনে পড়তে পড়তে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংকটের মধ্যে পড়েন। সমাজবিজ্ঞানের নিরিখে 'সংরক্ষণ' তাই সমতা গড়ার হাতিয়ার। সর্ব দেশে সর্ব কালেই তার ফলিত প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে।

পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে শিল্পবিপ্লবের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল সামাজিক উপাদানের শ্রেণী। পুঁজিপতিদের শোষণের হাত থেকে শিল্পের শ্রমিক শ্রেণীকে বাঁচাতে গিয়ে প্রয়োজন পড়ে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। মালিকদের সাথে শ্রমিকদের মুখোমুখি সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে শ্রেণীর উদ্ভবের ইতিহাস আলাদা। বৈদিক ভারতে জীবিকা হিসাবে পশুপালন প্রধান অবলম্বন ছিল। আর্যগোষ্ঠীর মানুষেরা যুক্ত ছিলেন পশুপালনের সাথে। ভূমিকর্ষণের বিদ্যা অধিগত ছিল না তাঁদের। পশুপালনের পেশায় নিযুক্তরা কোথাও স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন না। যাযাবর শ্রেণীর আর্যরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং ভিন্নতর সেই সভ্যতার মানুষেরা সাথে করে এনেছিলেন তাঁদের বহু দেবদেবীর ধারণা। চন্দ্র সূর্য আকাশ বায়ু মেঘ বৃক্ষ পাহাড় প্রভৃতি প্রকৃতি থেকে নেওয়া অনেককিছুই পুজিত হতেন দেবতা হিসাবে। আর্যসভ্যতার আকরগ্রন্থ বেদ-এ ওই সকল দেবদেবীর তুষ্টি বিধানে যে-সব যাগযজ্ঞ করতে হয় তা বলা আছে। ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণে আর্যরা বহিরাগত এমন কথা দীর্ঘদিন ধরে বলা হলেও অধুনাকালের পণ্ডিতেরা ভিন্ন ব্যাখ্যা বলছেন। তাঁরা বলছেন, আর্যরা এদেশের সন্তান।

বৈদিক ভারতের মানুষের সমাজ গোষ্ঠীতে প্রতিযোগিতা ভিন্নতর

এক মাত্রা পেয়েছিল। এক শ্রেণীর মানুষ কৃষিকাজে দক্ষ হয়ে উঠলেন। দেশেব ভূমিসন্তানেরা যাঁরা প্রাক-আর্য সভ্যতার মানুষ বলে কথিত, জাতীয় মূল উৎপাদনে তাঁদের অবদান তাঁরা যুগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন, শ্রম দিয়ে পুকুর খনন করতেন, সেচের খাল কাটতেন। উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে ছিল সকল নজর। তাঁদেরই কায়িক শ্রমের উৎপাদনের 'সারপ্লাস' দিয়ে গড়ে উঠল পরান্নভোজী কায়িক শ্রমে বিমুখ জনগোষ্ঠী। তাঁরা ছিলেন শ্রমবৃত্তের বাইরে। তাঁরাই মস্তিষ্কের কাজে তরতর করে এগিয়ে যেতে লাগলেন। বেদের নানা ব্যাখ্যাশাস্ত্র লিখতে শুরু করলেন তাঁরা। শতাধিক উপনিষদদ রচিত হল, লেখা হল শতাধিক স্মৃতিশাস্ত্র। এইসব গ্রন্থাদির রচয়িতারা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ কড়াকড়ি আইন-কানুনের মধ্যে বেঁধে ফেললেন। মস্তিষ্কের চর্চায় তাঁদেরই একমাত্র অধিকার এবং কেলবমাত্র তাঁদেরই আছে সে যোগ্যতা এমন এক স্থায়ী ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেল ভারতবর্ষে।

বেদের ক্ষেত্রভূমি ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে জন্ম নিল শাসক ও শাসিতের। মস্তিষ্কের চর্চা করে মুষ্টিমেয় সংখ্যার মানুষ হলেন শাসক এবং দেশের শাসন ব্যবস্থা বিচার ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পদের মালিকানা সবকিছুতে দখল পেলেন তাঁরা। শাসিতরা সংখ্যায় বিপুল হয়েও প্রায় দাসশ্রমিকে পরিণত হয়ে গেলেন। বেদের নানা ভাষ্যকার ও স্মৃতিকারকদের প্রচার কল্যাণে বেদভিত্তিক ধর্ম— হিন্দুধর্মের অধীনে শাসক ও শাসিত উভয়েরই অবস্থান। হিন্দুধর্মের বিভেদময়তাকে চ্যালেঞ্জ করে কখনও উদ্ভব হয়েছে জৈন ধর্মের, কখনও উদ্ভব হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের, আবার কখনও উদ্ভব হয়েছে শিখ ধর্মের। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মূল পরিকাঠামোগত শক্তির অধীনে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলিত প্রয়োগ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অথচ দেশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে যাঁরা আছেন, তাঁরা দেশের পনের শতাংশ পরিবারের মধ্যে উচ্চশিক্ষা চাকুরি বিচার শাসন প্রভৃতির আশি শতাংশ ভোগ দখলে রাখছেন। এক্ষেত্রে আমেরিকার 'এফারমেটিভ একশন'-এর মতো সংরক্ষণের ফলিত প্রয়োগ জরুরি— একান্ত জরুরি।

বিশ্বকাপ ফুটবল ও বাঙালী সমাজ

কুনাল দাশগুপ্ত
সাংবাদিক কিক্ অফ্

'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ' এই নামেই ফিফা বিশ্বকাপের সার্বজনীন পরিচিতি গোটা বিশ্বজুড়ে। ৪ বৎসর অন্তর পৃথিবীর কোন একটি প্রান্তে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগীতার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন গোটা বিশ্বের ফুটবলার, কর্মকর্তা, কোচ ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক থেকে শুরু করে বিপনন জগতের তাবড় কর্তাব্যক্তিরা। অপেক্ষা করে থাকে বাঙালী সমাজও, বিশ্বকাপ ফুটবলকে কেন্দ্র করে বাঙালী সমাজের সর্বত্র শহর, গ্রাম ও গঞ্জে যুবা থেকে বৃদ্ধা কারওরই উৎসাহ, উদ্দিপনা ও উত্তেজনার শেষ থাকে না। যে দেশটি কোন দিনই বিশ্বকাপের মূলপর্বের আঙিনায় পৌছতে পারেনি সেই দেশের একটি অঙ্গরাজ্যের অধিবাসীদের বিশ্বকাপ জ্বরে আক্রান্ত হওয়া নিঃসন্দেহে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে ভীষণই একটি কৌতুহলের বিষয়।

১৯১১ সালে গোরাদের বিরুদ্ধে খালি পায়ে খেলে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক শিল্ড জয় বাঙালীর মননে ফুটবলকে পাকাপাকিভ্রবে জায়গা করে দিয়েছিল। এরপর মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের উত্তাল এবং ৩০ এর দশকে পরপর ৫ বার লিগজয়, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় শরণার্থী মানুষজনের ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে কেন্দ্র করে সামাজিক আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার মরিয়া লড়াই, সব মিলিয়ে ফুটবলকে বাঙালি সংস্কৃতির এক বিশেষ অঙ্গে স্থাপিত করেছিল। ঔপনিবেশিক আমল থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় ফুটবলের একটি বড় বৈশিষ্ট্য ছিল খালি পায়ে খেলা। এই সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদার লড়াই ছিল অলিম্পিকের ময়দান। ৫০ ও ৬০ এর দশকে ভারত ৪ বার অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করেছিল। এবং যথেষ্ট ভাল ফলাফল করেছিল। অলিম্পিকের আসরে ভারতীয়দের খালিপায়ে বুটপরা বিদেশিদের দল এর বিরুদ্ধে লড়াই বাঙালী সমাজে বিশেষ সমাদর অর্জন করেছিল। যদিও বিশ্বকাপ ফুটবলের সূচনা হয়েছিল ১৯৩০ সালে কিন্তু বিশ্বকাপ সম্বন্ধে বাঙালী সমাজে সেই ধরনের কোন আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৫০ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ মূলপর্বে খেলার জন্য ফিফা ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো স্বত্বেও খালিপায়ে খেলার জেদ ধরে রাখায় সেবার আর ভারতের বিশ্বকাপে খেলে ওঠা হয়নি, তাতেও বাঙালী সমাজের সেই সময় খুব একটা হেলদোল হয়েছিল বলে জানা নেই কারণ বাঙালীদের কাছে বিশ্বকাপ ফুটবল কোন কৌলিন্যই আদায় করতে পারেনি। যাবতীয় ফোকাস গিয়ে পড়েছিল অলিম্পিকের উপর। নামেগোত্রহীন এই বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্যই যে একদিন এই বাঙালী সমাজ পাগল হয়ে উঠবে ঘুণাক্ষরেও সেদিন তা কেউ আন্দাজ করে উঠতে পারেনি।

এরপর ভারতীয় ফুটবলের ক্রমাবনতির ফলে অলিম্পিকের সঙ্গে একটা বড় ধরনের দূরত্ব তৈরী হল। এদেশের ফুটবল বাঁধা পড়ল ক্লাব ফুটবলে। গোয়া বা কেরলের বাড়বাড়ন্ত তখনও হয়নি। কলকাতাই তখন ছিল ভারতীয় ফুটবলের নিউক্লিয়াস। যার মূলে রয়েছে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং এর মতো নামী ক্লাবগুলা। এও সত্যি যে কলকাতা ফুটবলকে অক্সিজেন যুগিয়েছে জাতপাত বা ধর্ম। এপার বাংলার ফুটবল পাগল মানুষের মননে শুধুই যেমন মোহনবাগান, ঠিক তেমনই ওপার বাংলার ছিন্নমূল মানুষের প্লাটফর্ম ছিল ইস্টবেঙ্গল, আবার সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্মাদনা ছিল মহমেডানকে ঘিরে। মোদ্দা কথা বিশ্বফুটবল থেকে অনেকদূরে থেকে এদেশের মানুষ বিশেষ করে বাঙালী ফুটবলের

রসাস্বাদন করেছে 'তিন প্রধান' এর সংকীর্ণ ভাবনার মধ্য দিয়ে। বিশ্ব ফুটবল যখন বিকশিত হচ্ছে বাঙালী তখন পরমানন্দে দিন কাটিয়েছে পাতকুয়োর ছোট্ট পরিসরে।

এমনটাই চলেছিল সাতের দশকের শেষার্ধ পর্যন্ত। তখন বিশ্বফুটবেলের জগৎ থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে ভারত যেন অন্য এক গ্রহ। অমল দত্তর মত কিছু কিছু মানুষ ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকার ফুটবলের সঙ্গে বাঙালীর একটা সম্পর্ক তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। বাঙালীর মন প্রথমবার হোঁচট খেল ১৯৭৮ সালে। বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল দু-তিন দিন পরে দূরদর্শনের পর্দায় দেখে। আর্জেন্টিনা-হল্যান্ড ম্যাচ দেখার পর বাংলার মানুষ সেই প্রথমবার যেন একসঙ্গে বলে উঠল, ''কি দেখিলাম জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।'' বাংলার মন দ্বিতীয়বার ঝাঁকুনি খেল ১৯৮২ সালে। বিশ্বকাপ ফুটবলের সেমিফাইনাল, ফাইনাল প্রথম সরাসরি দেখার মধ্য দিয়ে। ফুটবল প্রেমী মানুষ আসমান-জমিনের পার্থক্যটা উপলব্ধি করতে শুরু করল সেই থেকে। এরপর যতদিন গেছে বিশ্বকাপে সরাসরি না থেকেও বিশ্বকাপের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে বাঙালী সমাজ।

১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপের আগে বুষ্টার কেনার হিড়িক উঠল কলকাতায়। বুস্টারের সাহায্যে বাংলাদেশের টেলিভিশনে বিশ্বকাপ দেখা। এদেশের অর্থনতিতে পা বাড়াল বিশ্বকাপ, শুরু হল বিশ্বকাপ উপলক্ষে রাত জাগা। ওলট পালট হয়ে গেল গণমাধ্যমেও, বিশ্বকাপ কভার করতে ছুটলেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিকরাও। বিশ্বফুটবলের সঙ্গে আরও বেশি করে পরিচিত হতে থাকলেন সাধারণ মানুষ। সবুজ-মেরুন, লাল-হলুদ ও সাদা-কালোর তামাম ফুটবলপ্রেমীরা নতুনভাবে ভাগ হয়ে গেল ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, জার্মানিতে। এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারল না এখানকার ফুটবলাররাও। তাঁদের আচার আচরণেও চলে এল বিশ্বকাপ ফুটবল। বিদেশিদের মতো জার্সি থেকে শুরু করে চুলের স্টাইলও বদলে গেল বিশ্বকাপের ধাক্কায়।

যে ফুটবলের নাম শুনলে বিজ্ঞাপনদাতারা নাক সিঁটকোতেন তারাই বিজ্ঞাপনের ডালি নিয়ে ছুটতে শুরু করলেন বিশ্বকাপের প্রভাবেই। বাঙালি মহিলারাও একটা সময় পর্যন্ত খেলোয়াড় বলতে শুধুমাত্র সৌরভ সচিন বুঝতেন, এখন তাঁদের আলোচনাতেও ঢুকে পড়েছে রোনল্ডিনহো, বেকহ্যাম, জিদানরা। অর্থাৎ ফুটবলের মহাযজ্ঞ ঢুকে পড়েছে বাঙালীর রান্নাঘরেও। আর তাই এই বিশাল বাজার ধরতে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নন বিজ্ঞাপনদাতারা। বিভিন্ন টেলিভিশন সংস্থা থেকে পত্র পত্রিকার সংস্থাগুলিও প্রচুর আকর্ষণীয় সুযোগের ডালি সাজিয়ে আনেন শুধুমাত্র এই মহাযজ্ঞের আসরে বাড়তি ইন্ধন যোগাতে।

বাঙালী সংস্কৃতিতেও চলে এসেছে বিশ্বকাপ। ১৯৭৮ সালে শারোদৎসবের আলোকসজ্জার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল শ্যাম থাপার বিখ্যাত ব্যাকভলি, আর এই ২০০৬ এর সেই আলোকসজ্জায় ঝলমলিয়ে উঠল জিদানের গুঁতো মেরে লালকার্ড দেখার ঘটনায়। আর আধুনিক থিম কেন্দ্রিক দুর্গোৎসবের অন্যতম প্রধান থিম হয়ে উঠেছে বিশ্বকাপ ফুটবল। বাঙালীর নাট্যচর্চাতেও এখন বিশ্বকাপ, অশোকনগর নাট্যমুখ সস্থার সৌজন্যে ফুটবল কেন্দ্রিক নাটক 'অপারেশন ২০১০' এখন রীতিমত জনপ্রিয়।

বিশ্বকাপ আজ বাঙালীর ঘরে ঘরে, সমাজে অর্থনীতিতে সংস্কৃতিতে। শুধু ভারতের বাঙালী সমাজই নয়, প্রতিবেশী বাংলাদেশেব বাঙালীরাও বিশ্বকাপ পাগল হয়ে উঠেছেন। বাঙালী সমাজ এখন ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মান এক একটি দেশের উপনিবেশ। রাজনৈতিক আনুগত্যের স্থান নেয় ফুটবল আনুগত্য। বস্তুত এটাই সেই বিশ্বকাপ ফুটবল যা বিশ্বায়নের আগেই বাঙালী সমাজকে পৌঁছে দিয়েছিল বিশ্বের দরবারে। তাই ব্রাজিলের সাম্বা, স্পেনের বুলফাইট বা জার্মানীর কিলার ইন্সটিংক্টই বাঙালীর মজ্জাগত হয়ে উঠেছিল এদেশে উদারনীতি চালু হবার অনেক আগেই।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা বনাম শহর কলকাতার যান নিয়ন্ত্রণ ঃ আমরা কোন্ পথে?

অমিয় কুমার বাউল

রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, কলকাতা

শহর কলকাতা আমাদের কাছে প্রতিবাদের শহর হিসাবে বিশেষ পরিচিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি পথ অবরোধের কৌশলকে আধুনিক কলকাতায় রাজনৈতিক দাবী আদায়ের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে তুলে ধরেছে। বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই রাজনীতি গণতান্ত্রিক চিন্তায় দৈনন্দিন জীবনে প্রতিবাদের এই অস্ত্রটি অতি সহজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশ্যই পথ-অবরোধ, মিটিং-মিছিল পৃথিবীর সর্বত্র গণতন্ত্রের অংশ। কিন্তু অনেকে মনে করেন, পথ-অবরোধ করা, যানজট করে মিছিল করা, বাড়ির মালিককে তোয়াক্কা না করে দেওয়াল লিখন— এগুলি আজ আন্দোলনকারীদের Customary rights এ পরিণত হয়েছে।

যদিও স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে থেকেই কলকাতায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইস্যুতে রাজনৈতিক প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে। একটা সময় পর্যন্ত এই প্রতিবাদ সভাগুলোর স্থল ছিল এই শহরের বিভিন্ন প্রান্তের সভাগৃহগুলি। ক্রমশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর যত চড়া হয়েছে তা ক্রমশ রাস্তায় নেমে এসেছে। গান্ধীর নেতৃত্বাধীন আন্দোলনের মধ্যে কলকাতা সবচেয়ে বেশী আলোড়িত হয়েছিল

বিয়াল্লিশের ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে। তবে তার আগেও বেশ কিছু বড় ধরনের রাজনৈতিক জমায়েত বা আন্দোলনের নজির পাওয়া যায়, যেমন— ১৯২৮ এর পার্কসার্কাস ময়দানে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন, ১৯৪০-এ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লকের হলওয়েল মনুমেন্ট বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে প্রাক-স্বাধীনতা আমলে ১৯৪৬-এ আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়কদের মুক্তির দাবিতে এবং নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে শহরের ছাত্র-যুব ও সাধারণ মানুষ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন তার ব্যাপকতা ছিল অভূতপূর্ব।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শহরকে একটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যার নাম উদ্বাস্তু সমস্যা। কারণ ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল মানুষ দলে দলে ভিটেমাটি ত্যাগ করে কলকাতা শহরে এসে ভীড় করেন। ফলে শহরের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোটাই বদলে যায়। সেই সঙ্গে পাল্টে যায় কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বামপন্থী আন্দোলন ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠে। মিটিং মিছিলের পাশাপাশি সচেতনভবে রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য পথ অবরোধ শুরু হয়ে যায়। সমকালীন সংবাদপত্রগুলিতে চোখ বোলালে কলকাতা শহরে পথ অবরোধের এই নতুন রাজনৈতিক অস্ত্রটির জন্মবৃত্তান্ত খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের চোখের সামনে উঠে আসে। ১৯৫২ সালের Free school movement, ট্রাম-বাস ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে শুরু করে আশি ও নব্বই দশকে এমনকি আজও মিটিং মিছিল ও পথ অবরোধ রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্রমে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে সরব হওয়া এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি কর্মব্যস্ত শহরবাসীকে একটি বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যার নাম যানজট। যে যানজট নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন পরিষেবাকে ভীষণভাবে ব্যাহত করে। তা সত্ত্বেও শহরের এমন কোন দল নেই যাঁরা এই রাজনৈতিক অস্ত্রটিকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাদের যুক্তি অবশ্য ভিন্ন। রাস্তা নামক 'পাবলিক স্পেস'টিকে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার আইনের বেড়াজালে বেঁধে রাখতে তাঁরা রাজী নয়। তবে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলিকে দোষারোপ করে লাভ নেই। কেননা দৈনন্দিন সংবাদপত্রগুলিতে চোখ রাখলে দেখা যায় যে অনেক সময়ই পথ অবরোধের কারণগুলি হল দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার প্রতিবাদী ভাষা। যেমন— যানবাহনের অসুবিধে, বাসের ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু, হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতি, পুলিশি জুলুম, পাড়ায় গুণ্ডারাজ, জল ও বিদ্যুতের সরবরাহে ত্রুটি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার পৌরসমাজের অনেক সমস্যা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বা প্রতিকারহেতু ধর্মঘট, রাস্তা রোকো, মিটিং-মিছিল ইত্যাদি মহাঔষধ হিসাবে কার্যকরী ভূমিকা নেয়।

এখন চিন্তার বিষয় হল ভবিষ্যত কলকাতায় যেখানে যানজট আরো বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন (এই আশঙ্কার বাস্তব কারণ অবশ্যই রয়েছে, কেননা রাস্তার পরিমাণ সেরকম না বাড়লেও গাড়ীর সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে) সেখানে নাগরিকের সুষ্ঠু জীবনযাপনের অধিকারের সঙ্গে কিছু সমষ্টির প্রতিবাদের অধিকারের সংঘাত অনিবার্য। নাগরিক জীবনের এই দুই অধিকারের সংঘাত শহর কলকাতাকে আগামী দিনে কোন পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করিয়ে দেবে তা সমাজবিজ্ঞানীদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তায় বিষয়।

ভারতবর্ষে সমাজবিপ্লব ও মানবেন্দ্রনাথ রায়

অরুনিমা রায় (চৌধুরী)
বিদ্যানগর কলেজ (ইতিহাস বিভাগ)

আলোচ্য গবেষণাপত্রটিতে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ এবং তারই সূত্র ধরে তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজবিপ্লব গঠন করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, এ সমস্ত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। মানবেন্দ্র রায়ের সমাজতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তা বিশেষত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় চিন্তাভাবনার ধারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। তবে মার্ক্সীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বেই ভারতীয় ভাবধারায় সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে পরিচয় ঘটার সুযোগ ঘটে।

প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, জন্ম ১৮৮৭। ১৪ বৎসর বয়স থেকেই রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দেন এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। জার্মানীর দ্বারা প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্র আনার জন্য তাকে ব্যাটাভিয়া পাঠান হয় কিন্তু অস্ত্র এসে পৌছয় না। এরপর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে রওনা হন চীন ও জাপান হয়ে। এখানেই তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে পরিচিত হন এবং একে তিনি ''নবজন্ম' বা 'Rebirth' বলে উল্লেখ করেছেন। এই সময় থেকেই সারা পৃথিবী ব্যাপী সামাজিক বিপ্লবকে সমর্থন করেন যা বেশিরভাগ মানুষকে স্বাধীনতা ও সাম্য দিতে পারবে। এখানেই তিনি মার্ক্সিয় সমাজতন্ত্রের সাথে পরিচিত হন।

তবে খুব শিগগির তাঁকে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে হয় এবং তিনি মেক্সিকোতে আসেন এবং মেক্সিকোর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তবে লেনিনের আহ্বানে তিনি মেক্সিকো ত্যাগ করেন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। তিনি সজাগ হতে শুরু করেন যে মানুষের মধ্যে চরম প্রয়োজন তাকে যে কোন বিপ্লবের দিকে চালিত করে এবং ভারতবর্ষে

একটি গন বিপ্লব ঘটানোর প্রতি মনোযোগ দেন। কমুনিষ্ট পার্টি গঠন তাঁর কাছে এই আন্দোলনের দিকে প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করেন যেটি ভারতবর্ষের ভূমিহীন কৃষকদের একত্রিত করবে। কমুনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেস তিনি যে তত্ত্বটি পেশ করেন সেখানে বলেন যে এশিয়ার দেশগুলির বিপ্লবের উপরে ইউরোপের বিপ্লবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করছে।

ইতিমধ্যে রায় ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টি গঠনের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং উজবেগিস্থানের তাসখণ্ডে ১৯২০ খ্রী. এটি গঠিত হয়। এই সময় রায় রচনা করেন 'ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিসন'' (India in Transition)। এই গ্রন্থে রায় লেখেন যে ভারতীয় প্রগতিশীল চিন্তাবিদ্ এবং জমিদার শ্রেণী এই দুই-ই ব্রিটিশ সরকারের অবদান এবং এঁরাই প্রথম ভারতবর্ষকে মুক্ত করার আন্দোলনের সূচনা করেন। এই আন্দোলনটির গতি পরিবর্তিত হয় এবং চরমপন্থীরা এই আন্দোলনটিকে এগিয়ে নিয়ে চলেন। অপরদিকে কারিগর ও কৃষকশ্রেণী নির্মম শোষণের শিকার হন। তাই রায়ের মতে কৃষিজীবীদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ছে, তাই প্রয়োজন একটি কৃষি বিপ্লবের যেটি একটি দলের মাধ্যমে সংগঠিত ও সুসংসঠিত হবে।

মানবেন্দ্রনাথ ১৯৩৬ খ্রীঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন, তবে তাকে শিগ্‌গির তা ছাড়তে হয় এই ভিত্তিতে যে তিনি ইংরেজ এবং মিত্রশক্তিদের সমর্থন করেন। তার প্রধান যুক্তি ছিল যে ফ্যাসিবাদ ইংরেজ ও মিত্রশক্তিদের দ্বারাই ধংস হবে। এইসময় থেকে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনগুলি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে শুরু করেন। তিনি র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন করেন এবং ১৯৪০-১৯৪৬ খ্রীঃ এর মধ্যে স্বাধীনোত্তর পর্বের ভারতের পুনর্গঠন নিয়ে বিস্তর লেখালেখি করেন। ১৯৪৪ খ্রীঃ স্বাধীন ভারতের সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন। এখানে ভারতবর্ষকে একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে চিহ্নিত করেন।

তবে রায়ের এই ধারণাগুলি বাস্তাবায়িত হয়নি এবং ১৯৪৬ খ্রীঃ রায় ২২টি তত্ত্ব নির্মাণ করেন যাকে নিউ হিউম্যানিসিম নামে অভিহিত করা হয়। এখানে রায় একটি চরম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মতবাদ পেশ করেন। যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।

অর্থাৎ ভারতবর্ষে সমাজবিপ্লব আনয়নের উদ্দেশ্যে মানবেন্দ্রনাথ সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে প্রথমে তুলে ধরেন। পরবর্তী সময়ে তা মার্ক্সীয় কমুনিষ্ট ভাবাবাদে পরিণত হয়। তবে বিশ্ব পরিস্থিতি এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা তাঁকে কমুনিষ্ট মতাদর্শ থেকে সরে আসতে বাধ্য করে এবং তিনি চরম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রত্যেকটি রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিচালিত হয়েছিল ভারতবর্ষে সামাজিক বিপ্লব গঠনের প্রয়াসে।

ভৌগোলিক অবস্থান এবং অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ঃ সাম্প্রতিক গতিধারা

শুভজিৎ ঘোষ

বিদ্যানগর কলেজ, ২৪ পরগণা

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা বিশ্বরাজনীতির বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সংহতি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্তকরণের ধারণাটি সম্পর্কে কৌতুহল ও গবেষণার শেষ নেই। বিশেষ করে বর্তমান উত্তর ঠাণ্ডা লড়াই পর্বে সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যিক লেনদেন তথা অর্থনৈতিক সহযোগীতার ক্ষেত্রটি ব্যাপকতা লাভ করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন বাজার দখলের লড়াই-এ ব্যস্ত। আলোচ্য অংশে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক উন্নয়নের গতিধারাতে মার্কিন প্রশাসনের অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। তবে একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এই পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বা বাণিজিক লেনদেন এক চূড়ান্ত আর্থিক সংকটের মোকাবিলার মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপটি পরিগ্রহ করেছে। ফলে একদিকে পুনরায় সংকট আগমনের আশঙ্কা রোধ করার পাশাপাশি অন্যদিকে বর্তমান আর্থিক প্রতিযোগীতায় বাজারে টিকে থাকার সংগ্রাম জারী রাখার যে চিত্র পাওয়া যায় তা যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের ভৌগোলিক অবস্থানও এই আর্থিক প্রতিযোগিতা তথা বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে আলোচ্য সূচীতে পূর্ব এশিয়ার ভূমিকাটিও সমানভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে।

সর্বোপরি বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার সহযোগিতা এবং আর্থিক শ্রীবৃদ্ধিতে মার্কিন প্রশাসন কিভাবে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে তার বিচার বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়।

দেশভাগের প্রেক্ষাপটে আশ্রয়হীন মানুষের প্রয়োজনে পরিবর্তিত কলকাতার পরিবহনের রূপরেখা

শ্যামাপ্রসাদ দত্ত ও রিয়া চক্রবর্তী

অধ্যক্ষ, পি. এন. দাস কলেজ (পলতা)

রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা

নগর কলকাতা গড়ে উঠেছে বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। বহু বছর ধরে বিভিন্ন "pulls and push" এর মাধ্যমে এর অগ্রগতি ঘটেছে। নগরায়ণের এই ইতিহাস এক সামাজিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে যেমন করা সম্ভব তেমনি একথাও সত্য যে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই নগরায়ণকে আজকের পর্যায়ে এনে দিয়েছে। এই ইতিহাস বিশ্লেষণের মাধ্যমে একদিকে যেমন নাগরিকদের সমাজ চেতনার আখ্যান লাভ সম্ভব তেমনি মানুষের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ সম্ভব। সাধারণভাবে বিশ্বের বিভিন্ন নগর যেভাবে গড়ে ওঠে কলকাতা সবসময় যে সেই পথ অনুসরণ করেছে তা নয়, নিজস্ব প্রয়োজনে তার পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা পরিচালিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ১৯৪৭-এর দেশভাগ— যা কেবলমাত্র দুটি রাষ্ট্রেরই সৃষ্টি করেনি বাংলা এবং পাঞ্জাব এই দুটি অঞ্চলকে বিভাজন করেছে। এই ঘটনা শতাব্দীর "Holocaust" হিসাবে চিহ্নিত। এর মধ্যে ফুটে উঠেছিল দীর্ঘদিনের মানসিক বৈষম্য, ব্যবসায়িক প্রয়োজন, রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা, শক্তির প্রশ্ন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার এক দৃষ্টিভঙ্গি। শেষ পর্যায়ে অথবা ১৯৪৭-এর ঠিক আগে এক ঐক্যবদ্ধ বাংলা সৃষ্টির জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রে কোন সক্রিয় চেষ্টা ছিল না। দেশজুড়ে পরিকল্পিত দাঙ্গা তৈরী হয়েছিল যা শেষপর্যন্ত দেশের বিভাজন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে দেশহীন আশ্রয়হীন লক্ষ লক্ষ মানুষ তৈরী করে দেয়। যাদের অনেকেরই প্রথম আশ্রয়স্থল শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্ম। কলকাতার এক বিস্তীর্ণ অংশ গড়ে ওঠে এই আশ্রয়হীন মানুষদের নিয়ে।

শিয়ালদহ প্ল্যাটফর্মের কেন্দ্র থেকে এই আশ্রয়হীন মানুষদের ঠিকানা হয় কলকাতা শহর। আবার অনেকের আশ্রয় হয় কলকাতার গণ্ডী ছাড়িয়ে বিভিন্ন জেলায় অথবা পশ্চিমবঙ্গের গণ্ডী ছাড়িয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত। বহু সমস্যা সঙ্কুল পরিবেশে এদের জীবনের নতুন ঠিকানা এবং জীবন চর্যার চিত্র ফুটে ওঠে বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে। কিন্তু মানুষগুলির দুঃখ দুর্দশার এখানেই শেষ নয়— এখান থেকেই এক নতুন জীবনের শুরু। এই নতুন জীবনের প্রয়োজনে মানুষের বাঁচার সংগ্রমের তাগিদে নগরায়ণের এক নতুন পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই মানুষগুলির মধ্যে যেমন বিভিন্ন ধরনের শ্রেণীভাগ আছে তেমনি আছে শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী বাসস্থানের সন্ধান। কারও অবস্থা স্বচ্ছল কারও অবস্থা অন্তত হত দরিদ্র। এদের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন রাস্তা— পরিবহনের বিভিন্ন মাধ্যম, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে এক সুষম সমাজ ব্যবস্থা গঠনের নতুন দর্শন এবং বিভিন্ন সরকারী বিভাগের নতুন কাজকর্ম। বর্তমান প্রবন্ধে দেশভাগের এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের কলকাতা কেন্দ্রীক যে অভিমুখ তা আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষত এই মানুষগুলির জীবনচর্চা তাদের সামাজিক সমস্যা এবং যাদবপুর থেকে গড়িয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বেশ কিছু আশ্রয়হীনদের আশ্রয়ের বাস্তব চিত্র এবং তাদের প্রয়োজনে পরিবর্তিত কলকাতার পরিবহনের রূপরেখা এবং তার দর্শন উপস্থাপিত করারও একটি প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে স্বাধীনোত্তর কলকাতার একটি নতুন সামাজিক চালচিত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে।

পারিবারিক হিংসা

রুমা দাশগুপ্ত

সমাজকর্মী

পারিবারিক হিংসা বলতে আমরা দম্পতির মধ্যে, প্রেমিযুগলের মধ্যে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে হিংসার পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা করছি। এই হিংস্রতার পরিবেশ কেবল শারীরিক নিগ্রহের রকমফের দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না— মানসিক নির্যাতন, আর্থিক পীড়ন, যৌন নিগ্রহ, সাংস্কৃতিক শ্লীলতাহানি ইত্যাদি নানান ব্যাভিচার ও বিকৃতি এই বিষয়টির অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এবং হিংসার প্রতিটি নমুনাই জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ ও স্থানবিশেষে বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে। সুতরাং কেবলমাত্র লিঙ্গ-পক্ষপাতিত্ব, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বা কেবলমাত্র মানবাধিকার ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিত থেকে এই সমস্যাটিকে আলোচনা করা যাবে না। এই সমস্যার আরেকটি দিক হল এই যে আপাতভাবে এটি সুখী বা দুখী গৃহকোণের নির্দিষ্ট সমস্যা বলে প্রতিভাত বা প্রচারিত হলেও শেষ বিচারে এটি একটি নাগরিক বা সামাজিক সমস্যা। তাহলে কি আইনগতভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব। অথবা ধরা যাক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে? এটি আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। এবং এইভাবে যদি আলোচনার পরিমণ্ডল বেড়েই চলে তাহলে কি কোনো সদর্থক সিদ্ধান্তে আসা আদৌ সম্ভব?

জাতিভেদ প্রথা, উন্নয়ন এবং রাষ্ট্র

স্বপন সরকার
আর্ন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যে সব সমস্যা ও বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হলো সামাজিক অসাম্য বা জাতিভেদ প্রথা। সামাজিক অসাম্যের ধারণা একটি ব্যাপক ধারণা। কারণ আধুনিক সমতাবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অসাম্য বা বৈষম্যের যে মূখ্য কারণগুলি আছে সেগুলি হলো সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, জাতিগত, অঞ্চলগত ইত্যাদি। সামাজিক অসাম্যের ফলে জন্মসূত্রে সমাজের সর্বাধিক অধিকার ভোগ করে এক শ্রেণী আর অপর শ্রেণী জন্মসূত্রে অধিকার ভোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

ভারতীয় হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে এবারে আলোচনা করা হবে। এক্ষেত্রে ড. আম্বেদকরের মতামতের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা, উন্নয়ন এবং রাষ্ট্র নিয়ে একটা মূল্যায়ন মূলক আলোচনা করা যেতে পারে। ভারতীয় হিন্দু সমাজে যে জন্মসূত্র অনুসারে চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা আছে। এক্ষেত্রে কর্ম গুণের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আলোপ করা হয়নি। এই চতুর্বর্ণ হলো যথাক্রমে— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। বিভিন্ন সময় চতুর্বর্ণকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সমাজের মধ্যে উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বাবাসাহেব মনে করতেন এই বর্ণ ব্যবস্থার লাঘব না ঘটালে ভারতীয় সমাজের উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তাইতো তিনি চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে সমতা আনার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশ করেছিলেন। এর ফলে তৎকালীন সময়ে অসাম্য দূরীকরণের আন্দোলনের ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী ও বাবাসাহেব আম্বেদকরের মধ্যে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

রাষ্ট্র ব্যবস্থা হলো সেই ব্যবস্থা যার মধ্যে দিয়ে সমাজের সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে ও সমস্ত ধরনের সামাজিক অধিকার অর্জন করতে পারবে। আর্দশ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকলে সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষকে এগিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাদের সমাজের উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে পারে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতীয় হিন্দু সমাজের বিশেষ করে শূদ্রদের উন্নয়নকল্পে সরকারি চাকুরীর ক্ষেত্রে ও পড়াশোনার ক্ষেত্রে এবং নানান সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংবিধানে বিশেষ বিশেষ কতগুলি অধিকারের কথা উল্লেখ আছে। বর্তমান বিশ্বায়নের সময়েও শূদ্রদের উন্নয়নের এই ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

দলিত-সংখ্যালঘু ঃ দলিত বৈষম্য এবং অধিকার

পার্থপ্রতিম সেন
লেকচারার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যানগর কলেজ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

ভারতীয় রাজনীতির অনেকটা জুড়ে রয়েছে জাতভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব। গত বিশ বৎসর যাবৎ দলিত সম্প্রদায় রাজনৈতিক ময়দানে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও দলিত সম্প্রদায় আজ বিভক্ত। হিন্দু বর্ণাশ্রমের অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে যে সমস্ত অর্স্পৃশ্যগণ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে সামাজিক মর্যাদার আশায় ইসলাম এবং খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন আজ তাঁরা সবদিক থেকে ব্রাত্য; একদিকে জাত হিন্দু অপরদিকে জাত মুসলিম অথবা জাত খৃষ্টানদের থেকে। রাষ্ট্রও তাঁদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণ নীতি এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কারণ তাঁরা হিন্দু বর্ণাশ্রমের বাইরে, অর্থাৎ সংরক্ষণ যুক্তির এক্তিয়ারে এঁরা আর পড়ছেন না। ধরে নেওয়া হয়েছে যে ধর্মান্তরিত হওয়ার সঙ্গে এঁদের আর্থিক উন্নতি এবং সামাজিক মর্যাদা প্রাপ্তি ঘটে গেছে, অতএব সংবিধানের ৩৩০-৩৪২ নং ধারার সুযোগ সুবিধা থেকে এঁরা বাইরে থাকবেন।

স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন ওঠে, এই দলিত-সংখ্যা ঘুদের অধিকারের দাবি সঞ্চালিত হবে কাদের মধ্য দিয়ে— দলিত সমাজ স্থিত দল বা সংগঠনগুলির মধ্য দিয়ে, নাকি সংখ্যালঘু ধর্মীয় (এক্ষেত্র মুসলিম ও খৃষ্টান) সংগঠনগুলির মধ্য দিয়ে? যেহেতু বিদ্যমান দলগুলির কর্মসূচীতে এঁদের অধিকারের বিষয়কে অর্ন্তভুক্ত করা হয়নি অথবা করা যাবে না অতএব দাবি উঠছে বিকল্পের— দল, সংগঠন, মঞ্চের— যা শুধুমাত্র দলিত-সংখ্যালঘু সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করবে। মূলস্রোত এর দলিত তাঁদের সরকারি মর্যাদা এবং মূলস্রোত এর ধর্মীয় সংখ্যালঘু তাঁদের সামাজিক মর্যাদা এই দলিত-সংখ্যালঘুদের দিতে নারাজ।

খৃষ্টান সমাজের মধ্যে দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যদের ক্রমশ মূলস্রোত এর খৃষ্টান সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। যাজক-পল্লী (Parish) থেকে গোরস্থান, পাদ্রী নিয়োগ থেকে বৈবাহিক সম্পর্ক; সর্বস্তরে রয়েছে বৈষম্য। অপরদিকে একই ভাবে আশরাফ-আজলাফ বিভাজন মুসলিম সমাজের মধ্যেও একপ্রকার অর্স্পৃশ্যতাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।

এর ফলে এক অদ্ভুত সামাজিক ও রাজনৈতিক (কিছু ক্ষেত্রে আইনি) সমস্যা তৈরী হয়েছে কিছু বিষয়কে কেন্দ্র করে— ধর্মান্তকরণ, সংরক্ষণ, সামাজিক অধিকার, দলগত আনুগত্য, সামাজিক স্থিরতা ইত্যাদি, যার প্রভাব সরাসরি পড়ছে ভারতের ঐক্য-সংহতি ও সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর।

এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে উপরোক্ত বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্বকে তুলে ধরা হবে।

প্রান্তদেশের উন্নয়ন ঃ সুন্দরবন, একটি সমীক্ষা

ড. বাঁশরী গুহ
শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ, কলকাতা

পরিবেশ বনাম উন্নয়ন নিয়ে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে বিতর্ক চলছে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত সুন্দরবন তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গাঙ্গেয় বদ্বীপের দক্ষিণাঞ্চলে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মোট ১৯টি ব্লক নিয়ে গঠিত সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ নদী মোহনার ম্যানগ্রোভ অরণ্য। মাত্র একশ বা বড়জোর সোয়াশো বছরের মধ্যে একটি ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রের অরণ্যাঞ্চল কিভাবে উদ্বৃত্ত জমি-মানুষের অভাব (land surplus-labour scarcity) থেকে উদ্বৃত্ত মানুষ-জমির অভাবে (labour surplus-land scarcity) পর্যবসিত হল তা সত্যিই বিস্ময়কর।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য সময় থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা আঞ্চলিক উন্নয়নেরর নামে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বন কেটে আবাদ তৈরীতে উদ্যোগী হন জমি লিজ দিয়ে নানারকম grant rule তৈরী করে। ক্রমে পুরো অঞ্চলটিকে কয়েকটি 'লট' এবং 'প্লট'-এ ভাগ করে। নদীবাঁধ দিয়ে জঙ্গল সাফ করে আবাদ করা শুরু হয়। কেন হয়েছিল তা সবাই জানেন কারণ এই সময়ের ১৭৬৫ ও ১৭৯৩ সাল দুটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে বলার কিছু নেই।

প্রাকৃতিক নিয়মে যেভাবে বদ্বীপ গঠিত হয় ঠিক সেইভাবেই প্রাথমিক পর্যায়ে সুন্দরবনের দ্বীপগুলি গঠিত হচ্ছিল। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে বদ্বীপ গঠন সম্পন্ন হওয়ার অনেক আগেই সুন্দরবনে মানুষ নিজে বদ্বীপ গঠনের প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে। জমি উপযুক্ত হওয়ার আগেই ফসল তোলার তাগিদে প্রাকৃতিক বাঁধের উপর গড়ে উঠেছে মানুষের তৈরী বাঁধ। ফলে আজ সুন্দরবনের দ্বীপগুলি তথা গ্রামগুলির চেহারা, নদীপাড়গুলি উচু এবং ভিতরের অঞ্চলগুলি নীচু। বাঁধ উঁচু হওয়াতে পলি সমতে নদীর জল দুপাশে উপচে পড়ে বদ্বীপ গঠনের স্বাভাবিক নিয়ম পালন করতে না পেরে পলিগুলিকে নদীবক্ষে সঞ্চয় করতে বাধ্য হয়েছে। আজ তাই সুন্দরবনের বেশীরভাগ নদীবক্ষ পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির চাইতে উঁচু তাই বলা হয় সুন্দরবনের মানুষ প্রতিরাতে ৩ ফুট জলের নীচে বাস করে। আজকের সুন্দরবনের পিছিয়ে থাকার মূলে বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়ার এই অপমৃত্যু যে অনেকাংশে দায়ী তা বৈজ্ঞানিক মহলে অনেকেই স্বীকার করে থাকেন।

এইরকম পরিস্থিতিতে সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য সকলে ভাবছেন। ব্রিটিশরাও ভেবেছিলেন। কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া এবং বর্গীর আক্রমণ থেকে কলকাতাকে বাঁচানোর জন্য সুন্দরবনকে আবাদে পরিণত করার ধারণাটি চমৎকার যেটি আবার ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ত্বরান্বিত হয়। একেবারে নিখরচায় ভবিষ্যত খাজনা আদায়ের এইরকম সুবর্ণসুযোগ কেই বা হাতছাড়া করে। ফলে দেখা গেল জনবসতি যেভাবেই গড়ে উঠুক না কেন বড় রাস্তা বা রেলপথ যা কলকাতা থেকে শুরু হয়েছে দক্ষিণে তা নদীর উত্তরমুখ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে কারও কারও মতে কলকাতা বন্দরের বিকল্প খোঁজাও এর একটা কারণ হতে পারে। তবে সুন্দরবনের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ প্রথমে জলপথে এবং তারপর রেলপথ মাধ্যম প্রথমে কলকাতার বাজারে এবং তৎপরবর্তী সময়ে ব্রিটেনের বাজারে সহজেই পৌঁছে দেওয়ার সমীকরণ একদম পরিস্কার। এখানে সুন্দরবন উন্নয়নের ভাবনা সম্বন্ধে সংশয়টিতো থেকেই যায়।

৩৫০০ কিমি বাঁধের সাহায্যে বদ্বীপ গঠনের কাজটির সমাপ্তি ঘটানো এবং সুন্দরবনের সম্পদ প্রাচুর্যের ঔপনিবেশিক ব্যবহার সবে মিলে স্বাধীনতার পরে সুন্দরবন যে চেহারা নিল তা প্রকাশ পেল এর এক ফসলী কৃষিব্যবস্থায়, পানীয় জলের অভাবে, ব্যবসা বাণিজ্যের অনুন্নতিতে, যোগাযোগের অব্যবস্থায়। শিক্ষা প্রসারের অভাবে। এই সমস্ত সমস্যা এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রবণ এলাকায় এর অবস্থান হওয়ায় সুন্দরবনের বনে এবং মননে ছড়িয়ে আছে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অপুষ্টি, বেকারী ও অর্ধবেকারী। এর কারণস্বরূপ পুরুলিয়া ও দার্জিলিঙ পার্বত্য অঞ্চলের সাথে সুন্দরবনকেও ''পিছিয়ে পড়া অঞ্চল'' (Backward area) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এবং প্রথমে সুন্দরবন পর্যদ এবং পরে সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর তৈরী হয় সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য।

এই অবস্থায় সুন্দরবনে উন্নয়নের ধারণাটি বুঝতে গেলে এর সংজ্ঞাটির ব্যাখ্যা দরকার, অতি সরল সংজ্ঞা হল ''মানুষ তথা সমাজের বর্তমান অবস্থাকে ভালোর দিকে পরিবর্তনের যে প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া, তা হল উন্নয়ন।'' এই প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়াটির যে নিরন্তর ধারা সুন্দরবনে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উন্নয়নের ধারা অক্ষুন্ন রাখতে যে সম্পদগুলির উন্নয়ন ঘটে তার মধ্যে মানব প্রাকৃতিক, আর্থিক ও পরিকাঠামোগত সম্পদের বিষয়টি সম্বন্ধে দু একটি বিষয় আলোচনা করলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।

মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটেছে। ১৯৯১ আদমসুমারীর পর থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে তবে মোট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যা প্রচুর। এক্ষেত্রে আদমসুমারী বহির্ভূত অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যাটিও মাথায় রাখা একান্ত দরকার। শিক্ষিতের হার বেড়েছে এবং কর্মজীবীর হার বেড়েছে কিন্তু যেটি বলা হয় না সেটি হল মোট অশিক্ষিত ও অকর্মজীবীর সংখ্যা অনেক বেশী বেড়েছে। কর্মজীবীর সংখ্যা যারা বাড়িয়েছেন তাদের মধ্যে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা সর্বাধিক।

সুন্দরবনবাসীর জীবিকার উন্নয়নের আলোচনা করা আরও কঠিন। সুন্দরবনের মত প্রাকৃতিক দূর্যোগ প্রবণ ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্রের জল, মাটি, জলবায়ুর সম্ভবত সঠিক, গবেষণা না করেই উচ্চ ফলনশীল ধানবীজ দিয়ে চাষ শুরু করা হল কৃষক অনুদান দিয়ে। কিন্তু এর উৎপাদন বারবার বিঘ্নিত হয়েছে কারণ এই বীজ সুন্দরবনের নোনা

মাটিতে নোনা জলে ডুবে থাকতে অসক্ষম। এখন আবার নাকি সরকারী অনুদানের সাহায্যে কৃষককে দেশজ বীজ চাষের জন্য অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে।

এক সময়ে বিদেশের বাজারে চিংড়ির বিপুল চাহিদার ফলে সুন্দরবনে চিংড়ি মাছের চাষে ঢেউ আসে। এমনকি চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে 'ভেড়ি' তৈরী করে তাতে চিংড়ির চাষ শুরু হয়ে যায় এবং তাতে চিংড়ির পোনা সরবরাহ করার জন্য কুড়িয়ে খাওয়া একদল মানুষ মূলত মহিলারা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত বুক জলে দাড়িয়ে চিংড়ির পোনা ধরতে শুরু করেন (প্রায় ৪০,০০০ পরিবার)। তার নীট লাভ হল যেখানে সাতের দশকে দৈনিক প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ পোনা পাওয়া যেত আজ সেখানে ৫০-৬০টির বেশী পাওয়া যায় না। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংগ্রহের কাজ করায় অন্যান্য মাছও বিরল হয়ে পড়ে।

পরিবেশ বাঁচানো ও আয়ের পথ সুগম করতে প্রচুর সামাজিক বনসৃজনের কাজ হয়েছে। শোনা যায় তার অনেক প্রজাতিই সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের সাথে সার্বিক ভাবে অভিযোজিত হওয়ার নয়। আবার বনসৃজনের জন্য এমন অঞ্চল নির্দ্দিষ্ট হয়েছে যেখানে মৃত্তিকা সংরক্ষণের মাধ্যমে নদীর তীর বরাবর সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলে নদীর নাব্যতা নষ্ট করতে চলেছে। পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য বিপুল কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। সুন্দরবনে নাকি ৩২টি ব্রীজ হবে তা কি সুন্দরবনের সম্পদের আবার একমুখী সরবরাহ নির্দ্দিষ্ট করবে না? অথবা কলকাতা এবং কলকাতা সংলগ্ন অঞ্চলের লোকেদের সুন্দরবনকে আবার উপনিবেশ তৈরী করে ফেলার পথ সুগম করবে না। এটি হয়ত একটি নেতিবাচক চিন্তা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের যে ছবি এবং তথ্য রয়েছে তা কিন্তু সত্যিই সুখের নয়। এ প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এই অবস্থা ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে কিন্তু সুন্দরবনের প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্র কিন্তু একদম ভিন্ন এর বেঁচে থাকার উপর পুরো পশ্চিমবঙ্গের (কলকাতা সহ) পূর্ব উপকূল ও দক্ষিণ এশিয়ার একটি বিরাট অংশের অস্তিত্ব টিকে রয়েছে, ফলে বর্তমান প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সুন্দরবনের ক্ষেত্রে কি একটি 'বাস্তব ঘটনা' না 'মিথ'। আর দেরী না করে সম্ভবত সম্পূর্ণ একটি বিকল্প প্রক্রিয়া গ্রহণ করা দরকার। সুন্দরবনের উন্নয়ন হবে সুন্দরবনের মতো কলকাতার উন্নয়নের মতো নয়।

সামাজিক সংযুক্তি ও খণ্ডীকরণে রাষ্ট্রের ভূমিকা

স্নেহময় চাকলাদার

প্রাক্তন রিডার, বিজয় নারায়ণ মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্র নেই যা সামাজিক ক্ষেত্রে সমরূপ। প্রতিটি রাষ্ট্রই বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীতে বিভক্ত ঃ ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, জাত প্রভৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বিদ্যমান। রাষ্ট্রের কাছে প্রধান সমস্যা হল কিভাবে এই বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। কোন কোন রাষ্ট্র বৃহৎ অথবা প্রাধান্যমূলক সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলির একীকরণের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান খোঁজে, কোন কোন রাষ্ট্র বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে নিজেদের শাসন কায়েম রাখতে আগ্রহী। আবার কোন কোন রাষ্ট্র বহুত্ববাদের মধ্যে এর সমাধান খুঁজে পেয়েছে।

বর্তমান নিবন্ধে এই সাধারণ বিষয়টি ভারতের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে। ভারত হল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় দেশ। এখানে বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু জাত, জনজাতি ও আদিবাসী সুদীর্ঘকাল ধরে পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে। স্বাভাবিক ভাবেই এখানে সামাজিক স্তরে একটা বহুত্ববাদ গড়ে উঠেছে। ভারতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তারই প্রতিফলন ঘটে।

একই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও কিভাবে দীর্ঘকাল ধরে সহঅবস্থান করতে পারে তা বুঝতে হলে বিষয়টি ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের মতে দেড় লক্ষ বছর পূর্বে আফ্রিকার জঙ্গলে গড়ে ওঠা মানবগোষ্ঠীর (হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স) মধ্যে এক রূপতা ছিল। পরবর্তীকালে আফ্রিকাতে ঘন ঘন ঝড়-ঝঞ্ঝা দেখা দেওয়ায় ও তুষার যুগের ওঠা-নামার ফলে মানবগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ও আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দৈহিক, মানসিক, এমনকি জিনগত পার্থক্যও গড়ে ওঠে।

সভ্যতার বিবর্তনে গত ৮ হাজার বছর পূর্বে ইজিপ্ট, তুরস্ক, ইরাক, উত্তর-পশ্চিম ভারত প্রভৃতি স্থানে কৃষিজাত উদ্বৃত্ত ফসল হেতু রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। প্রথমে রাষ্ট্র এক একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী নিয়ে গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে উৎপাদন ব্যবস্থায় জটিলতা আসায় বহুবিধ সামাজিক গোষ্ঠী একই রাষ্ট্রের ছত্র-ছায়ায় স্থান পায়। সেই হতে রাষ্ট্রকে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা করে চলতে হয়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায় উৎপাদন ব্যবস্থায় জটিলতা বৃদ্ধির ফলে এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠায় রাষ্ট্রের এই ভূমিকা ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিভিন্নতা সত্ত্বেও সামাজিক গোষ্ঠী সমূহ একই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতে সমর্থ হয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত বনসংহার — কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানগত ফলাফল

সুব্রত সাহা
অধ্যাপক, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

বর্তমানযুগে উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশ বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমরা সকলেই জানি যে, পরিবেশ বাদ দিয়ে উন্নয়ন হতে পারে না। সমস্ত জীবজগতের জীবনের রক্ষণ এবং উৎপাদনের প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক উপকরণের জন্য পরিবেশ অপরিহার্য। গত তিন দশক ধরে পরিবেশের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবের বিষয়টি সকলের মধ্যে একটি উদ্বেগ তৈরী করেছে। বিশেষত, এটি প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভিন্ন গুরুতর পরিবেশগত সমস্যা ঘটিয়েছে। কতকগুলি পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে, বর্তমানে বনসংহার একটি বহু বিতর্কিত আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন সংবাদ বা তথ্য থেকে জানা গেছে যে, বিশ্বের বিভিন্ন গ্রীষ্মমণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ব্যাপকহারে বনসংহার ঘটেছে। বহু পর্যবেক্ষক, পরিবেশবিদ এবং বিজ্ঞানীরা এই বনসংহারের পিছনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভ্রান্ত সরকারী নীতিকে দায়ী করেছেন। আমি এই প্রবন্ধটিতে উপরিউক্ত সমস্যাগুলিকে নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি। আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কতটা বনসংহারকে প্রভাবিত করছে এবং এগুলি পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কিনা।

বিভেদ ও শাসন ঃ পরিবারতন্ত্র ঃ পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্র

মৌসুমী চৌধুরী
রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়

মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিবর্তনের পথে পিতৃতন্ত্র যেসব overt এবং covert ব্যবস্থার মাধ্যমে তার কায়েমি স্বার্থ সুরক্ষিত করতে চেয়েছে তার একটি হল 'Divide and Rule' অর্থাৎ 'বিভেদ ও শাসন নীতি'। খাদ্য সংগ্রহের যুগ পেরিয়ে খাদ্য উৎপাদনের যুগে যখন লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছে তখনই ঘটে ক্ষমতার এই হস্তান্তর। আর নতুন অধিকৃত এই ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পুরুষতন্ত্র যখন নারীকে গৃহবন্দী করেছে তখন আর এক ধাপ এগিয়ে পরিবারতন্ত্রের মাধ্যমে সে তার স্বার্থকে সুরক্ষিত করেছে এই নতুন উদ্ভাবিত 'বিভাজন নীতি'র মাধ্যমে। যে কতিপয় মুক্তিকামী নারী খাঁচার বাঁধন ডিঙিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সে তার 'আদর্শ নারী'দের লেলিয়ে দিয়েছে। বিনিময়ে সে ওই সমস্ত নারীদের বন্দনা গেয়েছে তার ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের পথে সাহায্যকারী সমস্ত গণমাধ্যমে। এই নারীকেই সে করেছে তার রাষ্ট্রের প্রতীক। কারণ সে তার স্বার্থের অনুগামিনী হয়েছে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত এই 'আদর্শ নারী'র ধারণাকে বাস্তবায়িত করা এবং তাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করাই নারীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে প্রচার চালিয়েছে।

আমাদের মহাকাব্য থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত (ভারতীয়) ইংরাজি উপন্যাসগুলির পাতায় পাতায় একটু সচেতনভাবে চোখ রাখলেই দেখা যাবে কীভাবে পরিবারকে মাধ্যম করে এই বিভেদ নীতির মাধ্যমে শাসন চলেছে। একদিকে যেমন পুরুষের হাতে প্রত্যক্ষভাবে নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে পরোক্ষে এক নারীর হাতে অন্য নারী হারিয়েছেন তাঁর স্বাভাবিক মানবাধিকার। এই সমস্ত নারীরা তাদের সামাজিকীকরণের পথে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার যে ideological concept তাকেই আত্মস্থ করেছে। ফলত তারা নিজের প্রতি উদাসীন ও sacrificing woman এর আদর্শে অনুপ্রাণিত। এইভাবে রাষ্ট্র খুব সুনিপুণভাবে তার উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করেছে এবং নারী তার আত্মসচেতনতা ও প্রকৃত শিক্ষার অভাবে পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করে তারই শোষণ ও শাসনযন্ত্রের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের সুনিপুণ কৌশলে পরিবারের মধ্যেই কিছু নারী পুরুষের শোষণ যন্ত্রের সক্রিয় মাধ্যম হিসাবে কাজ করে নারীর পূর্ণাঙ্গ বিকাশে বাধা স্বরূপ কাজ করেছে— নতুন প্রণীত Domestic Violence Act 2005 একথা পরোক্ষে স্বীকার করেছে।

মহাকাব্যের ও সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত কিছু সাহিত্য কর্মের আলোকে উপরোক্ত ধারণাটিকেই সুবিস্তৃতভাবে আলোচনা করা এই আলোচনাপত্রের লক্ষ্য।

শহর কলকাতায় হকার ঃ কিছু প্রশ্ন, কিছু বিতর্ক

শম্পা বিশ্বাস

মুক্ত গবেষিকা

তিলোত্তমা কলকাতার নাগরিক জীবনের সঙ্গে 'হকার' কথাটি ভীষণই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুত কলকাতা নামটি শোনামাত্র যে খণ্ড চিত্রগুলি চোখের সামনে ভেসে ওঠে শহরের হকার নিঃসন্দেহে তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে, রাস্তার ধারে ফুটপাথে পসরা সাজিয়ে বসে, দরদামের মাধ্যমে জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করাকে আমরা হকারি বলে থাকি। তবে এই মোবাইল আর মার্কেটিং এর যুগে হকাররাও আর রাস্তার ফুটপাথে আবদ্ধ নেই। চলন্ত ট্রেন, বাস, সিনেমা হলের সামনে, সিনেমা বিরতিতে হলরে মধ্যে। গড়ের মাঠ থেকে ইডেন গার্ডেন্স, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, পাড়ার ছোট গলি থেকে ফ্ল্যাটের দরজায়, সব জায়গাতেই হকারদের দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে এখনও শহরের বড় বড় রাস্তার ধারে জিনিসপত্র বিক্রয়কারী হকাররা অনেক বেশী বলে মূলত হকার সম্বন্ধীয় কোন আলোচনা করা হলে মূলত এরাই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকেন।

সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে এই খুচরো বিক্রেতারা শহর কলকাতায় কিভাবে উপস্থিত হলেন, তা নিয়ে কিন্তু খুব নির্দিষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। তবে কলকাতার আদিপর্বে 'ফেরিওয়ালা' নামক শ্রেণীর মানুষের কথা জানা যায়, যারা বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মাথায় করে রাস্তায় রাস্তায় ফেরি করত। কিন্তু এই ফেরিওয়ালাদের হকার-এ রূপান্তরের পর্বটি বেশ চমকপ্রদ, বিশেষ করে ত্রিশের দশক থেকে হকার শব্দটির সঙ্গে শহরবাসী বেশী পরিচিত হয়ে পড়েছেন। ক্রমশ শব্দ কৌলিন্য হারিয়ে গিয়ে ফেরিওয়ালা হকার এ রূপান্তরিত হল সাধারণ মানুষের কাছে।

কলকাতার হকারদের নানা টানাপোড়েন ও ওঠানামা, জীবনসংগ্রাম তার সঙ্গে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে আছে দেশবিভাগ এবং তার পরিণামে উদ্বাস্তু সমস্যা। শরণার্থীদের উপস্থিতি শহরে জনগোষ্ঠীর চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ওপার বাংলার সর্বস্ব হারানো, যারা এ শহরে আশ্রয় নিলেন— পেটের দায়ে রুজি রোজগারের জন্য হকারিকে জীবিকা হিসাবে বেছে নিলেন তাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিত যুবক এমনকি যুবতীরাও কিছু ক্ষেত্রে হকারির মাধ্যমে জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। প্রথমে পোযাক, খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করলেও পরে প্রায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হকারদের কাছ থেকে ক্রেতারা ক্রয় করতে পারেন। ফুটপাথের এই জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রিত বাজারের তুলনায় অনেক সস্তা এবং এদের ক্রেতার সংখ্যাও যথেষ্ট। অনেক নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবার তারে বাজেটের মধ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রীটি পেয়ে যান বলে হকারদের কাছ থেকে জিনিসপত্র কিনতে পছন্দ করেন। পঞ্চাশ থেকে আশির দশকের দিনগুলিতেও এটা ছিল আজ বিশ্বায়নের যুগেও একই ধারা অবশিষ্ট রয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই ক্রয়বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে হকার ও বিক্রেতার মধ্যে এক ধরণের সামাজিক স্বীকৃতিও গড়ে ওঠে। হকারির সামাজিক স্বীকৃতিও এর ফলে এক শ্রেণীর মানুষের কাছে স্বীকৃত হয়।

সরকারী তরফেও পেশা হিসাবে হকারিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে নানাবিধ লাইসেন্স ইস্যু করে। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, রাজ্যের সরকারের হিসেবও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এই ক্ষেত্রে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে, তেমনি প্রতি বছরে এই ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের পরিমাণও কম নয়।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্যা রয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক দাদা থেকে পুলিশি জুলুমের সমস্যা তো রয়েইছে কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা সম্ভবত অন্য জায়গায়। হকাররা মূলত কলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ফুটপাথে তাদের সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজান। আমরা কলকাতার প্রায় প্রতিটি রাস্তার পাশে হকার দেখতে পাই, এগুলিকে আমরা মুখ্য এবং গৌণ এই দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। হকারির মুখ্যস্থান বলতে বোঝায় ধর্মতলা, লেনিন সরণি, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, হাতিবাগান, আর জি কর রোড, গড়িয়াহাট, শিয়ালদহ, মানিকতলা মেন রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, ব্রাবোর্ন রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড, বহুবাজার, ক্যানিং স্ট্রীট, কলেজস্ট্রীট, কালিঘাট প্রভৃতি। আর গৌণ বলতে প্রত্যেক পাড়ায় অলিতে-গলিতে, রাস্তার ধারে গড়ে ওঠা নানা দোকানপত্র। এখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তাদের ফুটপাথ জোড়া উপস্থিতি পথচারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে। তারা বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমে চলাফেরা করে। শহরে পথ দুর্ঘটনার জন্য অনেকেই হকারদের ফুটপাথ দখল রাখাকে দায়ী করেছেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও মুখোপাধ্যায় কমিটির সুপারিশ মেনে কলকাতার রাস্তাকে হকারমুক্ত করার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। সবচেয়ে বিতর্কিত পদক্ষেপ অবশ্যই ১৯৯৫ সালের ২৫ শে ডিসেম্বরের 'অপারেশন সানশাইন'।

প্রতিরোধ এসেছে হকারদের তরফ থেকে। ১৯৫০ সালে টি. ইউ. সি. সি-এর নেতৃত্বে 'বেঙ্গল হকার্স অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে যে প্রতিরোধ ও সংঘবদ্ধতার নজির কলকাতার হকাররা শুরু করেছিলেন 'অপারেশন সানশাইন'-এর পর হকার্স সংগ্রাম কমিটির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়ে সেই ধারাকে আরো শক্তিশালী করেছেন। প্রশ্ন উঠছে কলকাতার পথ দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলিকে হকারের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা? উল্টোদিকে হকারদের জন্য কতখানি নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে তা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। সমাজের সর্বস্তরে কলকাতায় হকারদের কেন্দ্র করে যে প্রশ্ন উঠেছে বা নানা জটিলতা তৈরি হচ্ছে, সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে তা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় বিষয়। এই নিবন্ধে এই বিষয়টিকেই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

উন্নয়ন ও বাঙালি মধ্যবিত্ত

ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়
বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, নিউ আলিপুর কলেজ

এই গবেষণানিবন্ধে উন্নয়ন প্রসঙ্গে মধ্যবিত্তের ভাবনা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে সাম্প্রতিক 'উন্নয়ন' পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া এবং সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন প্রকল্পে মধ্যবিত্তর ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হবে। মধ্যবিত্ত কাদের বলা হবে, এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ এবং সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ফলে উন্নয়ন প্রসঙ্গে মধ্যবিত্তের প্রতিক্রিয়া এবং ভূমিকা কী তা বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমে মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা এবং পরিচয় নির্ধারণ করা দরকার। এক্ষেত্রে আলোচনা সীমায়িত থাকবে শুধুমাত্র বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে। এই গবেষণানিবন্ধে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তদের বিকাশের সংক্ষিপ্ত উল্লেখসহ মধ্যবিত্তের স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হবে।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারত থেকে আজকের স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে 'উন্নয়ন' প্রকল্পের বিবর্তনের একটা ঐতিহাসিক রূপরেখা প্রদান করাও এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। সেই উন্নয়ন প্রকল্পের রাষ্ট্রীয় নীতি প্রনেতাদের ভাবনাকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কিভাবে দেখেছে (অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন প্রকল্পে তথাকথিত বহুজনহিত-এর ধারণা মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে কতটা যথার্থ তার মূল্যায়ন) তাও যেমন এই গবেষণার আলোচনাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত তেমনই উন্নয়নজনিত কারণে বহু মানুষের জীবিকা ও বাসভূমি হারানো সম্পর্কে মধ্যবিত্তদের ভাবনা কী তারও কিছু ঝলক এই গবেষণায় তুলে ধরা হবে।

এই গবেষণার প্রণোদনা মূলত গত দু'দশকে বিশেষ করে বিগত পাঁচ-সাত বছরে পশ্চিমবঙ্গে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন যার মূল নিহিত রয়েছে তথাকথিত উন্নয়নের মধ্যে। কাজেই উন্নয়নভাবনার ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের নিরিখে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই নিবন্ধের উপজীব্য। এই গবেষণাকে সমকালীন ইতিহাস অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে চিহ্নিত কার যায় যার প্রাথমিক তথ্যসূত্র সংবাদ ও সাময়িক পত্র, মানুষের সাক্ষাৎকার, উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে অ-সরকারি সংগঠনের প্রতিবেদন এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির নানান ক্ষেত্র, গল্প-উপন্যাস-কবিতা-গান-নাটক-চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত উন্নয়নভাবনা।

কলকাতার ফুটবল দর্শক ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

শুভ্রাংশু রায়
ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ

প্রত্যেক শহরের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা তাকে স্বাতন্ত্রতা দান করে বা আইডেনটিটি তৈরির পক্ষে সহায়ক হয়। তিলোত্তমা কলকাতা শহরের ক্ষেত্রে ফুটবল নিঃসন্দেহে এরকম একটি বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় ফুটবলের মক্কা উপাধিটি দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতার পালকে একটি গর্বিত সংযোজন। ১৯১১ সালে মোহনবাগানের ঐতিহাসিক শীল্ডজয়, ত্রিশের দশকে কলকাতা লীগে মহমেডান স্পোর্টিং-এর আপিপত্য, স্বাধীনতার পর মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদি কলকাতা ফুটবলের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি সাংবাদিক, গবেষকদের আলোচনায় বারবার উঠে এসেছে। তবে এই নিবন্ধেব মুখ্য বিষয় কলকাতা ফুটবলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন কিন্তু ফুটবলাররা নয় বরং সারা বছর ধরে ফুটবল মাঠের ২২ জন না হয়েও যারা ফুটবলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন, ফুটবল যাদের কাছে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সেই কলকাতার ফুটবল দর্শকরা।

ঔপনিবেশিক যুগে একটি ঔপনিবেশিক খেলা ফুটবল। বাঙালির রক্তে মিশে যাওয়ার নেপথ্যে কারিগর কিন্তু এক বাঙালি ফুটবল দর্শক। নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী। গঙ্গাস্নানে মায়ের সঙ্গে গিয়ে ময়দানে গোরাদের ফুটবল খেলতে দেখে দর্শক নগেন্দ্রপ্রসাদ ফুটবলকে নিজের হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর এবং আরো কয়েকজন সহযোগীর উদ্যোগে কলকাতা শহরে ফুটবল খেলা ছড়িয়ে পড়েছিল। ফুটবলের প্রসার বেড়েছিল, সঙ্গে বেড়েছিল ফুটবল দর্শকের সংখ্যা। ১৯১১ সালে শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগান যেদিন ইস্টইয়র্কশয়র দলকে পরাজিত করল তখন কলকাতা ময়দান ফুটবল দর্শকদের উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করে। পরের দিন খবরের কাগজে সেদিনের খেলার পাশাপাশি দর্শকদের নানা আবেগের বহিঃপ্রকাশও সংবাদের শিরোনামে এসেছিল। ১৯২০ দশক পর্যন্ত গোরাদের বিরুদ্ধে দেশী খেলোয়াড়দের খালি পায়ে টক্কর নেওয়া আর দর্শকদের ঘরের ছেলেদের উৎসাহদানের যে দৃশ্য ছিল ৩০-এর দশকে দৃশ্যপটে পরিবর্তন আসে মহমেডান স্পোর্টিং উত্থানের ফলে। ৩০-এর দশকে তখন দেশের রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম রাজনীতি ক্রমশ

জাঁকিয়ে বসেছে। ফলে কলকাতা ফুটবলে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের একাধিপত্য তৎকালীন শহরের সমাজজীবনে চাপা উত্তেজনার রেশ ফুটবল মাঠেও পড়েছিল। পরিবর্তন ঘটেছিল কলকাতা ফুটবলের দর্শকদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। আগেই ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এবার মহমেডানের আধিপত্য ফুটবল দর্শকদের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি করে দেশবিভাগের পরে যে বিভাজন আরো মোটা দাগের হয়ে দাঁড়ায়। ফুটবলকে কেন্দ্র করে ঘটি-বাঙালের দ্বন্দ্বের কথা বাঙালি সমাজে সর্বজনবিদিত। গোটা সমাজের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র ছিল কিন্তু কলকাতা ময়দান।

৩০-এর দশক থেকেই শুরু হয়েছিল ছোটখাটো ঝামেলা। তবে ফুটবলকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে বড় সংঘর্ষ ঘটেছিল ১৯৮০ সালের ১৬ই আগস্ট। মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের লীগের খেলায় ১৬টি ফুটবল দর্শকের প্রাণ ইডেন গার্ডেন্সে অকালে ঝরে গিয়েছিল। কলকাতা মাঠের এই মৃত্যুগুলি সমগ্র বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। শহর কলকাতা একসঙ্গে এতগুলি মৃত্যু কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি। ষাট, সত্তর, আশির দশকের কলকাতায় ফুটবলকে কেন্দ্র করে দর্শকদের মধ্যে যে উন্মদনা ফুটবলপ্রেমী মানুষকে গর্বিত করতো, ১৬ই আগস্টের ঘটনা নিঃসন্দেহে তাদের সেই গর্বের বুকে আঘাত হেনেছিল।

আশির দশক থেকে একদিকে যেমন বিশ্বকাপ ফুটবল দূরদর্শনে দেখানো শুরু হয়, কলকাতায় বসে নেহেরু গোল্ড কাপ ফুটবলের আসর। স্বভাবতই আন্তর্জাতিক ফুটবলের স্বাদ পাওয়ার প্রভাব কলকাতার ফুটবল দর্শকদের মধ্যেও পড়ে। সারা গায়ে দলীয় পতাকার রং লাগিয়ে বা দলের জার্সি গায়ে সমর্থকরা প্রিয় দলের খেলা দেখতে হাজির হতে শুরু করেন।

নব্বইয়ের দশক থেকে ক্রিকেট ফুটবলের পালা কিছুটা হওয়া কাড়লেও ফুটবল কিন্তু কোনদিন বাঙালি সমাজ থেকে হারিয়ে যায়নি। ফলে ঘরোয়া খেলায় নিয়মিত পঞ্চাশ-যাট হাজার দর্শকের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। ১৯৯৭ সালে ডায়মণ্ড ম্যাচকে ঘিরে পুরানো দিনের সেই উন্মাদনা ফিরে এসেছিল। যদিও তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

বস্তুত শতবর্ষ পেরোনো কলকাতা ফুটবলের ইতিহাস যতটা আলোচিত হয়েছে এই ফুটবল জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ফুটবল দর্শককূল সেই অর্থে সামগ্রিকভাবে আলোচিত হয়নি। বস্তুত খেলাগুলি কলকাতা ময়দান, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, ইডেন গার্ডেন্স, রবীন্দ্রভারতী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হলেও এর সঙ্গে সারা বাংলার এমনকি বাংলার বাইরে অন্যপ্রদেশে এমনকি বিদেশে বসবাসকারী বাঙালির আবেগ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জড়িয়ে আছে বাঙালির নানা ঘাত প্রতিঘাতের ইতিহাসও। অনেক সময়ই সমাজে নানা টানাপোড়েন, ঘাত প্রতিঘাতের প্রতিফলন খেলার মাঠে গিয়ে পড়ে। দর্শকের আচরণের মধ্যেও তার প্রভাব দেখা যায়। কলকাতা ফুটবলের দর্শকদের মধ্যে একটি ভীষণ নেতিবাচক দিক মহিলাদের অনুপস্থিতি। দর্শককূলের মধ্যে খেলা চলাকালীন নান ধরনের স্ল্যাং শব্দও অনেকক্ষেত্রে অনেককে ময়দান বিমুখ করে দিয়েছে। কিন্তু তবু কলকাতার ফুটবল দর্শকদের উন্মাদনা, প্রিয়দলের পতনে বিলাপ, তাবু ভাঙচুর, রেফারির উপর হামলা, বিজয়োল্লাস, সব পদক্ষেপই সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠতে পারে।

পরিবেশ ও শিল্পায়ন

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

বরিষ্ঠ আইনাধিকারিক, পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সভ্যতার প্রারম্ভে কেবল মাটি, জঙ্গল আর মানুষ। মাটির গর্ভজাত অরণ্যই মানুষের খাদ্যের জোগানদার। অরণ্যাচারী মানুষ অরণ্য থেকেই তার খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সন্ধান করেছে। যুগ থেকে যুগান্তরে মানুষ পদার্পণ করেছে সৃষ্টির আদি রহস্যকে ক্রমান্বয়ে উন্মোচন করে। অরণ্যাচারী মানুষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি সুখের সন্ধান পেল। হাতে আগুন জ্বালানোর ক্ষমতা এল, আর ক্রমান্বয়ে অরণ্যাচারী মানুষ কৃষিজীবী হল, আর কৃষিজীবী মানুষ তার বুদ্ধি বিভাসিত প্রতিভাকে নিয়োজিত করল মাটির অভ্যন্তরে জমে থাকা খনিজ সম্পদের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। খনিজ সম্পদের সন্ধান মানুষকে কৃষি থেকে শিল্পের দিকে ক্রমান্বয়ে টেনে নিয়ে গেল।

বিশেষত, ইওরোপের বুকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি মানুষকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করল এবং পৃথিবী জুড়ে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার মানুষকে অত্যন্ত আগ্রাসী করে তুলল। দেশ থেকে দেশান্তরে অকুতোভয় মানুষ পাড়ি জমাল এবং তার শিল্পজাত দ্রব্যের মাধ্যমে কেবল দেশ জয় করল, তা নয়, অপরাদেশের খনিজ সম্পদের ওপর এক আধিপত্য কায়েম করার প্রচেষ্টা আরম্ভ হল। কৃষিভিত্তিক সামন্ত তান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে লাগল, আর শিল্প বিপ্লবের গর্ভ থেকে জন্ম নিল এক নতুন পৃথিবী। শিল্প মানেই আগুন, জল আর খনিজ সম্পদের সংমিশ্রণ, আর নতুন নতুন শিল্প সম্ভারের সৃষ্টি। এই শিল্প তৈরি করতে কয়েকটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হল, যেমন— কালো ধোঁয়া, বিষাক্ত জল আর শ্রমজীবী মানুষের জন্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। শিল্প বিপ্লবের পীঠস্থান ইওরোপ জুড়ে কালো ধোঁয়া গ্রাস করল নীল আকাশকে, আর টেমস্ আর রাইন-এ দূষণের মাত্রা লাফিয়ে লাফিয়ে বর্ধিত হল। কিন্তু শিল্প সৃষ্টির উল্লাসে পুঁজির অপ্রতিহত

ক্ষমতায় বলীয়ান মানুষ ভুলেই গেল তাদের সৃষ্ট কালো ধোঁয়া, দূষিত জল মনুষ্য সভ্যতার চরম অভিশাপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। উন্নত শিল্প কেবল উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই পরিবর্তন আনল না, যুদ্ধের অঙ্গনেও এল আমূল পরিবর্তন। নেপোলিয়নের যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বুঝিয়ে দিয়ে গেল শিল্পের আত্মপ্রকাশ রণাঙ্গনেও কীভাবে অনুপ্রবেশ করেছে এবং মনুষ্যসৃষ্ট খনিজ শক্তি, বাষ্পীয় শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি এবং সর্বশেষে আণবিক শক্তির উত্থান পৃথিবীকে এক ভয়ংকর জায়গায় এনে উপস্থিত করেছে। এই জায়গা থেকে মানুষ ঘুরে দাঁড়ানোর কথা ভাবতে শুরু করল। এই ভাবনার হাত ধরেই শিল্পোন্নত দেশগুলি পরিবেশ নিয়ে ভাবতে বাধ্য হল। স্টকহোলম সম্মেলন ১৯৭২ সালে এক নতুন ভাবনার উন্মোচন করল। আন্তর্জাতিক ভাবে পরিবেশ ভাবনা স্বীকৃতি লাভ করল। পৃথিবী জুড়ে আজ কালো ধোঁয়ার কেনাবেচা আরম্ভ হয়েছে। এমনকী নদীর জলও আজ কেনাবেচার অঙ্গ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী পুঁজির আস্ফালন, যা এককথায় অনেকে বিশ্বায়ন বলে চালাচ্ছেন, তাতে পরিবেশ ভাবনার মোড়ক থাকলেও আদতে সর্বগ্রাসী ভোগবাদী ব্যবস্থাই মানুষকে পরিচালিত করছে। পরিবেশ ভাবনা আজও অধরা থেকে গেছে। বিশ্বজুড়ে আস্ফালনকারী রাজনীতিবিদরা নিরাপত্তার প্রশ্নে আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করার কথা বলছেন। কিন্তু আণবিক বিস্ফোরণ থেকে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি হয় সে ব্যাপারে তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। আগামী দিনের মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের অন্যতম উপাদান সম্ভবত পরিবেশ রক্ষার লড়াই। এ লড়াইতে মানুষকে জিততেই হবে অন্যথায় আঁধার ঘনিয়ে আসবে সভ্যতার ভিত্তিভূমিতে।

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের প্রতিফলন

অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর

'স্বাস্থ্যই সম্পদ'— এ প্রবাদ প্রায় প্রতিটি বাঙালির জানা আছে। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে মানুষ যে সচেতন থাকবেন এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। যদি সচেতন না থাকনে, তাহলে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁকে সচেতন করবেন। কিন্তু একজন মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে তো দেশ ভাববে না। যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের কর্তব্য প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে দেখভাল করা। কিন্তু কিভাবে তা করা হবে?

আসলে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে এমন একটা ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার, যাতে রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে আশ্বস্ত থাকেন। একটি জনগোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের সব জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, এক কথায় জনস্বাস্থ্য নামে পরিচিত। আজকের সমাজে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের পাশাপাশি 'জনস্বাস্থ্য' একটা আলাদা জায়গা করে নিয়েছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণমাধ্যমের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। গণ-মাধ্যম পরিবারে সংবাদপত্রের অবদান অনেকেরই জানা। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংবাদপত্র সমাজ শিক্ষার কাজটা করে থাকে। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও সংবাদপত্রের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা বিষয়ে লেখা প্রকাশিত হয়ে থাকে। অপুষ্টি, মারন ব্যাধি এড্স, ম্যালেরিয়া, যক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলো যেমন থাকে, তেমনি মহিলাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খবর ও আলাদা গুরুত্ব পায়। এই সংবাদগুলোর ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়ই রাষ্ট্রের প্রশ্ন জড়িয়ে পড়ে। রাষ্ট্র জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নে কতটা সচেতন তাই ফুটে ওঠে সংবাদপত্রের ছত্রে ছত্রে।

যেমন ধরা যাক, ব্লাড ব্যাংকে রক্ত নেই, কিংবা থ্যালাসেমিয়া রোগীর রক্তে এড্স এর জীবানু বা বারান্দায় প্রসব হওয়া সদ্যোজাতের মৃত্যু— এ ধরনের সংবাদগুলো রাষ্ট্রের অক্ষমতার কথাই প্রকাশ করে। আবার রাষ্ট্র যেসব উন্নয়নমূলক কাজ করে, তাও সংবাদ পত্রের পাতায় প্রতিফলিত হয়। যেমন যক্ষা রোগীদের জন্য নতুন হাসপাতাল, এড্স রোগীদের জন্য অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল ড্রাগ এর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি খবরগুলোও প্রাধান্য পায়।

এ প্রসঙ্গে গণমাধ্যমের একটি তত্ত্বের কথা উল্লেখ করা যাক। সেটি হল অ্যাজেণ্ডা সেটিং তত্ত্ব। সংবাদপত্রও এই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটায়। এই তত্ত্বের মূল কথা হল গণমাধ্যম যে কোন বিষয় যেভাবে উপস্থাপন করবে, জনগণকেও তা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অনেক সময়ই সংবাদপত্রগুলো তাদের সুবিধা মতো রাষ্ট্রের পক্ষে বা বিপক্ষে সংবাদ প্রতিফলন ঘটায়। অনেক সময় দেখা যায়, সংবাদপত্রগুলি জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত খবর তৈরি করছে। অর্থাৎ কোনো সামান্য ঘটনাকে তারা বড় করে তোলে। এতে অনেক সময় সাধারণ মানুষের সুবিধা হয়। হয়তো দেখা গেল উন্নয়নের নামে রাষ্ট্র কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে যা মোটেও জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। সেক্ষেত্রে সংবাদপত্র খবরগুলো নতুন মোড়কে দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রয়োগ ঘটায় কাল্টিভেশান তত্ত্বের।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্রের জনস্বাস্থ্যমূলক খবরগুলো বিশ্লেষণ করা হবে। কেস স্টাডি হিসাবে দুটি সংবাদপত্রকে বেছে নেওয়া হবে। আর সংবাদপত্রের মধ্যে বাংলা সংবাদপত্রের সংবাদগুলিই বিশ্লেষণ করা হবে। অন্যভাষায় সংবাদপত্রগুলো এক্ষেত্রে ধরা হবে না। এই বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্যের পরিকাঠামো এবং উন্নয়নের গতি প্রাধান্য পাবে। সেই সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নে সংবাদপত্রের ভূমিকা কতটা নেতিবাচক বা ইতিবাচক তাও বিশ্লেষিত হবে এই প্রবন্ধে।

পরিবেশ শরণার্থী ঃ প্রান্তিকতার সংকটে নারী

ড. সোমা বসু
রিসার্চ অফিসার, ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, কলকাতা

পরিবেশ শরণার্থী— আগামী পৃথিবীর এক গভীরতর 'অসুখ'। পরিবেশ শরণার্থী যাঁদের হারিয়ে যায় সবকিছুই— বাড়ি, জমি, অর্থনৈতিক ভিত, এমনকি নিজস্ব ঐতিহ্য ও বংশ পরম্পরায় বয়ে চলা সাংস্কৃতিক সত্তাও। হারিয়ে যাওয়া সবকিছুর মূলে প্রকৃতি-পরিবেশ। কখনও তা প্রাকৃতিক বিপর্যয়। আবার কখনও তা অপর একদল মানুষেরই তৈরি করা আইনি ব্যবস্থা— উন্নয়নের জন্য। মানুষেরই এক গোষ্ঠীর মানব উন্নয়ন অপর গোষ্ঠীকে নিঃস্ব করে।

উন্নয়ন একটি অবিচ্ছেদ্য ব্যাপক প্রক্রিয়া— যার মূল লক্ষ্য সার্বিক জনগণ। এবং এই জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ভালোর জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ অবিরাম উন্নয়। কিন্তু, তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর মতোই ভারতও শুধুমাত্র শিল্পায়নকেই উন্নয়নের অন্যতম মূল লক্ষ্য করেছে। তাই, এদেশে উন্নয়ন মানেই বাঁধ, ব্রীজ, হাইওয়ে, বিমানবন্দর, মেগাসিটি, মেট্রোটাউন। যার প্রতিটির ক্ষেত্রেই জমির প্রয়োজন। তাই, সরকার জমি অধিগ্রহণ করছে স্থানীয় জনগণেরই বংশপরম্পরায় বাস করা জমি নিয়ে। ফলে, এই ধরনের উন্নয়নমূলক কাজে সমগ্র জনগণের শুধুমাত্র সামান্য অংশই 'উন্নত' হচ্ছে। বাস্তবে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পরিবেশ শরণার্থী।

ভারতের পরিবেশ শরণার্থী ঃ প্রেক্ষাপট উন্নয়ন

কারণ	শতকরা জনসংখ্যা
বিভিন্ন প্রকার বাঁধ নির্মাণ	৭৭%
খনি	১২%
শিল্প	৬%

ফলে, শহরমুখী প্রবাহ— ৫৫%

জোর করে উৎখাত করা মানুষের সংখ্যা— ২১.৩ মিলিয়ন (১৯৫১-১৯৯০)

পূর্ণবসতি— শুধুমাত্র ২৫%

(তথ্যসূত্র ঃ সায়েন্স রিপোর্টার, সেপ্টেম্বর, ২০০৬)

বর্তমান পৃথিবীতে পরিবেশ শরণার্থীর সংখ্যা বিপুল-বিশাল। আফ্রিকা ও এশিয়াতেই পরিবেশ শরণার্থীর সংখ্যা ও সমস্যা সবচেয়ে বেশী। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে আগামী পৃথিবীতে ভারত ও চীনেই পরিবেশ শরণার্থীর সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। কারণ হিসেবে গবেষণাপত্রটিতে বলা হয়েছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বড় বাঁধ তৈরি হয়েছে এই দুটি দেশেই। (তথ্যসূত্র ঃ রিফিউজি ওয়াচ অনলাইন)

বিভিন্ন দেশের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলোর প্রত্যেকটিই আগামী পৃথিবীকে এই ধরনের শরণার্থী সংক্রান্ত বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন। পরিবেশ শরণার্থীর সংখ্যা বাড়ার প্রাকৃতিক কারণগুলো হল আবহাওয়ার পরিবর্তন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, সমুদ্রজলের তলবৃদ্ধি ইত্যাদি। ভারত, চীন ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, বিভিন্ন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোও আগামী দিনে বেশি করে পরিবেশের কারণে পরিবেশ শরণার্থী সংক্রান্ত সমস্যায় পড়বে। একই সঙ্গে এই দেশগুলোতেই উন্নয়নের কাজ-কর্ম বেশিরভাগই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় না রেখেই হচ্ছে।

ভারতবর্ষে পরিবেশ শরণার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। পরিবেশ শরণার্থীদের মূলত ভাগ করা যায়, তিনভাগে—

- যাঁরা পরিবেশেরই বিপর্যয়ে স্থানচ্যুত হন। যেমন— ভূমিকম্প, সাইক্লোন প্রভৃতি।
- যাঁরা বসত ও বসতি হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে স্থায়ী বাস্তুহারা। যেমন— বড়ো বাঁধের কারণে তৈরি হওয়া জলাধারের তলায় ডুবে যাওয়া গ্রাম ও জমি।
- ভালো সুযোগ সুবিধে সহ উন্নত জীবনর খোঁজে স্থানান্তরিত মানুষ। যেমন— গ্রামের মানুষের শহরমুখীনতা।

ভারতের পরিবেশ শরণার্থীদের এক ব্যাপক অংশই উন্নয়নের কারণে তৈরি হয়েছে। এদের মধ্যে বাঁধের কারণই অন্যতম। অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে রাস্তাঘাট, শিল্পও রয়েছে। বাঁধের কারণে বিভিন্ন নদীতে ভাঙনজনিত সমস্যা বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ যার অন্যতম বড়ো উদাহরণ। শুধু গঙ্গাই নয়— সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলেও এই ধরনের সমস্যা রয়েছে। দ্রুতজনসংখ্যা বৃদ্ধি, সম্পদের অসমবণ্টন, সবটাই পরিবেশের ওপর ব্যাপক চাপ ফেলছে। জমির চরিত্র বদলে যাচ্ছে, বাড়ছে ভূমিক্ষয়, লবণের পরিমাণ। এরই সঙ্গে রয়েছে খরা, বন্যা, বনক্ষয় এবং দূষণের মতো বড়ো বড়ো ঘটনা। উন্নয়নের শুধুমাত্র উদ্যোগেই (অর্থাৎ বাঁধ তৈরি করতে, রাস্তা বানাতে বা খনি খননের জন্য) এই পৃথিবীর নব্বই লাখ থেকে ১ কোটি মানুষকে গত দশকে জোর করে বাস্তুহারা করা হয়েছে। (তথ্যসূত্র ঃ বিশ্বব্যাংক সমীক্ষা ও প্রতিবেদন, ২০০০)। এদের মধ্যে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গেরও সংখ্যা নেহাত কম নয়।

পরিবেশের অবক্ষয় বা উন্নয়ন একগোষ্ঠীর মানুষকে যখন পরিবেশ শরণার্থী বানায় তখন সেই গোষ্ঠীর মহিলারা সবচেয়ে বেশী বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। সামগ্রিক ভাবে মহিলাদের আর্থ সামাজিক অবস্থান এমনিতেই অনেক নীচে। পরিবেশ শরণার্থী মহিলা প্রান্তিকতার একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছায়। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে বিভিন্ন তথ্য, সমীক্ষা ও কেসস্টাডির মাধ্যমে পরিবেশ শরণার্থী মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও সংকটগুলোকে তুলে ধরার এক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষাটিতে পশ্চিমবঙ্গেরই বিভিন্ন অঞ্চল নেওয়া হয়েছে ও সামগ্রিকভাবে, ভারতের মহিলাদের অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সমস্যা ও সংকটের নীরিক্ষে এবং প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে।

উন্নত সমাজের আদিবাসী উন্নয়ন তুলনামূলক আলোচনা ঃ উত্তর দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলা

মোজাম্মোল হক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, রায়গঞ্জ কলেজ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

আদিবাসী শব্দটির সঙ্গে কমবেশি সকলেই পরিচিত। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি শ্রেণী ও সমাজের নতুন নামকরণ করা হয়েছে। সাধারণত যাদের আদিম অধিবাসী বলা হত, অধুনা সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় আদিবাসী বলা হয়। এই "আদিবাসী" শব্দটি সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন বিখ্যাত ভারতীয় সমাজসেবী ঠক্কর বাপা। এখনই জনপ্রিয় শব্দটি ভারতীয় লেখকগণ ইংরেজী রচনাতেও ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। এই শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'আদিম অধিবাসী'। বর্তমানে প্রায় ছয় কোটি আদিবাসী ভারতের কয়েকটি রাজ্যে বসবাস করছে।

সামগ্রিক জনসংখ্যার শতকরা ছয় ভাগ উপজাতীয় মানুষ। উত্তর-পূর্ব ভারতের অরুণাচল, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও অসম এই সাতটি রাজ্যে উপজাতির সংখ্যা ভারতের অন্যান্য অংশের চেয়ে অধিক। তবে হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যগুলি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। এই নয়টি রাজ্যে ভারতের আদিবাসী জনসংখ্যার প্রায় আশি শতাংশ বসবাস করে।

এই আদিবাসী জনসংখ্যাকে মুখ্যত তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা, উত্তরপূর্ব অঞ্চল, মধ্য বা কেন্দ্রীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণ অঞ্চল। উত্তরপূর্ব অঞ্চলে যে সমস্ত আদিবাসী জাতি-উপজাতি বসবাস করে তারা হল লেপচা, ভুটিয়া, মেচ, রাভা, গারো, আকা, ডাফলা, অবোর, মেরি, মিশমি, সিংপো, মিকির, কাচারি, খাসি, নাগা, কুকি, লুসাই, চাকমা, ইত্যাদি। মূল আদিবাসীরা বসবাস করে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে। এই অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীরা হল সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, হো, ভূমিজ, খারিয়া, বিরহোর, ভুইয়ান, সাভারা, কান্ধ, জুয়াং, গোন্ধ, বেইগা, ভিল, কোল ইত্যাদি। এই শ্রেণীর আদিবাসী সংখ্যায় ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী। দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী জাতি ও উপজাতিগুলি হল কেন্টু কোটা, কুযুম্বা, বেইগা, টোডা, কাদার, মালায়ান, মুথুবন, উরালি, কানিক্কর।

পশ্চিমবঙ্গের তফসিলীভুক্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের সংখ্যা আটত্রিশ। ১৯৮১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মোট জনসংখ্যা ৩,৭০,৬৭ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার এঁরা হলেন প্রায় ছয় শতাংশ। ২০০১ সালের আদমসুমারিতে তার সংখ্যা অনেকাংশে বেড়েছে।

আটত্রিশটি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত নয়টি সম্প্রদায়ই নব্বই শতাংশর বেশি আদিবাসী জনসংখ্যা পরিব্যাপ্ত করা আছে—

সাঁওতাল (৫৭.০৪%), ওরাওঁ (৪.৪০%), ভূমিজ (১০.৫৭%), মুণ্ডা (১০.৪৯%), কোড়া (৬.১৪%), লের্বো/খেরিয়া (৪.৭৮%), মাহালি (৪.৬৩%), ভুটিয়া (৪.৩২%), শবর (৪.২১%)।

সাঁওতাল জনসংখ্যাই পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। উত্তরবঙ্গে মঙ্গোল আদিবাসী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভুটিয়া, লেপচা, মেচ, রাভা, গারো, হাজং, চাকমা ইত্যাদি জনসংখ্যা মোট আদিবাসী জনসংখ্যার মাত্র তিন শতাংশ হলেও এদের শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্যময় জীবনযাত্রা, সামাজিক সাংস্কৃতিক ধারা ও পরিমণ্ডল এবং উন্নয়নের প্রচেষ্টা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

২০০১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী তিন চতুর্থাংশেরও বেশি আদিবাসী নিম্নলিখিত সাতটি জেলায় বসবাস করেন—

জলপাইগুড়ি (২০.০২%), পশ্চিম দিনাজপুর (উত্তর ও দক্ষিণ ১১%) ২৪-পরগণা (উত্তর ও দক্ষিণ ১০.১৬%), মেদিনীপুর (২১.৫৫%), বাঁকুড়া (১১.১৬%), পুরুলিয়া (১৪.৩৪%), বর্ধমান (১২.০৬%)।

উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জলবায়ু অনেকাংশে দক্ষিণবঙ্গ থেকে আলাদা। উত্তরবঙ্গ দীর্ঘকাল অবহেলিত ছিল। যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ ছিল না। শিক্ষিত সম্প্রদায় এই প্রত্যন্ত প্রদেশে নগণ্য ছিলেন। দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গের উপজাতিয় মানুষের বৈচিত্র্য অনেক বেশী। মোটামুটিভাবে আদিবাসীদের শারীরিক গঠন, ভাষা, পোশাক পরিচ্ছদ, জীবিকার প্রকৃতি এবং সামাজিক ও সংস্কৃতিক মাপকাঠির নিরিখে দুটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে, যথা, সমতল বঙ্গের আদিবাসী এবং উত্তরবঙ্গের আদিবাসী। অনুরূপভাবে উঃবঙ্গের আদি-বাসীদের আবার দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে আলোচনা করা যায়; যথা, পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী এবং সমতলভূমির আদিবাসী। সমতলভূমির আদিবাসীরা হল— সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, ভূমিজ ইত্যাদি শারীরিক গঠনের মাপকাঠিতে প্রাক্-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং ভাষাগত বিচারে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাভাষী। উঃবঙ্গের আদিবাসী গোষ্ঠী যেমন, ভুটিয়া, লেপচা, মেচ, গারো, রাভা ইত্যাদি মোঙ্গল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ও তিব্বত চীন ভাষাভাষীর মধ্যে পড়ে। সমতলভূমির আদিবাসীদের সামাজিক রীতিনীতিতে পিতৃপ্রাধান্য বিরাজমান, কিন্তু উঃবঙ্গের আদিবাসী গোষ্ঠীর কিছু (বিশেষত পার্বত্য অংশে) মাতৃ প্রাধান্যের নিদর্শন লক্ষ করা যায়।

উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের বসবাসের ইতিহাস একটু ভিন্ন ধরনের উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার বনাঞ্চলে ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বসবাস করে লেপচা, ভুটিয়া, টোটো, মেচ, রাভা, গারো ইত্যাদি মঙ্গোলগোষ্ঠীর আদিবাসীগণ। এছাড়াও আশেপাশে এবং চা বাগিচা অঞ্চলে বসবাস করে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, মাহালি, খেড়িয়া ইত্যাদি। রাভা মেচ, গারো, টোটো সম্প্রদায়গুলি মূলত জলপাইগুড়ি কোচবিহারের আদিবাসিন্দা। মালদা এবং দুই দিনাজপুরে (উত্তর ও দক্ষিণ) বেশির ভাগ সাঁওতাল, মুণ্ডা, ভূমিজ, মাহালি, বীরহোড় ইত্যাদি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ বসবাস করে। উপজীবিকার ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ শতাংশের অধিক কর্মী চাষের উপর নির্ভরশীল।

রাষ্ট্র ও প্রান্তিক গোষ্ঠী ঃ একটি নির্মাণ ও বিনির্মাণের গল্প

দয়াবতী রায়
সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোস্যাল সায়েন্সস, কলকাতা

রাষ্ট্র ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর সম্পর্ক বহুমাত্রিক বা দ্বান্দ্বিকও বলা যায়, এক অর্থে। রাষ্ট্র ও প্রান্তিক গোষ্ঠী পরস্পরকে প্রভাবিত করে, বিরোধ করে, ভাঙে, আবার গড়েও। প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোকে নির্মাণ এবং একই সঙ্গে তাদের বিনির্মাণ করতে চাওয়াটা বোধ হয় একটা রাষ্ট্রীয় অ্যাজেন্ডা। রাষ্ট্র কীভাবে এবং কেন প্রান্তিকতা তৈরি করে চলে আবার পাশাপাশি তার কল্যাণও করতে সচেষ্ট হয় তা গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। (স্বনির্মিত) প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর কল্যাণ করার উদ্যোগ নিয়ে রাষ্ট্র কীভাবে উন্নয়নের প্রকল্প নিয়ে প্রশাসনকে সাজিয়ে চলে তা পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনীতি আলোচনা করলে একটা আঁচ পাওয়া যায়। বিপরীতে, প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোও, সেইসব রাষ্ট্রীয় প্রকল্পগুলোকে কীভাবে দেখছে, প্রভাবিত করছে আবার একই সাথে তাকে কেন্দ্র করে নিজেদের রাজনীতি সংগঠিত করছে তা জানা যেতে পারে গভীর অনুসমীক্ষার মাধ্যমে।

প্রান্তিক গোষ্ঠীর সেই জটিল রাজনীতিকে খানিকটা ভেতর থেকে দেখে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হবে এই গবেষণাপত্র। 'উন্নয়ন'-এর উপর ভিত্তি করে বা কেন্দ্র করে প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো কীভাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় একেবারে নীচু তলায়, কীভাবে রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক রাজনীতির উপর নির্ভর করে, আবার একই সাথে তাকে প্রত্যাখ্যান করে সেই প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করতে চাইবে এই গবেষণা।

ক্ষমতা ও ক্ষমতায়ন ও গণতন্ত্র

পার্থসারথি বন্দ্যোপাধ্যায়
সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোস্যাল সায়েন্সস, কলকাতা

দরিদ্র, প্রান্তিক ও 'অনগ্রসর' জনসমষ্টিগুলোকে সংসদীয় রাজনীতি তথা গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তথা উন্নয়নের মূল স্রোতে যুক্ত করার অন্যতম প্রধান পন্থা হিসাবে ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি উঠে এসেছে আধুনিক রাষ্ট্রের কর্মসূচী হিসাবে। এই কর্মসূচীর প্রণেতা প্রাচ্যের রাষ্ট্র নায়করা যতটা না, তার থেকে বেশি আন্তর্জাতিক লগ্নীকারী সংস্থার বকলমে বিশ্বজোড়া পুঁজির কারবারীরা। সম্প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বৈদেশিক 'সাহায্যে'র ভারপ্রাপ্ত দফতর DFID পসিচমবঙ্গ সরকারকে 'গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ শক্তিশালী করা' (Strengthening Rural Decentralization) প্রকল্পে ৭০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। 'বিকেন্দ্রীকরণ' মানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, যা অন্য কথায় 'ক্ষমতায়ন' (empowerment) বলে আধুনিক রাষ্ট্রের জনপ্রিয় অভিধায় স্থান পেয়েছে।

এই বিকেন্দ্রীকরণ বা ক্ষমতায়ন প্রকল্পের রূপকার রাষ্ট্র, যা ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের এই প্রকল্প তাই স্বভাবতই পরস্পরবিরোধী। রাষ্ট্র একই সাথে ক্ষমতার কেন্দ্র এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের হাতিয়ার হিসাবে কিভাবে কাজ করতে পারে? কতটা করতে পারে? এসব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে প্রধানত পঞ্চায়েত স্তরে। প্রথমে ভাবা হয়েছিল, পঞ্চায়েত ব্যবস্থাটাই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের হাতিয়ার হবে। পরবর্তীকালে বিভিন সমীক্ষায় প্রকাশ পেল যে, পঞ্চায়েত এক ধরণের ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটাচ্ছে গ্রামস্তরে, এবং মানুষ ক্রমাগত পঞ্চায়েতের প্রতি নিস্পৃহ হয়ে পড়ছে। তখন প্রয়োজন পড়লো আরও নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করার যা ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে সাহায্য করবে। গ্রামীণ মানুষ, নিম্নবর্গের মানুষ যাতে রাষ্ট্র থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন (alienated) বোধ না করে। রাষ্ট্রকে তাই পৌঁছে দিতে হবে, পৌঁছে যেতে হবে একদম তৃণমূল স্তরে। মানুষকে যুক্ত করতে হবে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে রাষ্ট্রকেন্দ্রীক রাজনীতিতে, 'মূল স্রোতে'। জনগণ যদি রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, রাষ্ট্র যদি জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এক দমন-যন্ত্র হিসাবে ক্রমাগত প্রতিভাত হয়, তাহলে রাষ্ট্রের সমূহ বিপদ। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তখন বিপন্ন হয়। সমাজ বিপ্লবের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে।

রাষ্ট্রীক ক্ষমতায়নের এই কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক দলগুলোর স্বভাবতই একটা বড় ভূমিকা থেকে যায়। আধুনিক রাষ্ট্রের সাথে জনগণের মেলবন্ধন ঘটানোর কাজে পার্টিগুলোর একটা বড় ভূমিকা থাকে। পার্টি একই সাথে রাষ্ট্রের কর্ণধার হয়, আবার জনগণকেও প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিনিধিত্ব করার রূপগুলোও রাষ্ট্র ঠিক করে দেয়, বেঁধে দেয়। অন্যদিকে, জনগণের কাছে রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করে পার্টি রাষ্ট্রের কর্মসূচীগুলো তৃণমূল স্তরে রূপায়ন করে, রাষ্ট্রকে জনপ্রিয় করার প্রয়াস চালায়। ক্ষমতায়ন তাই পার্টিগুলোরও জনপ্রিয় শ্লোগানে পরিণত হয়। গণতন্ত্রের মূল শর্ত হয়ে ওঠে ক্ষমতায়ন।

ক্ষমতায়নের এই রাষ্ট্রীক কর্মযজ্ঞে রাষ্ট্র, পার্টি জনগণের মধ্যে এক নিবিড় আন্তঃসম্পর্ক ও আন্তঃক্রিয়া গড়ে ওঠে। নিম্নবর্গের মানুষ, যারা চিরটাকাল ক্ষমতা-বৃত্তের বাইরে অবস্থান করেছেন, তারাও নানান জটিল সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন ক্ষমতাতন্ত্রের সাথে, পার্টিতন্ত্রের সাথে। এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক সম্পর্কে নানান ভাঙাগড়া চলে। অর্থনৈতিক সম্পর্কের সরল গতিপথে আর সমাজকে বোঝা যায় না। সামাজিক আবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে রাজনীতি। রাষ্ট্রকেন্দ্রীক সংগঠিত রাজনীতির পরিসরটা বাড়তে বাড়তে নিম্নবর্গের পরিসরটাকেও গ্রাস করে ফেলে। নিম্নবর্গের আশা-আকাঙ্খা, বিক্ষোভ-

বিদ্রোহ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংগঠিত রাজনীতির পরিসরে বাঁধা পড়ে। নিম্নবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের যুগ অতীত দিনের বিষয় হয়ে পড়ে।

ক্ষমতায়নের এই স্ববিরোধী প্রকল্পটা রাষ্ট্র, পার্টি ও জনগণের মধ্যে যে জটিল সম্পর্ক তৈরী করে, এবং সমাজে ক্ষমতা সম্পর্কগুলোয় যে নতুন উপাদান, নতুন বিন্যাস নিয়ে আসে, তা অনুসন্ধানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান পশ্চিমবঙ্গ, তথা বাংলার গ্রাম। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আধুনিকতম প্রকল্পগুলো রূপায়নের পরীক্ষাগার বাংলার গ্রাম। তাই বাংলার গ্রাম বিশ্বপুঁজির প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলোর আগ্রহ ও গবেষণার বিষয়। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকরাও কম আগ্রহী নয়। কিন্তু বাংলার গ্রাম যেন এক রহস্যের ভাণ্ডার, যা ধরা দিয়েও ধরা দেয় না। রাজনীতি যেখানে বহু বিচিত্র ও বহুমুখী ধারায় প্রবাহিত। ক্ষমতায়নের প্রকল্প যেখানে নানা মাত্রায় প্রকাশিত। সেখান কোন জাদুতে ক্ষমতায়ন ও ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন— এই দুই পরস্পর বিরোধী সত্তার সহাবস্থান ঘটে? রাষ্ট্রীয় এই প্রকল্পটি শেষ অবধি গণতন্ত্রীকরণের ধারাটিকে কিভাবে প্রভাবিত করে? কতটা করে? এক কথায়, রাষ্ট্রীক ক্ষমতায়ন প্রকল্পটি গণতন্ত্রের পক্ষে বা বিপক্ষে কতটা কাজ করে, তা বুঝে নেওয়ার একটা যথার্থ ক্ষেত্র গ্রামবাংলার রাজনীতি। এই গবেষণাপত্রের বিচরণ এই ক্ষেত্রে ক্ষমতা ও গণতন্ত্রের চিরাচরিত দ্বন্দ্বকে ঘিরে।

নতুন প্রযুক্তি, জ্ঞান এবং রাষ্ট্র— একটি বিশ্লেষণ

বঙ্কিবরণ ঘোষ

অর্থনীতি বিভাগ, শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ, হুগলি

অভিধান মতে প্রযুক্তির নানা ধরনের বিবরণ রয়েছে। এই নিবন্ধে দেখানো হবে যে জ্ঞানই হলো 'নতুন প্রযুক্তি' সংক্রান্ত আলোচনার মর্মবস্তু। তা হলে প্রযুক্তির সঙ্গে মানুষে শুভ হওয়া যুক্ত; একজনের ভোগ অন্যজনের ভোগকে নাকচ করে না। যদি না আইনবলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় তবে এই বিষয় চলতেই থাকবে। প্রযুক্তি, তৈরি হতে সময় লাগে, তাই যদি একজন একটি প্রযুক্তি আত্মস্যাৎ না করে তবে তার প্রসারণ দুরূহ। আবার যদি নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে তবে তা প্রতিযোগিতা কমিয়ে দেবে।

জাতীয় উদ্ভাবন ব্যবস্থা, আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প হতে পারে কিনা, রাষ্ট্র এই ভুবনায়নের যুগে ভূমিকা পালন করতে পারে কিনা তা খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করাও এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ সড়ক, উন্নয়ন ও পরিবেশ

সুতপা ভট্ট

ইতিহাস বিভাগ, সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সুতানটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম নিয়ে কলকাতা নগরীর জন্ম হয়। সময়ের সাথে সাথে ঐতিহাসিক পট-পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত কলকাতা মহানগরীর বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। এই শহরের বিকাশ ও বিস্তারের সাথে সাথে এর রাস্তাঘাট ও রাজপথের পরিবর্তন ঘটে, এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে পরিবেশ ও শহরের যানবাহন চলাচলের উপর। কলকাতার বিকাশের সাথে সাথে তার পথের বিবর্তনের ধারাটিও স্পষ্ট হয়। একদিন যে রাস্তা ছিল পায়ে চলার উপযুক্ত, যার দুদিকে ছিল ঝোপ, জঙ্গল, বন্যাপ্রাণী ও পুকুর, ডোবায় ঘেরা প্রয়োজন ও অবস্থার তাগিদে তাই হল দীর্ঘ ও বিস্তৃত। যেমন— আজকের চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ বা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ।

কলকাতার প্রধান রাজপথগুলির মধ্যে ৫ নং রাজপথ হল— চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ (প্রায় ১০০ ফুটের অধিক চওড়া/প্রস্থ)। এই চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ এর পূর্বতন নাম ছিল হ্যাপিডে স্ট্রীট। কলকাতা শহরের উন্নয়নের জন্য ১৯১১ সালে হ্যাপিডে স্ট্রীটকে (চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ) উত্তরে সার্কুলার রোড ও দক্ষিণে ফ্রি স্কুল স্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সে সময়কার কলকাতার সর্বাপেক্ষা জনবহুল অঞ্চল উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে ২৩/৪ মাইল দীর্ঘ সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ অন্যতম। এটি বর্তমানে ১০০ ফুটের অধিক চওড়া এবং উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত প্রধান শড়ক। কলকাতা শহরে পরিবেশ ও যানচলাচলের ওপর এই রাস্তার প্রভাব এই গবেষণা প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ হল সকল বস্তুতান্ত্রিক একক অর্থাৎ এমন একটি সামগ্রিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা যা মানুষ প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি, জীবনযাত্রা প্রণালী ও কর্মধারাকে প্রভাবিত করে ও কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে। মানব সভ্যতার বিকাশ অগ্রগতি, মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম, রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও সামাজিক জীবন পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় ও পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

অগোছালো উন্নয়ন ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর অঞ্চলের পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া

সুশান্ত কুমার ভৌমিক
ইতিহাস বিভাগ, বেহালা কলেজ, কলকাতা

কলকাতার ঠিক দক্ষিণে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় দুটি ব্লক— বিষ্ণুপুর-১ ও বিষ্ণুপুর-২। প্রথমটির আয়তন ৪৫ বর্গমাইল, দ্বিতীয়টির আয়তন ৩৭.৪৩ বর্গমাইল। এক সময় ছিল গ্রামাঞ্চল। ১৯৭৮ সালের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিল্পায়নের কর্মসূচী ঘোষণা করলে বহু শিল্পপতি এগিয়ে আসেন বিষ্ণুপুর এলাকায় কলকারখানা গড়ার জন্যে। শিল্পায়নের উপযুক্ত পরিবেশ বিবেচনাহেতু দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ডায়মণ্ড হারবার রোডের দুপাশে কৃষিজমিগুলো কিনতে শুরু করে শিল্পপতিরা। মধ্যবিত্ত ও গরীব কৃষকরা তাদের জমিগুলো বহু আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিক্রী করতে থাকে। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ; এক ঃ একসঙ্গে বেশ খানিকটা নগদ অর্থ হাতে পাওয়া, দুই ঃ কলকারখানায় পরিবারের যে কোন একটা ছেলের চাকুরীর সংস্থান। শিল্পপতিদের পাশাপাশি এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত, গরীব চাষীকে প্রলোভন দিয়ে বেশ কিছু জমি ক্রয় করে। ফলে হাভাটেক্সটাইল, ন্যাশানাল প্লাইউড, রিচ বিস্কুট, জার্মান ফ্যাক্টরী প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠান মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

পরিণামে এই এলাকার মধ্য ও ক্ষুদ্র কৃষকরা জমি বিক্রি করে ক্ষেত মজুরে পরিণত হচ্ছে। বহু কৃষি জমি নষ্ট করে শিল্পায়নের নামে যে সব কলকারখানা গড়ে উঠছে তাতে স্থানীয় বেকার ও জমি হারানো ওইসব ক্ষেতমজুর পরিবারের বেকারদের শ্রম নিযুক্তির পথকে বন্ধ করে দিয়ে ঢালাও কন্ট্রাক্টর প্রথার মাধ্যমে কারখানাগুলোকে চালাবার ব্যবস্থা অনেকাংশে মেনে নেওয়া হচ্ছে। ফলে উৎপাদনের বহু শর্তের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত মার খাচ্ছে। বাড়ছে বেকারত্ব। কন্ট্রাক্টর শ্রমিককে নো ওয়ার্ক নো পে অর্থাৎ না কাজ না পাওয়ার ভিত্তিতে কারখানায় শ্রম দিয়েও অনাহারে দিন কাটাতে হয়। অথচ স্থায়ী শ্রমিকের স্বীকৃতি থাকলে পেনশন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোন অবকাশ থাকত না। তারপরে কারখানাগুলো লক আউট হয়ে গেলে কারখানার ভূমিসহ ইমারত বহুক্ষেত্রে হস্তান্তর হয়ে যায় শিল্প উৎপাদনের শর্ত ছাড়াই। শুধু তাই নয় বহুক্ষেত্রে হস্তান্তর হয়েছে বহাল তবিয়তে। একটি ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংগঠিত প্রয়াসে নতুন মালিকের অপপ্রয়াসকে রোখা সম্ভব হয়েছে উচ্চ-আদালতের আদেশ বলে।

এই সমস্ত গড়ে ওঠা কারখানাগুলো থেকে যত্রতত্র ফেলা হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ও আবর্জনা। ধোঁয়া, ধুলো, শব্দ ও দুর্গন্ধ এলাকার গ্রামীণ নির্মল নিস্তব্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশকে করে তুলছে কলুষিত। পরিবেশ সুরক্ষায় এর বিরুদ্ধে যে একেবারেই প্রতিবাদ হয় না তা নয়, কিন্তু কারখানার মালিকরা বিভিন্ন কৌশলে সেই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলার বুক চিরে জোকা থেকে ডায়মণ্ডহারবার কাকদ্বীপ হয়ে নামখানা পর্যন্ত যে রাস্তাটি চলে গিয়েছে সেটি আজ রিসর্টের রেড লাইনে পরিণত হয়েছে। সুদীর্ঘ এই রাস্তার পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে বহু সংখ্যক রিসর্ট। বিষ্ণুপুর এলাকার উল্লেখযোগ্য রিসর্টগুলি হল পাম ভিলেজ, জয়ল্যান্ড রিসর্ট, ডায়মণ্ড রিসর্ট ভিলেজ এন্ড নার্শারী, হলিউড রিসর্ট, ঈগল ইন্, নন্দন পিকনিক গার্ডেন, শালিনী রিসর্ট প্রভৃতি।

এই রিসর্টগুলোতে একদিকে যেমন অঢেল খানাপিনার ব্যবস্থা থাকে তেমনিই এখানে বহু অনৈতিক কার্যকলাপও চলে। ফলে এই রিসর্টগুলি এলাকার সামাজিক পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে। এই রিসর্টগুলিতে অনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধের দাবীতে আন্দোলন হয়েছে।

এই গবেষণা পত্রের উদ্দেশ্য হল বিষ্ণুপুর অঞ্চলে কারখানা গড়ে ওঠার ফলে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও তার প্রভাব অনুসন্ধান করা সেই সঙ্গে সঙ্গে কারখানা ও রিসর্ট গড়ে ওঠার দরুণ প্রাকৃতিক দূষণ ও সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধান করা।

তথ্য প্রযুক্তির অন্যমুখ

অরুন্ধতী ভট্টাচার্য
বিদেশী ভাষা বিভাগ, বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়

এই নিবন্ধে কয়েকটি ঘটনাক্রম বিশ্লেষণ করে তথ্যপ্রযুক্তির অন্য মুখটি প্রকাশ করার চেষ্টা করা হবে। যে সমস্ত প্রশ্ন এই আলোচনায় উঠে আসবে তার মধ্যে পড়বে 'পরিচয়ের সমস্যা'— যেমন তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে সঙ্গে জড়িত অনেকের কাছেই 'আমার বাড়ি' বলতে সাবাল্য পরিচিত, একান্ত ঘনিষ্ঠ, সেই জড় বস্তুটির কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই যে মুহূর্তে যেখানে তারা আছে, সেই মুহূর্তের অস্তিত্বটি নিয়েই তারা ব্যস্ত। তাই অনেকের কাছেই 'বাড়ি' ফিরে যাওয়া, 'বাড়ি'-র টান, পরিবার এই শব্দগুলোর বদলে চালকের আসনে বসেছে কিছু নতুন শব্দ ঃ 'গ্যালারি প্যাকেজ', 'পার্কস', 'অফার' ইত্যাদি। তারা ক্রমাগত বদলে যেতে থাকে আর বদলানোর নিয়ামক শক্তি হল পৃথিবীর বাজারে সাজিয়ে রাখার নিত্যনতুন পণ্যসম্ভার। তথ্য-প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উন্নতির ফলে জন্ম নিয়েছে কর্মসংস্থানের এক নতুন ক্ষেত্র— বিপিও বা বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বড় শহরে, বিশেষত বাঙ্গালোর, দিল্লী, মুম্বই, হায়দ্রাবাদ,

কলকাতা ইত্যাদিতে গড়ে উঠেছে এই পরিষেবা প্রদানকারী বহু সংস্থা। ফলত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, তরুণ সম্প্রদায়ের একাংশ তাদের স্থান, পরিবার, সংস্কৃতি, এমনকি ভাষা পর্যন্ত ত্যাগ করে চলে আসছে এই বিপিও কেন্দ্রিক শহরগুলোতে। আর এই গন্তব্য শহরগুলো নির্ধারণ করে 'City Competitiveness Framework'-এর মাপকাঠিতে। পরিণতিতে জন্ম নিচ্ছে এক নতুন ছিন্নমূল প্রজন্ম। মধ্যবিত্তের চেনা মূল্যবোধ থেকে বহু দূরে পণ্যনির্ভর এক অন্য হিসেব-নিকেশের ভুবনে রোপন হচ্ছে সেই উৎছিন্ন মূল।

তথ্য প্রযুক্তি আর বিশ্বায়ন— একে অন্যের পরিপূরক। প্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবীর স্থলভাগ আজ একে অন্যের বড় কাছাকাছি এসেছে। তাই আর নিজের ঘরটুকুর চৌহদ্দিতে পড়ে থাকা নয়। বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে হতে হবে বিশ্ব-নাগরিকও। মাতৃভাষা নয়, কথা বলতে হবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষায়। শিখতে হবে উন্নত দেশের, বিশেষত আমেরিকার আদবকায়দা, জানতে হবে বিদেশের ইতিহাস-ভূগোল, কম্পিউটার থেকে সাঁতার বা পাশ্চাত্য সঙ্গীত সবেতেই চাই দক্ষতা। আর এই সমস্ত পরিষেবা দিয়ে আজকের শিশুকে ভবিষ্যতের বিশ্ব-নাগরিক করে তোলার প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয়েছে এক নতুন চমক— ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেই এই ধারণার সূত্রপাত। তবে সম্প্রতি তা আজকের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির সুযোগে মহীরুহের আকার নিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন বড় শহরে সম্প্রতি এই স্কুল তৈরি একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসার প্রধান উপকরণ ও মূলধন যেহেতু ছাত্র-ছাত্রী, তাই পরিচালন সমিতিও তাদের প্রতি বিশেষ যত্নবান। কোনওভাবেই যেন স্কুলে তাদের কোনও অসুবিধা না হয়, পড়াশোনার চাপ যেন কখনও ভারি হয়ে না ওঠে। কোনও কারণেই যেন স্কুলের প্রতি বিমুখ না হয়। তাই সদাসন্ত্রস্ত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী থেকে শিক্ষকবৃন্দ মায় প্রিন্সিপাল পর্যন্ত। 'শিক্ষাদানের মুক্ত ও আনন্দময় পরিবেশ-এর বিজ্ঞাপনকে সামনে রেখে ছাত্র-তোষণের এই অদ্ভুত পরিমণ্ডলে ছাত্র-ছাত্রীরাও সহজে অবহেলা করতে শেখে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষক উভয়কেই। তাদের বাবা মায়েরা সন্তানের জ্ঞানার্জনের চেয়ে স্কুলে প্রদেয় অর্থের বিনিময়ে উপযুক্ত পরিষেবা প্রাপ্তির প্রতি বেশি আগ্রহী। বিপরীতে শিক্ষকদের মাইনে যেহেতু প্রচলিত স্কুলের মাইনের চেয়ে দ্বিগুণ থেকে দশগুণ পর্যন্ত বেশি, তাই চাকরি রক্ষার স্বার্থে তাঁরাও বহু ক্ষেত্রে নীরব থাকেন। আর বাহ্যিক চমক, আর্থিক জৌলুশ, প্রচারের কৌশল এবং ইংরাজি শেখার প্রতি ভারতীয়দের ঔপনিবেশিক মানসিকতার ফলে এই স্কুলগুলো দিনে দিনে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ভারতীয় শিক্ষার যে মূলগত উদ্দেশ্য 'তমসো মা জ্যোতির্গময়', তার থেকে সহস্রযোজন দূর দিয়ে বইছে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের এই চোরাস্রোত। শুধু একটাই উদ্বেগ, এই বহমানতার পরিণতি কি, 'কি আছে শেষে'?

স্বেচ্ছাকৃত ও বাধ্যতামূলক উচ্ছেদ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা

জগদীশ চন্দ্র সরদার
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

পটভূমি

ভারত ভাগ হয়ে গেল ১৯৪৭'র ১৫ই আগস্টের মধ্যরাত্রে। যারা অনাহার, অর্ধাহার থেকে, জমিদার, জোতদার, রাজার অত্যাচার সহ্য করে স্বাধীনতা ভোগ করবে বলে লড়াইয়ের মাঠে নেমেছিল তারা চিরকাল রয়ে গেল 'বঞ্চিতের দলে'। আর রাষ্ট্রকাঠামোর শীর্ষস্থানীয়দের চোখ রাঙানী, আশা-আকাঙ্ক্ষা অহর্নিশ বর্ষিত হতে থাকে তাদের উপর। এই সব মানুষেরা ছিল কৃষক, প্রান্তিক কৃষক, দিন মজুর, কলে কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক এবং সমাজ যাদের অনগ্রসর শ্রেণী হিসাবে চেনে। এরা কেউ স্বেচ্ছায় বা কেউ বাধ্যতামূলক উচ্ছেদ হল। কীভাবে হল তা প্রধান আলোচ্য বিষয়—

জাতীয় ষড়যন্ত্র

জাতীয় ষড়যন্ত্রের বলি হল অসংখ্য মানুষ। জাতীয় ষড়যন্ত্র এই কারণে বলব যে জাতীয় নেতৃবৃন্দ তারা নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দা তোলা এবং ক্ষমতার প্রতি চরম লোভের দরুন জন্ম দেয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের। সিন্ধু বেলুচিস্থান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ববাংলা নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্র আর অবশিষ্ট ভারত, পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাঞ্জাব নিয়ে গঠিত হয় ভারত রাষ্ট্র। শুরু হল স্বেচ্ছাকৃত অথবা বাধ্যতামূলক উচ্ছেদ। ভোগ করতে থাকে চরম সংকট।

দেশভাগ ও ঘরছাড়া মানুষ

স্বাধীনতা এল কিন্তু খণ্ডিতভাবে। দুই দেশেব বেশ কিছু মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘুতে পরিণত হল। কিন্তু আপন ঘর দোর ছেড়ে এপারে এল এবং উদ্বাস্তু হল আবার কেউ কেউ ওপারে গেল মা মাটি ছেড়ে। এ এক আশ্চর্য খেলা যেন মানুষ মানুষ খেলা। ঘর ছাড়া মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল।

দাঙ্গা ও তার ফল

১৯৪৮-এ দাঙ্গা শুরু হয়। মানুষে মানুষে, ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে একসাথে লড়েছিল তারা পরস্পর চরম শত্রুতে পরিণত হয়। তারা যে মানুষ এ বোধ হারিয়ে ফেলে। ষড়যন্ত্রের ফলে প্রসবিত রাষ্ট্র কাঠের পুতুল হয়ে থাকল। বেড়ে গেল ঘর ছাড়া মানুষের সংখ্যা।

৬০-৭০-এর দশক

৬০ ও ৭০-এর দশকে সাধারণ মানুষের কোন অধিকার থাকল না। মানবিক অধিকার ক্ষুন্ন হতে থাকে। প্রশাসন বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারীর মাধ্যমে ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নেয় এবং বহু কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের বরখাস্ত করা হয়। এ এক ধরনের উচ্ছেদ।

নর্মদা কলিঙ্গ ও সিঙ্গুর

উঁচু বাঁধ করে জলাধার নির্মাণ করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি করবে বলে সরকার স্থির করেছে, কিন্তু ঐ বাঁধের তলদেশে অসংখ্য বসবাস কারী মানুষ উচ্ছেদ হবে রাষ্ট্রকর্তৃক। কলিঙ্গনগরে সরকার টিসকো কারখানা স্থাপনের নামে বেশ কিছু আদিবাসী মানুষকে উচ্ছেদ করেছে। সিঙ্গুরে টাটার মোটর গাড়ীর কারখানা স্থাপনের নামে প্রায় ২০ হাজার কৃষককে উচ্ছেদ করেছে। (বিযদ আলোচনায় বলব)।

মনে রাখা

বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়ের কথায় বলা যায় যে, স্বাধীনতার অর্থ শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় মানুযের ক্ষমতা লাভ নয়, জনসাধারণের ক্ষমতা লাভ, যে ক্ষমতা তাদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে লাভ করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় মুষ্টিমেয় মানুযের স্বার্থে ভালো মন্দ নির্ধারিত হয়েছে, অধিকাংশের জন্য তা স্থির হয়নি।

বাঙালি উদ্বাস্তু ও সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন

কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর
উত্তর ২৪ পরগণা

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতবর্ষকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তোলার কথা এবং তার সকল নাগরিক যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার লাভ করেন সেই আকাঙ্ক্ষার কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যদিও প্রস্তাবনার সেই স্বপ্নপূরণের পথে না হেঁটে গোটা দেশকে অনেক সময় বিপরীত পথেই হাঁটতে বাধ্য করা হয়েছে। যেমন ১৯৭০-এর দশকে জরুরী অবস্থা ছিল গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের বিরোধী, তেমনি বর্তমানে বিশ্বায়ন ও পুঁজির পূজায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ভাবনাকেই। যদিও আমরা কেউ কখনো প্রশ্নই তুলিনি আমাদের সংবিধানের অমর্যাদা ঘটিয়ে এমন কাজ করা হলো কেন, এবং বলোই বা কীভাবে? প্রশ্ন যারা তুলবেন সেই গণদেবতার সিংহভাগই আজো সংবিধান বস্তুটি সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল নন, ফলে মুষ্টিমেয় আলোকপ্রাপ্ত ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর কিছু মানুষ আজো জনগণের নামে নির্বিবাদে নিজেদের ইচ্ছাকেই চরিতার্থ করে চলেছেন।

রাষ্ট্রের পরিচালক হিসেবে সরকার যেসব আইন ও সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করেন, সার্বিকভাবে তা সকলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করবে, কারু প্রতি কোনো পক্ষপাত বা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না, এই আমাদের সাধারণের প্রত্যাশা। কিন্তু এই প্রত্যাশা কখনো কখনো লঙ্ঘিত হয় এবং কোনো জনগোষ্ঠীর পক্ষে তা হয়ে দাঁড়ায় মৃত্যু পরোয়ানার সামিল। বিপন্ন হয় মানবাধিকার এবং সম সুযোগ ও মর্যাদার প্রতিশ্রুতি। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (২০০৩) তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

আমরা জানি অন্যায় ভাবে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করা হয় ১৯৪৭ সালে। খণ্ডিত পশ্চিমাংশের সংখ্যা লঘু শ্রেণীর মানুষ ভারতে এলে আশ্রয় ও পুনর্বাসন লাভ করেন সহজেই। পূর্বাংশের সংখ্যা লঘু শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঘটে এর ব্যতিক্রম। প্রথম থেকেই তাদের পুনর্বাসনে বঞ্চিত করার এবং আগন্তুকদের ফেরত পাঠাবার চেষ্টা চলে। ১৯৫০ সালে দুজন মন্ত্রীকে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়ে ভারত সরকার সে দেশের সংখ্যালঘুদের সে দেশেই আপাতত থাকতে অনুরোধ করেন। অধিকাংশ মানুষ ভারত সরকারের প্রতি বিশ্বাস রেখে সেখানেই তখনকার মতো থেকে যান। কিছু সংখ্যক মানুষ নিতান্ত নিরুপায় হয়ে দেশত্যাগও করেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো গোড়া থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের প্রতি যে বৈষম্য নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে কখনো সরে আসেন নি। পুনর্বাসন প্রক্রিয়া থেকে নাগরিকত্ব সর্বত্র এ বৈষম্য অটুট থেকেছে।

সেই বৈষম্যের পথেই রচিত হয়েছে ২০০৩-এর সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন। এই আইনে তাদেরই বে-আইনী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত ও শাস্তিদানের কথা বলা হয়েছে, যারা ১৮ জুলাই, ১৯৪৮-এর পর কোনো বৈধ অনুমতি পত্র না নিয়ে ভারতে এসেছেন। আশ্চর্যজনকভাবে এ পর্যন্ত শুধু গণহারে বাঙালিদেরই অনুপ্রবেশের বলির পাঁঠা করা হয়েছে। ধরে ধরে তাদেরই অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ ঘটনা ঘটছে, বিহার, ওড়িশা মহারাষ্ট্র, উত্তরাঞ্চল থেকে আন্দামান— সর্বত্র। সুতরাং ভয় থেকেই যাচ্ছে যে নব প্রণীত নাগরিকত্ব আইন তাদের উপরে কঠোর ভাবে নেমে আসবে।

মজার কথা হল দেশভাগের খড়্গা নামিয়ে স্বভূমিতেই পরবাসী বানিয়ে দেওয়া হলো যে বঙ্গবাসীদের, লোক বিনিময় দূরের কথা শরণার্থীর যোগ্য মর্যাদা বা অধিকারণ তারা পেল না। শ্রীলঙ্কা থেকে তিব্বত থেকে, নেপাল থেকে, ভূটান থেকে, দলে দলে ভারতে এসে অবস্থান করলেও প্রশাসন কখনো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবেনি। উল্ট তারা পান শরণার্থীর খাতির ও আপ্যায়ন। এমনকি নাগরিকত্ব আইনে ব্যতিক্রম ঘটিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা মানুষেরা নির্দিষ্ট সময় অবধি ভারতে থাকলেই ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে পারেন। অনুপ্রবেশকারী হিসেবে তাদের লাঞ্ছনার কথা কখনো ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। অথচ তিরিশ চল্লিশ এমনকি পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতে আছেন এমন বাঙালিদেরও হামেশাই এ ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ভিনরাজ্যের প্রশাসন গাড়ী বোঝাই করে সীমান্তে টেনে নিয়ে তাদের পুশব্যাক করার চেষ্টা করেন।

একই দেশে বহিঃরাষ্ট্র থেকে আগন্তুকদের প্রতি এমন ভেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে এমন ভিন্ন মুখি তৎপরতা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে কখনো কখনো গ্রহণ করতেই হয়। কিন্তু

অন্যায়ভাবে তা যখন বাঙালিদের উপরেই নামিয়ে আনা হয় (সন্ত্রাসবাদের অজুহাত তো অতি হালের), বিশেষ সেই বাঙালির উপর স্বাধীনতার মাসুল গুণে দিতে ভিটেমাটি পর্যন্ত হারাতে হয়েছে যাদের, তখন ন্যায় বিচারের বদলে অন্যায় বিচার আমাদের স্তম্ভিত করে।

যে প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে একটি রাষ্ট্র ভেঙে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয় অথচ তারই একাংশের অধিবাসী কোনো রাষ্ট্রেরই নাগরিক হবার অধিকার পায় না, সেই প্রক্রিয়া, সেই সব আইন ও উপেক্ষিত বঞ্চিত সেইসব মানুষদের প্রতি সমাজবিজ্ঞানী, গবেষক ও মানবাধিকার কর্মীরা এবার গভীর মনোযোগ দেবেন আশা করি।

বিশ্বায়নের যুগে সমাজ বিজ্ঞানের অবস্থান ঃ একটি পর্যালোচনা

ড. জ্যোতি সিদানা

অধ্যাপিকা, সমাজবিদ্যা বিভাগ, এস.এস. জৈন সুবোধ ইভনিং কলেজ, জয়পুর, রাজস্থান

ঠাণ্ডা লড়াই পরবর্তী সময়ে বিশ্বায়নের ফলে সকল সমাজেই এক ধরণের আগলহীন ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। এই আগলহীন ব্যবস্থায় অনেক সময় একই সঙ্গে পরস্পরবিরোধী সম্ভাবনা জন্ম দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শেষের কয়েক বছর পৃথিবী একই সঙ্গে যেমন যুক্তির পরিসমাপ্তি ('End of Reasons') প্রত্যক্ষ করেছে তেমনি ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি এক ধরনের অন্ধ আস্থার পুনর্জন্মকেও (Reassertion of faith in religious practices) লক্ষ্য করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন পদ্ধতি এবং জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ তথা সেকুলারবাদের এক সুন্দর সংমিশ্রণ তৈরি হয়েছিল যার পরিণতিতে এমন এক মানসিকতার জন্ম হয়েছিল যা সমাজবিজ্ঞানকে বিভিন্ন জটিল আঙ্গিকে বিশ্লেষণের পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের প্রথম পঁচাত্তর বছর সমাজ বিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় শাখায় (যেমন অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব) এবং প্রান্তবর্তী শাখার (যেমন নৃতত্ত্ব, ম্যানেজমেন্ট, জনপ্রশাসন, সামাজিক মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি অসংখ্য উপশাখার বিস্তার ঘটেছে। এই বিস্তার অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছে যে আদর্শগত ভিত্তি ছাড়া উন্নয়নের কোন উদাহরণই সফল হওয়া সম্ভব নয়। এই উন্নতির দৃষ্টান্তগুলি জাতি রাষ্ট্র তথা সমাজবিজ্ঞানের চরিত্র নির্দ্ধারণ করে। বিশ্বায়নের যুগে উন্নয়নের আদর্শগত ভিত্তি জায়গা দখল করেছে নানা ধরনের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলি। পরিণতিস্বরূপ আজ সমাজবিজ্ঞানের সবকটি শাখাই কমবেশি এই প্রযুক্তিতে উদ্ভাবনগুলির দ্বারা আক্রান্ত। একথা বলা যেতেই পারে যে 'ফর্মাল' এবং 'ইনফর্মাল' উভয় ক্ষেত্রেই সমাজবিজ্ঞানের চিরাচরিত বিচার বিশ্লেষণ পদ্ধতি আজ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং উন্নয়নের ঢেউয়ের সামনে ভেসে যেতে বসেছে। যেমন এই বক্তব্যের স্বপক্ষে টেনে আনা যেতে পারে পরিবার ও রাষ্ট্রের ধারণার কথা। এই দুটি ধারণা সমাজবিজ্ঞানের যে কোন ধরনের বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানের যে নির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে তার বাইরেও এই ধারণাগুলি আজ নানান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উন্নয়নের ফলে অন্যরূপে আমাদের সামনে হাজির হচ্ছে। যেমন টেস্ট টিউব বেবি আবিষ্কারের ফলে 'সিঙ্গল পেরেন্ট' পরিবার আজ বাস্তব। রাষ্ট্রতো আজ কেবল সার্বভৌমত্ব এবং স্বয়ম্ভর অর্থনীতির প্রতিনিধি নয়। যেখানে পেশাদারী শিক্ষা ব্যবস্থায় কর্তৃত্বকারী ব্যবস্থা স্বীকৃতি পেয়ে গেছে সেখান সমাজবিজ্ঞান এখনও আদর্শনির্ভর ব্যবস্থার সমর্থণে যুক্তি সাজাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বায়নের পরে সমাজবিজ্ঞান এক ধরনের আদর্শের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নিবন্ধকারের মতে অধিবিদ্যক তত্ত্বের মতো অধিবিদ্যক সমাজবিজ্ঞান ও আজ বাস্তব সত্য। যেহেতু আজকের সমাজে নানান পেশায় নিযুক্ত লোকজন এবং প্রযুক্তিবিদদের নানান ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছে তাই ক্রমশ সমাজের বেশি বেশি মানুষের কাছে সমাজবিজ্ঞান তার জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। এমনকি এটাও বলা যায় যে প্রযুক্তির কাছে আজ বিজ্ঞানও অসহায় যদিও এই পরিবর্তনের দায়িত্ব খুব কম কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তা প্রাকৃতিক যা সমাজবিজ্ঞান যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন অবশ্যই ক্ষতিকর।

বর্তমানে সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষাদান পদ্ধতি আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানার্জনের নতুন পদ্ধতির সঙ্গে অনেকক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই প্রশ্ন উঠতেই পারে যে আমরা সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের সেই সামাজিক ক্ষেত্রের বিষয়ে পাঠদান দিচ্ছি যার আদতে কোন অর্থ নেই বা যা ইতিমধ্যে অস্তিত্ব হারিয়েছে? এই গবেষিকার মতে সমাজবিজ্ঞান আসলে মানবসমাজের ধারাবাহিকতাকে স্বীকৃতি জানায় এবং সেই ধরনের পরিবর্তনের বিরোধীতা করে যে পরিবর্তনগুলি মানব সমাজের দীর্ঘদিনের প্রয়াসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা চিন্তা, দর্শন ও মূল্যবোধকে আঘাত করে। তাই আজ সমাজ বিজ্ঞানের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক নানা সমস্যা, জটিলতা সম্বন্ধে অবগত হয়ে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে সঙ্গে নিয়ে নিজেকে বিশ্বায়ন পরবর্তী যুগোপযোগী করে তোলা। যদি এটা করা হয় তাহলেই সমাজবিজ্ঞান বর্তমান সময়ে তার গুরুত্ব ফিরে পাবে এবং সেটিই মানবসমাজের পক্ষে কাঙ্খিত। না হলে হয়তো এরপর আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সমাজবিজ্ঞানের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে পাঠদান করতে হবে।

মাইক্রো ক্রেডিট, প্রান্তিক গোষ্ঠীর উন্নয়ন ও রাষ্ট্রের কর্তব্য

ড. সুব্রত কুমার রায়, নবকুমার আদক
সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর

একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কাছে যে নতুন সমস্যা এবং পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা হল বিশ্বায়ন এবং বেসরকারীকরণের যে প্রক্রিয়া চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা বাদবিচার না করে অন্ধের মত প্রয়োগ করে যাওয়া হবে কিনা। এই বিশ্বায়নের যুগেও ভারতীয় অর্থনীতির যে মূল সমস্যা গভীর দারিদ্র ও ব্যাপক বেকারত্ব তার সমাধানের বিশেষ কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এই সমস্যার সমাধানে সরকার যে সকল নীতি গ্রহণ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হল ক্ষুদ্র ঋণ বা মাইক্রো ক্রেডিট দানের মাধ্যমে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী বা গোষ্ঠীর উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। এই নীতির লক্ষ্য হল স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর গঠন এবং তার মাধ্যমে প্রথাগত ও অ-প্রথাগত উৎপাদনকে উৎসাহিত করা এবং ঐ দুর্বলতর প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করা। কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে বাজার দখলের লড়াইয়ে দেশীয় উৎপাদকগণ যেখানে প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সেখানে ক্ষুদ্র ঋণ দানের মাধ্যমে যে উৎপাদন হবে তা বিক্রির জায়গা পাওয়া সত্যি কি সম্ভব? এখানে সরকার বা রাষ্ট্র যদি তাদের সহায়তা না করে তাহলে কি উক্ত প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলিকে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে স্ব-নির্ভর করা যাবে? এছাড়াও, উদ্বৃত্ত বা মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রেও অনেকরকম প্রতিবন্ধকতা আছেই। তাহলে প্রশ্ন হল, যে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ঐ উৎপাদকদের খোলাবাজারে আরো বেশী করে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করছে সেই ব্যবস্থাকে কি প্রান্তিক গোষ্ঠির উন্নয়নে মহৌষধি হিসাবে রাষ্ট্র সুপারিশ করবে? নাকি বিকল্প কিছু ভাববে অন্যদিকে একথাও বলা হচ্ছে যে মাইক্রোক্রেডিট ও স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী গঠনের ব্যবস্থা নাকি সামাজিক ভাবে অবহেলিত শ্রেণী যেমন নারীজাতির ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে ত্বরাণ্বিত করবে। সত্যিই কি তা হচ্ছে বা হবে? নাকি মহিলারা পূর্বাপেক্ষা আরো বেশি করে শোষিত ও বঞ্চিত হবে? যদি তা হয় তাহলে রাষ্ট্রের কর্তব্য কি হওয়া উচিত যাতে করে মহিলারা বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পায়। এই গবেষণাপত্রে এই প্রশ্নগুলি তোলার সাথে সাথে কিছু বিকল্প দিশারও সন্ধান করা হয়েছে।

উন্নয়ন ঃ শিল্পায়ন ও পরিবেশ

সুজন সিনহা
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

উন্নয়নের পথে শিল্পায়ন যেমন স্তম্ভ, তেমনই পরিবেশ হল জীবনের উৎস। পৃথিবীর মূল সম্পদগুলি হল স্থল, জল এবং পরিবেশগত বৈচিত্র্য। দরিদ্রদের প্রাকৃতিক মূলধনও হল তাই। ধনতন্ত্রের শিল্পায়নই হল প্রধান পথ, কিন্তু গণতন্ত্রের মত ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বা উন্নয়নের চরম মাত্রা প্রয়োগ করতে গিয়ে কখনই জীববৈচিত্র্যের বাস্তুতান্ত্রিক কাঠামো ধ্বংস করা হোক— তা উচিত নয়। উন্নতির ও অগ্রগতির পথে শিল্পায়নের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে কিন্তু সবুজ ধ্বংস করে নয়। কারণ সবুজ ধ্বংসের ফলে সমস্ত প্রাণী জগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে, এ কথা অবশ্যই মাথায় রাখা উচিত।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, উন্নয়নের মাপকাঠিতে আমরা কি প্রাসঙ্গিক সব কিছুকে নিয়ে আসতে পেরেছি? তার উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে পেরেছি? পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকে আদৌ উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে ধরা যায় না কি? উন্নত দেশগুলোর কাছে কোনটির গুরুত্ব বেশি হওয়া উচিত— স্বল্প সময় পরিসরে শিল্পের প্রভূত অগ্রগতি, নাকি দীর্ঘ সময় পরিসরে পরিবেশের সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা? উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে আরও বড় প্রশ্ন— দারিদ্র্য দূরীকরণের আগে পরিবেশের স্থিতিশীলতা নিয়ে মাথা ঘামানো কি বিলাসিতার নামান্তর? প্রশ্ন অনেক—

হান তুভালু দ্বীপের সেই সব ছিন্নমূলদের কি হবে, যারা ঘরবাড়ি হারিয়ে আজ নিউজিল্যান্ডে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে? সমুদ্রের জলতলের অস্বাভাবিক স্ফীতি শেষ করে দিয়েছে তাদের ভুখণ্ড। ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আই.পি.সি.সি) রিপোর্টে কিন্তু বাংলাদেশের কথাও আছে, যেখানে নাকি এমনটা হওয়ার কথা আছে।

নাসার গোদার্ভ ইনস্টিটিউট ফর স্পেস সায়েন্স-এর ডিরেক্টর জিম হ্যানসেন বলেছেন 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'-এর কুফল আমরা এখনই পেতে শুরু করেছি। উত্তর-পূর্ব চিনের হেইলংজিয়াং প্রদেশে জলের প্রধান উৎস মুদানইয়াং নদী, গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ফলে গ্রিন হাউস গ্যাস যে হারে বাড়ছে, তাতে, বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, চিনে বৃষ্টিপাতের মাত্রা কমে যাবে, নদীগুলিতে দেখা দেবে প্রবল জলাভাব।

১৯৬২ সালে রাচেল কারসন তাঁর বই 'সাইলেন্ট স্প্রিং'-এ দেখিয়েছিলেন আগ্রাসী শিল্পায়ন কিভাবে পরিবেশের ক্ষতি করছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। রাচেল দেখিয়েছিলেন কিভাবে যথেচ্ছ কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে মানুষের জীবনধারণ ক্ষমতা এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে অসংখ্য নতুন ব্যাধি।

আজ শিল্পায়নের সঙ্গেই বিশ্বায়নের যাত্রাও শুরু হয়ে গেছে নতুন ধাঁচের প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিবেশ ধ্বংসের প্রক্রিয়া। অন্ধ্রপ্রদেশের সরকার বিড়লাদের হাতে জমি দিয়ে উপজাতিদের তথা বনভূমিকে

বঞ্চিত করেছে। সুয়েজ, ভি. ভেনভি, আগুয়াল দ্য বার্সেলোনা, টেমস্ ওয়াটার স্যর, সবশটেল, এনরন, মনসানটো— এই বিশ্বসংস্থাগুলি আজ জলসম্পদকেও করেছে বেসরকারীকরণ। ফলে ভারতবর্ষের মানুষ আজ পশ্চিমের জলসম্পদ শিল্পের মধ্যেই প্রবেশ করেছে নিজের 'অজান্তেই'। ভারতীয় পুঁথিতে বায়ুশোধনকারী ও কীটনাশককারী গাছ নিম বা এ্যাজাদিরাশিকা ইন্ডিকা (ল্যাটিন নাম) আজ চলে গেছে আমেরিকা, জাপান, জার্মানির কোম্পানীগুলির পেটেন্ট হয়ে। বাসমতী চাল চলে গেছে টেক্সাসের বহুজাতিক কোম্পানী রাইসটেক-এর পেটেন্ট-এ। মেকি সবুজ বিপ্লবের নামে পশ্চিমের দেশগুলির শিল্প উৎপাদিত সারের ও কীটনাশকের প্রভাবে বেড়েছে আর্সেনিকঘটিত রোগ, নষ্ট হয়েছে জমির উর্বরতা, বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততা ও শুনতে হচ্ছে আত্মহত্যার ঘটনা (বিদর্ভ)।

তাই আমরা প্রবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে শিল্পায়ন পরিবেশের ওপর স্থায়ী ও দীর্ঘ প্রভাব ফেলছে, এখন শিল্পায়নের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে জীবকূলের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, তখন বড়ই দেরী হয়ে যাবে এই ক্ষত সারাতে।

উন্নয়ন ঃ শিল্পায়ন ও নারী সমাজ

ডম্বরুপাণি ভট্টাচার্য
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

'শিল্পায়ন' শব্দটি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে কতটা উন্নয়নের প্রতীক সে বিষয়ে কিঞ্চিত সন্দেহ থেকে যায়? উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই মোটামুটি ভাবে ব্রিটিশ পুঁজির উপর ভর করে ভারতে শিল্পায়নের সূচনা হয়। এই সময় থেকেই ভারতবর্ষের সস্তা কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমকে কাজে লাগিয়ে উপনিবেশিক সরকার মুনাফার স্তরকে বৃদ্ধি করেছিল। উনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় ভারতে মূলতঃ দু'ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছিল, পাটশিল্প ও বস্ত্রশিল্প। আর ভারতে এই শিল্পায়নের সূচনাপর্ব থেকেই আমরা মহিলা শ্রেণীকে পাই শিল্প শ্রমিকের একটা বৃহৎ অংশ হিসাবে। একথা অনস্বীকার্য যে জনবহুল দরিদ্র দেশে বস্ত্র ও পাটশিল্প গড়ে ওঠার পিছনে নিম্নবর্ণ তথা দরিদ্র নারীদের রক্তজল করা শ্রমের অবদান ছিল বিপুল। কিন্তু এটাও সত্য যে এক্ষেত্রে তারাই ছিল সবচেয়ে অবহেলিত ও শোষিত।

পুঁজিবাদের নতুন ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে 'নব সাম্রাজ্যবাদী' নীতির সুবিস্তৃত প্রভাব আধুনিক শিল্প কর্মের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। আধুনিক কালে একদিকে শিল্পক্ষেত্রে ঘটেছে আধুনিকীকরণ, এসেছে যন্ত্রাংশ; ফলে আমরা লক্ষ্য করি যে, নারী শ্রমিকের সংখ্যা, আধুনিক শিল্পে ক্রমহ্রাসমান। আধুনিক শিল্পকে মূলত যে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় তা হল ঃ (এক) সংগঠিত শিল্প, (দুই) অসংগঠিত শিল্প। বর্তমান ভারতে নারীকর্মীদের আনুমানিক ৯৬ শতাংশ নিযুক্ত আছেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে, সংগঠিত ক্ষেত্রে এর শতকরা পরিমাণ দাঁড়িয়েছে আনুমানিক ৪ শতাংশ। সুতরাং বর্তমান নিয়োগ ব্যবস্থাতে নারীরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। এই পিছিয়ে পড়া কেবলমাত্র সংখ্যাগত দিক থেকেই নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও বটে। তাছাড়া বর্তমানে অসংগঠিত ক্ষেত্রে সেসব মহিলা কর্মচারী কর্মরত তাদের অধিকাংশই চুক্তির মাধ্যমে নিযুক্ত, স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা কম। এই সকল নারী কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা বা অন্যান্য বিশেষ সুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা তেমন নেই বললেই চলে।

বাস্তবক্ষেত্রে চিত্রটা এইরূপ যে, পূর্ববর্তী শতকে শিল্পায়নে শ্রমনিবিড় কর্মের একটা পৃথক ভূমিকা ছিল, যা বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রাংশের দ্বারা সমাধান হয়ে যাওয়ার ফলে নারী শ্রমিকের শিল্পে সংখ্যা হ্রাস পায়। তাছাড়া শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীশ্রেণী বেশি পিছিয়ে থাকায় তারা দক্ষ শ্রমিক হিসাবে পুরুষ কর্মীদের স্থান দখল করতেও পারছে না। এছাড়া রয়েছে যে কর্মক্ষমতার তারতম্য— যা এদের বর্তমান যুগে কিছুটা পিছিয়ে দিয়েছে। আধুনিকতা যেমন শিল্পায়নে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এনেছে সেই সঙ্গে নানান আইনি ব্যবস্থার সুযোগ ও সৃষ্টি হয়েছে, যা তত্ত্বগত ভাবে নারীদের নানান সুযোগ এনে দিলেও বাস্তবিক ক্ষেত্রে ফল দাঁড়িয়েছে উল্টো। শিল্পমালিকেরা এই সকল আইনি ঝামেলা [Factory Act (1948), Indian Mines Act (1952), Maternity Benefit Act (1961) ইত্যাদি আইন] এড়াতে নানান অছিলায় মহিলা কর্মীদের শিল্পগুলিতে নিয়োগ থেকে বিরত থাকছেন। ফলে বাস্তবিক নারী সমাজে তেমন অবস্থাগত পরিবর্তন ঘটেনি। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের আমলেও তারা ছিল অবহেলিত, স্বাধীনতার ৫৬ বছব পরেও তাদের অবস্থাটা দাঁড়িয়ে আছে মোটামুটি একই জায়গায়। তবে একথা সঠিক যে, পূর্বে উপনিবেশিক সরকার মুনাফা অর্জন করে ব্রিটিশ অর্থভাণ্ডারে পূর্ণ করত, যা বর্তমান কালে দেশীয় শিল্পপতিদের মাধ্যমে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধি করছে। কিন্তু আমরা কি জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিকেই শিল্পায়ন ও নারীসমাজের উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করবো? আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে 'উন্নয়ন' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আদতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বোঝাতেই এই শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকলেও, ইদানীং এক ব্যাপকতর অর্থ এর মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে। উন্নয়নের অর্থ সামগ্রিক অগ্রগতি বোঝাতেই এই শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকলেও, ইদানিং এক ব্যাপকতর অর্থ এর মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে। উন্নয়নের অর্থ সামগ্রিক অগ্রগতি অর্থনীতি যার নিয়ন্তা। শুধুমাত্র উর্দ্ধগামী উৎপাদন নয়, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-প্রগতির সুষম বৃদ্ধিকেই উন্নয়ন সূচিত করে যার যথার্থ প্রতিশব্দ হল মানব বিকাশ।

সুতরাং, উন্নয়ন কিভাবে ভারতীয় শিল্পায়ন তথা নারী সমাজকে স্পর্শ করেছে, আদৌ ঠিক কতটা উন্নতির মুখ দেখেছে ভারতীয় শিল্প ও তার সঙ্গে জড়িত সহস্রাধিক মানুষ— সে বিষয়টি তুলে ধরার আমার এটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

শিল্পায়ন ও ভারতীয় নারী সমাজ

শুভা চৌধুরী
ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ

সাধারণ মেয়ের অসাধারণ হওয়ার স্বপ্ন অনেক দিনের। এক সময়ে যা অধরা কল্পনা ছিল, আস্তে আস্তে তাকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলা গেছে। আজকের সমাজে মেয়েদের একটা বড় অংশ দখল করে নিয়েছে সেই স্বপ্নের সিংহাসন। কিন্তু তারপর? আর তো কোনও সমস্যা থাকার কথা নয়। তবু সমস্যা থেকেই গেল, তবে ধরনটা আলাদা।

'শিল্পায়ন ও নারী' এই শিরোনামের অধীনে যে জগৎটা আছে তার পরিধি কিছু কম নয়। এতটা বিস্তারিত করে বলার অবকাশও আমাদের নেই। তাছাড়া শ্রেণীগত বিভাজনেও সেখানে বেশ কয়েকটা ভাগ হয়। আমি তার মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি সেইসব সার্থক কন্যাদের যারা বর্তমান শিল্প মহলে প্রযুক্তির চাবিকাঠি হাতে নিয়ে ফেলেছেন।

বিগত দশক তিনেকের পরিসংখ্যা দেখলে বোঝা যায় সাফল্য লাভের তালিকায় মহিলারাই একটু বেশি অংশ অধিকার করে রেখেছে। স্বাভাবিক ভাবেই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে মেয়েদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আমরা দেখতে পাচ্ছি। সমাজের যে অর্ধাংশ প্রায় পঙ্গু অবস্থায় পড়েছিল কয়েক যুগ ধরে আস্তে আস্তে তা সচল হল, সক্ষম হল এবং বলা উচিৎ সবল হল।

শিল্পায়নের হাত ধরে মেয়েদের সামাজিক, আর্থিক বিকাশ ঘটেছে তুলনাভাবে। সমাজের এই পূর্ণাঙ্গ চেহারাটা আমাদের তৃপ্ত করে। কিন্তু একটা ধন্দও পাশাপাশি থাকে। শিল্পায়ন একদিকে যেমন আমাদের খুব বড় সুযোগ এনে দিয়েছে; তেমনি অন্য দিকে সামাজিক পরিকাঠামোটাও আমাদের অলক্ষে বদলে দিচ্ছে।

সব সমাজেরই একটা কাঠামো থাকে যা দীর্ঘদিন ধরে মানুষেরই আন্তরিক প্রয়াসে মোটামুটি অটুট আছে। সেখনে সকলেরই একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল। আস্তে আস্তে ভূমিকাগুলো একটু একটু বদলালেও তেমন জোরদার ধাক্কা খায়নি। এখন আর শুধু সংসার ও সন্তান পালনের দায় মেয়েরা বহন করে না; পাশাপাশি কর্ম জগতেও তার আত্মপরিচিতি তৈরী হয়েছে। সবক্ষেত্রে না হলেও একাংশ পুরযেরা কিছুটা সাংসারিক কাজের দায়িত্ব বহন করছে।

তবু একটা কিন্তু থেকেই যায়। আজকের সমাজে আমার নির্বাচিত যে বৃত্তটি আছে তাদের হাতে ব্যক্তিগত সময় খুব কম। সেটা অবশ্য পুরুষ নারী উভয়ের ক্ষেত্রেই। যেহেতু আমার বিষয়টা সীমাবদ্ধ তাই তাকে অতিক্রম না করাই শ্রেয়।

আজকের মেয়েরা নতুন প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করছেন অবাধে এবং বিরাট অংশে। চাকরির মর্যদা যে স্তরেরই হোক তাদের সময়টা দিতে হয় অনেক বেশি। বিনিময়ে অবশ্যই পাওয়া যায় ভাল অর্থ এবং কিছু সুযোগসুবিধা। এর ফলে সমাজে একটা এমন সমস্যা তৈরী হচ্ছে যার ফল আমরা অদূর ভবিষ্যতে পাব।

সমাজটা শুধু শিল্প, কৃষি, আর্থিক উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ নয়। যে মানুষ সমাজ গড়ে তুলেছে তার প্রতি কিছু দায়বদ্ধতাও আছে। সমাজের ভিত পরিবার। সেই পরিবারে পুরুযের পাশাপাশি মেয়েদেরও ভূমিকা কম নয় কথাটা কিছুটা সেকেলে শোনাচ্ছে তবু কিছু সেকেলে ভাবনা যে একালে না ভাবলেই নয়। তবে সব বিষয়েরই যেহেতু সদর্থক, দুটি দিকেই থাকে সেহেতু বিষয়টা দেখতে হবে খোলা চোখে। মেয়েদের সময় একটু বেশিই দিতে হয় সংসারকে। কেন? বহুদিনকার প্রোথিত সংসার বলে? মনে হয় না। মেয়েরা বিশেষ কয়েকটা মানসিক সম্পদের অধিকারি এবং সেটা বোধহয় জন্মগত। মেয়েরা যেহেতু সন্তান ধারণ করে, তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুস্থভাবে গড়ে তোলার একটা বড় দায় তার ওপর বর্তায়। বর্তমানে সময়ের অভাব, কর্মজগতের দায় ধীরে ধীরে মানুষকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করছে। সম্পর্কগুলো ইচ্ছে থাকলেও দূরত্ব কমাতে পারে না। মনের মধ্যে অনেক গুপ্ত বাসনা এবং ক্ষোভ নিয়ে মেয়েরা তাদের অভিলায পূর্ণ করছে। এই জায়গায় পৌঁছানোটা আমাদের দরকার ছিল। তবে পাশাপাশি ভাবা দরকার আমরা সমাজকে এমন পঙ্গু করে ফেলছি না তো?

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন ও কর্মরত নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান ঃ সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে

ড. রমা রায়
রিডার ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান (প্রাক্তন), শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ, হুগলী

ভারতীয় অর্থনীতিতে মধ্যবিত্ত বর্ণহিন্দু নারীর অংশগ্রহণ ও স্বাধীনজীবিকার ইতিহাস বেশিদিনের পুরোনো নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটই গত ৫০-৬০ বছরে কিছু উচ্চ ও মধ্যবর্গের নারীকে বিভিন্ন অর্থকরী পেশাতে টেনে এনেছে। দেশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনোত্তর ভারতের সরকারী ব্যবস্থাপনা সে সুযোগ এবং পরিবেশ তৈরী করতে অনেকখানি সহায়তা করেছে। কিন্তু নিম্নবর্গের নারীরা বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্র এবং নানা অর্থকরী পেশায় নিযুক্ত আছেন সেই প্রাচীনকাল থেকে। শিল্পায়নের ফলশ্রুতি হিসাবে নিম্নবর্গের নারীরা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হওয়াতে অসংগঠিত ক্ষেত্রে সমাজের পরিসংখ্যানের বাইরে অলক্ষ্যে জীবনপাত করে চলেছে। কিছু সংখ্যক নারী শিক্ষার অধিকারে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে সক্ষম হয়েছে। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে কতিপয় উচ্চবর্গের নারীরা (কর্মী পরিসংখ্যানানুযায়ী এখনও সংখ্যায় নগন্য) কিছু উচ্চপেশায় নিযুক্ত আছেন। আলোচ্য নিবন্ধের লক্ষ্য বিরামহীন শিল্পায়নের ফলে পরিবর্তিত সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পথে কর্মরত নারী বিশেষ করে মহিলা ডাক্তারের অবস্থান আলোচনা করা।

ভারতীয় গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও নারী

দীপংকর মজুমদার
গণিত বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

ভারতীয় গণতন্ত্র পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের ধারণা প্রাচীন ভারতবর্ষে অজানা না থাকলেও বর্তমান ভারতের আধুনিক গণতন্ত্র ইউরোপ থেকে আগত। আধুনিক ভারতীয় সংবিধান রচয়িতাগণ গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও ধনতন্ত্রকে মিশিয়ে এক খণ্ডিত দেশ-সমষ্টির সংবিধান রচনা করেছিলেন। সেই সংবিধানের সংযোজিত ধর্মনিরপেক্ষতা এক বাহুল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা বাইরে থেকে ধার করা, আমাদের নিজস্ব নয়। আমাদের নিজস্ব এক রাষ্ট্র চেতনা ছিল যা ঔপনিবেশিক দৃষ্টিতে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়। আমাদের দেশজ ধর্মনিরপেক্ষতা ইউরোপীয় ধারণা থেকে অনেকাংশে আলাদা।

এমন নয় তা ধর্মনিরপেক্ষতার শ্রেষ্ঠ মডেল। তবে তা আমাদের নিজস্ব। ভারতীয় গণতন্ত্রে নারীকে তাঁর উপযুক্ত স্থান দেওয়া যায়নি। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আধুনিকতা আমদানী করা হয়েছে তাই তা আধুনিকতাকে পূর্ণ স্বাধীন হতে দেয়নি। তাই ভারতীয় নারী আপাতত সুখী হলেও আসলে সে পরাধীন।

আমাদের বর্তমান আলোচনায় ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থানে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাব দেখা হয়েছে। নারীর সামাজিক অবস্থান আপাত উজ্জ্বল হলেও তা নিম্নগামী। নারীর প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধাবোধ কমে আসছে। শিক্ষিত সমাজে পণপ্রথা এক সর্বকালীন চরম অবস্থায় পৌঁচেছে। মূল্যবোধের এই অবক্ষয় কেবলমাত্র শিক্ষার দ্বারা মোকাবিলা করা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার।

অবৈধ খাদানের প্রভাবে কয়লাক্ষেত্রে শিক্ষার অবনমন ঃ একটি ক্ষেত্র-সমীক্ষা

দীপংকর মজুমদার
গণিত বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

আসানসোল কয়লাঞ্চলের বারাবনী, জামুড়িয়া, সালানপুর ব্লকে অবৈধ কয়লা খাদানের ব্যবসা এই অঞ্চলের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে গভীর প্রভাব ফেলেছে। কয়লার প্রভাবে পরিবেশ, মানসিকতা ও সর্বোপরি শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রধানত দুই ভাবে এই অবৈধ খাদান ব্যবসা চলছে। প্রথমত পরিত্যক্ত খনির উপর নির্ভর করে ও দ্বিতীয়ত খাদান খনন করে। ইসিএল-এর পরিত্যক্ত খনিতে ছেড়ে রাখা স্তম্ভগুলি কাটা হচ্ছে। এই স্তম্ভগুলি উপরের মাটির ছাদ ধরে রাখার জন্য ছাড়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ সংবাদ মাধ্যমে প্রায়ই ধ্বসের খবর দেখা যাচ্ছে। এই অঞ্চলের যেখানে মাটির তলায় পনেরো ফুটের মধ্যে কয়লা পাওয়া যায় সেখানে খাদান খনন করা হয়। এই খাদানের ভিতরে কয়লা কাটা, সেই কয়লা উপরে তোলা, তা পাচারকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া, এ সব কাজে বাজার চলতি পারিশ্রমিক থেকে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন হওয়ার দরুন এ অঞ্চলের মানুষ এই কাজে বেশি আগ্রহী হচ্ছে।

বারাবনী অঞ্চলের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে অবৈধ খনির প্রভাবে স্কুলছুটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সমীক্ষায় আরো দেখা যায় অধিকাংশ অবৈধ খাদানজীবী শিক্ষাকে এই পেশার অন্তরায় বলে মনে করছেন। এই সমীক্ষায় অবৈধ খাদান নিরীক্ষণ করা হয় ও কর্মীদের সাথে কথা বলে খাদান সংস্কৃতির এক অজানা দিক উন্মোচন করা হয়েছে। সমীক্ষা করার সময় কিছু দুর্লভ চিত্র সংগ্রহ করা গেছে। স্কুলছুটের পরিসংখ্যান এক কঠিন বাস্তবের কাছে দাঁড় করাচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে পরিণতি আরও খারাপ দিকে এগোবে। এতে মানুষের হাতে তাৎক্ষণিক পয়সা আসলেও জীবনযাত্রার মানের কোনও উন্নতি নেই। এ পেশার কোনও ভবিষ্যত নেই। স্বাস্থ্য সচেতনতা বা পরিবেশ সচেতনতার বড়ই অভাব দেখা গেছে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সচেতনমূলক কাজ হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। আশা করা যায় শিক্ষার প্রতি, বিশেষ করে স্কুল শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ফিরলে এ অঞ্চলের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারবে। এ পেশা পরিবেশ দূষণের সাথে মানুষের মানসিকতারও অবনমন ঘটাচ্ছে।

রাষ্ট্র ও আইন এবং গণতন্ত্র— ফিরে দেখা

জ্যোতিকা ওয়াঘেলা
ইতিহাস বিভাগ, রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ, বর্ধমান

রাষ্ট্র ও আইন নিয়ে ইদানিং যে চর্চ্চা শুরু হয়েছে এবং নতুন এক ঘাতমাত্রা নিয়ে মঞ্চে হাজির হওয়ার জন্য যেভাবে তোড়জোড় চলছে তা দেখে মনে হতেই পারে সমগ্র বিষয়টাকেই বোধহয় আবার ফিরে দেখার পালা শুরু হয়েছে। এই ফিরে দেখার লোভে অনেকেই নৈতিকতার যুক্তি আমদানি করে আবার বোঝাতে চাইছে যে 'রাষ্ট্র-আইন-গণতন্ত্র' ''নৈতিক বোধের বাস্তব রূপ'' হিসাবে নির্মাণ করা সম্ভব। কেননা 'যুক্তির প্রতিমূর্তিরূপে' বাস্তব 'রাষ্ট্র-আইন-গণতন্ত্র' তার সমস্ত দোষ ত্রুটি মুক্ত হতে পারে যদি সমাজে যুক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। যদিও এই চিন্তাধারা কিছুতেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইরাককে ধ্বংস করার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। তার চেয়েও বড় কথা 'আইন ও গণতন্ত্র' দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধাচারণ করাও সম্ভব হচ্ছে না। এই ঘটনা থেকে 'আইন এবং গণতন্ত্র'কে রাষ্ট্রের সীমানা থেকে মুক্ত করার বাসনা দেখা দিতে শুরু করেছে। এককথায় ইতিহাসে সমাজ বিকাশধারায় বিকশিত রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্র বিহীন 'আইন এবং গণতন্ত্রের' রূপায়নের লক্ষ্যে নতুন চর্চ্চা শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন হল, এই চর্চ্চার মর্মবস্তু কি?

রাষ্ট্ররূপ থেকে বিচ্ছিন্ন 'আইন এবং গণতন্ত্র' নির্মাণ করা সম্ভব কি না— এই প্রশ্ন দেখা দিতেই পারে। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, রাষ্ট্রবিহীন 'আইন এবং গণতন্ত্র' নির্মাণ করার মানদণ্ড কি হবে? যে ''নৈতিক বোধের বাস্তব রূপ'' হিসাবে রাষ্ট্র বিহীন 'আইন এবং গণতন্ত্র' কে কল্পনা করার প্রয়াস দেখা দিয়েছে— তার স্বপক্ষে সওয়াল করার ভিত্তি এটাই হতে পারে যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ইতিহাসে যে কার্যকারণ থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছিল আজকের পৃথিবীতে সেই কার্যকারণের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ রাষ্ট্র দ্বারা পরিচিতির আর কোন প্রয়াজনীয়তা নেই। সেক্ষেত্রেও পুরানো বিতর্ক আবার মাথা চাড়া দেবে। কারণ রাষ্ট্র দ্বারা মানুষের পরিচিতির সাথে মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের যে বিরোধ এযাবৎকাল বহন করে চলা হয়েছে তার সমাধান না করে রাষ্ট্র পরিচিতি ঘোচানো যায় কিনা।

রাষ্ট্র যে চরিত্রের হোক না কেন বাস্তবে 'আইন এবং গণতন্ত্রের' বিপক্ষে সংগঠিত শক্তি হিসাবে কাজ করে— এই অভিযোগ থেকে 'আইন এবং গণতন্ত্র'কে না হয় রাষ্ট্র চরিত্র থেকে মুক্ত করার মত এক কাল্পনিক চিন্তাকে দেওয়া হল, কিন্তু তার দ্বারা 'আইন এবং গণতন্ত্রের' মানদণ্ড নির্ধারণ করা সম্ভভ হবে কিভাবে। আসলে এই নির্ধারক মানদণ্ডটিকে যতই হাল্কাভাবে উপস্থিত করা হোক না কেন রহস্যটা এখানেই। ইতিহাসে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের যে সমস্ত পর্যায়কে মানবজাতি অতিক্রম করে এসেছে সেই পর্যায়ে ফিরে যাওয়া অথবা সেখানে আবদ্ধ হয়ে থাকা বিবর্তনের বিরোধীতা করা— এটা যেমন সত্য আবার এটাও সত্য যে সমাজে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রবিহীন 'আইন এবং গণতন্ত্রের' দাবীকে সামনে আনা হচ্ছে তার স্বপক্ষেও কোনো জোরালো যুক্তির অস্তিত্ব নেই। আগুন থেকে তপ্ত কড়াইয়ে ঝাঁপ দেওয়ার লক্ষ্যে চিন্তা ভাবনা শেষ পর্যন্ত বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না। যদিও 'আইন এবং গণতন্ত্রের' নতুন নির্ধারক মানদণ্ডটিকে যেভাবে হাল্কা চালে পেশ করা হচ্ছে (বলা উচিত আড়াল করার চেষ্টা চলছে), সেখান থেকে আমাদের এই সন্দেহ দেখা দিতেই পারে যে চরম কর্তৃত্ববাদের নতুন করে প্রতিষ্ঠার জন্যই আজ 'আইন এবং গণতন্ত্র'কে রাষ্ট্র বিহীনরূপে পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে। আর এই চরম কর্তৃত্ববাদের স্বরূপকে আড়াল করার জন্য ইতিহাসের অসমাধিত সমস্যাকে বাতিলের পর্যায়ে ঠেলে দিয়ে দাবী করা হচ্ছে ''নৈতিক বোধের'' এমন একটা বাস্তব রূপ আবিষ্কার করতে হবে যেখান কর্তৃত্বকারী কোনো শক্তি আর ক্রিয়াশীল থাকবে না। প্রশ্ন হল, অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ঘুচবে কি করে? অর্থনৈতিক শক্তিগুলি (যাঁরা অর্থনৈতিক জগতের সম্রাট) বিশ্বজুড়ে 'আইন এবং গণতন্ত্রের' যে 'নৈতিক বোধ'' প্রতিষ্ঠার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে এবং দেশে দেশে আইন এবং গণতন্ত্রকে নিজেদের পছন্দমাফিক পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে যেভাবে চাপ দিচ্ছে— তাদের সেই শক্তিকে রোধ করার পন্থা কি? অনেকের কাছে এই অর্থনৈতিক শক্তির কতৃত্ব স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয়। যেমন বাঁচার জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের কাছে মূল প্রশ্ন এটাই যে, রাষ্ট্রের (প্রতিক্রিয়াশীল অথবা প্রগতিশীল) কর্তৃত্বকে অর্থনৈতিক শক্তির কর্তৃত্ব দ্বারা প্রতিস্থাপন করার মধ্যে নতুনত্ব কি আছে? রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের আড়ালে তো অর্থনৈতিক শক্তিগুলির কর্তৃত্বই কার্যকারী হয়ে এসেছে। তাহলে আবার এই নতুন পন্থা কেন?

অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের রাজনৈতিক রূপ এর ঐতিহাসিক পরিচিতিকে বাতিল ঘোষণা করে যুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় শর্ত করে তোলার জন্য ''আইন এবং গণতন্ত্র''কে ব্যবহার করা এবং তাকে 'নৈতিকতার' বেদীতে বসিয়ে অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের মানদণ্ডটিকে যুক্তির মানদণ্ড রূপে পেশ করার মধ্যে আর কিছু হোক বা না হোক ''আইন এবং গণতন্ত্র'' তার বিমূর্ত খোলসটাকে বজায় রাখতে পারে। মানুষ ''আইন এবং গণতন্ত্র'' বলে সমান অধিকারের দাবীদার হিসাবে নিজেকে কল্পনা করতে পারে; বাস্তবে অর্থনৈতিক শক্তির কর্তৃত্বকে স্বীকারও করে নিতে পারে। কারণ যুক্তির রাজ্যে অর্থনৈতিক শক্তির কর্তৃত্বকে স্বীকৃতি জানিয়ে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বলে কিছু নেই। কর্তৃত্ব মানেই রাষ্ট্র শক্তির কর্তৃত্ব। ''আইন এবং গণতন্ত্র'' কর্তৃত্ব সহ্য করে না।

আমাদের বিচার্য বিষয় এটাই হওয়া উচিত যে, অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে ''আইন এবং গণতন্ত্র'' কি পরিমাণে কর্তৃত্বকামী হয়ে উঠতে পারে। কারণ ঃ

যে অর্থনৈতিক সামাজিক সম্পর্কের দ্বারা মানুষ সামাজিকভাবে

সংগঠিত হয়ে আছে ''আইন এবং গণতন্ত্র'' তার উর্দ্ধে নয়; আবার ''আইন এবং গণতন্ত্র'' অর্থনৈতিক সামাজিক সম্পর্কের নির্ধারক শক্তিও হতে পারে না। বিপরীতে অর্থনৈতিক সামাজিক সম্পর্ক ''আইন এবং গণতন্ত্র''কে নির্ধারিত করে থাকে। বর্তমান বিশ্বজুড়ে যে নয়া উদারতাবাদী অর্থনীতি প্রচলিত হয়েছে তার সাথে সংগতি রেখেই ''আইন এবং গণতন্ত্রের'' কাঠামোগত পরিবর্তনের দাবী জোরালো হয়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক সামাজিক সম্পর্কের দাবী হল ''আইন এবং গণতন্ত্র'' এর নির্ধারক শক্তি— এই সত্যকে আজ আর গোপন করা সম্ভব নয়। অতএব ''আইন এবং গণতন্ত্র'' শুধু রাষ্ট্র সম্পর্কিত নয়, মর্মবস্তুর বিচারে অর্থনৈতিক সামাজিক সম্পর্কের স্বার্থেরসাথে ওতোপ্রোতোভাবে সম্পর্কিত। এখানে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে শুধু অর্থনৈতিক কর্তৃত্বের মধ্যে স্থাপিত করা হচ্ছে। যার অর্থ হল, ''আইন এবং গণতন্ত্র'' এর মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিফলনের জায়গায় অর্থনৈতিক স্বার্থের উপাঙ্গ হিসাবে ''আইন এবং গণতন্ত্র''কে নির্মাণ করা।

সামাজিক উন্নয়নে সংস্কৃতিক পর্যটন

সুদেষ্ণা সরকার

লেকচারার বেসরকারী কলেজ

সংস্কৃতি এই শব্দটির বিস্তার সুদূর প্রসারী, যা সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে একটি জাতির গঠনে সাহায্য করে। কোন দেশ বা জাতিকে জানতে হলে জানা প্রয়োজন তার সংস্কৃতিকে, যা তার অস্তিত্বের পরিচায়ক।

অজানাকে জানার আশায় মানুষ ঘরের গণ্ডী ভেঙ্গে পথে নামে পর্যটনের নামে। এই উপলক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে মানুষ আসে অন্য সংস্কৃতিকে জানতে, তাকে উপলব্ধি করতে যা সাংস্কৃতিক পর্যটনের মুল ভিত্তি।

পর্যটন শিল্প এবং এই শিল্প ঘিরে বাণিজ্য পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শিল্পের স্থান পেতে চলেছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে এর বৃদ্ধির হারও উর্দ্ধমুখি।

সাংস্কৃতিক পর্যটনের দুটি ভিন্ন উপাদান আমরা দেখতে পাই; একটি হল— স্থাপত্য শৈলী, ঐতিহাসিক স্থান, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি, ঐতিহাসিক অট্টালিকা বা স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি, এগুলি হার্ড কালচার নামে পরিগণিত হয়। অন্যটি হল— হস্তশিল্প, লোকসংগীত, জীবন শৈলী ইত্যাদি। এটি সফট কালচার নামে পরিচিত।

সাংস্কৃতিক পর্যটন প্রসারের ক্ষেত্র হিসাবে ভারতবর্ষ একটি যথোপযুক্ত দেশ। এর বৈচিত্রতা, বর্ণময় ধর্ম সমন্বয়, ও সর্বোপরি নিজস্ব লোক শিল্প ও হস্তশিল্পের ভাণ্ডার হওয়ায় এটি সাংস্কৃতিক পর্যটনের গন্তব্যস্থল হিসাবে পরিগণিত হতে পারে।

সাংস্কৃতিক পর্যটন প্রসারের জন্য প্রয়োজন উপাদানগুলির যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রচার। এই কাজে সাধারণ স্থানীয় জনগণকে নিয়োজিত করা প্রয়োজন। এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণ এলাকার উন্নয়নে নিজেদের একাত্মতা অনুভব করবে, আর যা ইতিহাস, নিজস্ব ঐতিহ্য ইত্যাদি গুরুত্ব অনুধাবনে যথাসম্ভব সাহায্য করবে, এবং সঠিক মূল্যায়নের ফলে এবং এর অংশ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার এক গর্ববোধের সঞ্চার ঘটবে যা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

সাংস্কৃতিক পর্যটন এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নে সহযোগী হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যা একই সঙ্গে সমগ্র এলাকায় সংস্কৃতির পুনঃজাগরণ ঘটায় এবং লোকসংস্কৃতিকেও নতুনভাবে জাগরিত করতে অনুপ্রাণিত করে। ক্ষেত্র বিশেষে এর প্রভাব শুধুমাত্র আঞ্চলিক না থেকে অন্যান্য এলাকাতেও এর বিস্তার ঘটে। যার ফলে ক্ষুদ্র এলাকা ভিত্তিক সংস্কৃতিক পর্যটন সামগ্রিক ভাবে দেশ ও জাতির উন্নয়নে সাহায্য করে। বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসকে নতুনভাবে জানা, তদুপরি নিজস্ব সংস্কৃতির পুর্নমূল্যায়নে নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি মানুষকে শ্রদ্ধাবান করে তোলে। এর ফলে শিক্ষা ও মননের প্রসার ঘটে এবং আপন সংস্কৃতি প্রসারে অনুপ্রাণিত করে।

সাংস্কৃতিক পর্যটন শুধুমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রে নয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উন্নয়নেও সাহায্য করে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পর্যটনের প্রভাব অনস্বীকার্য।

কোন একটি স্থানে ভ্রমনার্থীর সমাগম শুধুমাত্র সেই স্থানের হোটেল বা পরিবহনে নিযুক্ত ব্যক্তিরই আয়ের সংস্থান করে না, বৃহৎ ব্যবসায়ী থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই আয় ও কর্মের সংস্থান করে। সাংস্কৃতিক পর্যটনের ক্ষেত্রে হস্তশিল্পজাত সামগ্রীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। হস্তশিল্পের উপাদান মূলত স্থানীয় এবং সেই স্থানের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ইত্যাদির পরিচায়ক। হস্তশিল্প মূলত পরিবার কেন্দ্রিক কুটির শিল্পের অর্ন্তগত। একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিকাশে এটি প্রভূত সাহায্য করে।

সাংস্কৃতিক পর্যটনের প্রভাব হিসাবে যেমন কিছু সুফল পরিলক্ষিত হয় তেমনি এর কুফলগুলিও সমাজকে প্রভাবিত করে। স্থানীয় জনসাধারণ যখন ভ্রমণার্থীর পোষাক, পরিচ্ছদ, জীবনশৈলী গ্রহণ করে তখন স্থানীয় ঐতিহ্যের নিজস্বতা হারায়। এছাড়া নিছক বাণিজ্যের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেকোন পরিবেশ ও স্থানে অনুষ্ঠিত হওয়ায় এর স্থায়িত্ব ও আবেদন নষ্ট হয়।

এই বাধাগুলিকে কাটিয়ে সাংস্কৃতিক পর্যটনকে সুচারুরূপে চালনা করলে এটি সামাজিক তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করবে।

রূপনারায়ণপুর অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন জলসমস্যা ঃ সাধারণের একটি দুঃখ

সুপ্রভাত বাগ্‌লী

অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

ভূগর্ভস্থ জল একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদ আমরা প্রধানত পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করি। কোন ব্যক্তিকে এই সম্পদ ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। তবে ভূগর্ভস্থ জলের যথেচ্ছ ব্যবহার হলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নিচে নেমে যায়। আস্তে আস্তে জলস্তর এক সময় নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে। ফলস্বরূপ তীব্র জল সংকট দেখা দিতে পারে। এই সংকট মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম বাধা। তাই এবিষয়ে আমাদের এখনই সচেতন হতে হবে। বিশেষ করে যেখানে এখনই গ্রীষ্মকালে জলের সংকট দেখা দিচ্ছে সেখানকার মানুষকে সচেতন হয়ে এই প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে জলব্যবস্থাপনা বিষয়টি বিভিন্ন আলোচনা সভায় ও গবেষণার মূখ্য বিষয় হিসাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। এই প্রবন্ধে এবিষয়ে একটি আলোচনা করব। আমরা জানি কোন দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা ও দুষ্প্রাপ্যতা থাকলে দ্রব্যটির বাজার গড়ে ওঠে। ভূগর্ভস্থ জলের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সাম্প্রতিক কালে তার দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু এই ধরনের দ্রব্যের চাহিদা যোগান বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, করা হলেও তা হবে তাৎক্ষণিক। সেজন্য এই ধরনের সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধানর জন্য আমাদের বিকল্প ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার রূপনারায়নপুর অঞ্চল বিগত কয়েক বছর গ্রীষ্মকালে ভূগর্ভস্থ জলের সংকটে পড়ছে। এই সংকট এতটাই তীব্র যে গ্রীষ্মকালে অনেক মানুষকে বালতি বালতি জল কিনে সমস্যার সমাধান করতে হয়। অর্থাৎ আংশিক ভাবে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে। কিন্তু এটি কোন স্থায়ী সমাধান নয়। রূপনারায়নপুর অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন জল সমস্যার প্রকৃতি, কারণ ও সমাধানের পথনির্দেশই এই প্রবন্ধের মূল বিষয়।

দ্রব্যের প্রকৃতি হিসাবে মালভূমি অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জল একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি নয় বা সামাজিক সম্পত্তি নয়, এটি একটি সাধারণের সম্পত্তি। কারণ, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কাউকে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারে বাধা দেওয়া যায় না। আবার একজন ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার বাড়ালে অন্য জনের ব্যবহারে অসুবিধা হতে পারে বা কম পড়তে পারে। অর্থাৎ এই সম্পত্তি ব্যবহারে বাতিল করার নীতি কার্যকরী হয় না। কিন্তু ব্যবহারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে। উল্লেখিত দুটি বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য সাধারণের সম্পত্তির সামাজিক কাম্য ব্যবহার হয় না বরং অতিব্যবহার হয়। এই উপপাদ্যের ভিত্তিতেই বিশ্লেষণ করা হবে রূপনারায়নপুর অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ জল, একটি সাধারণের সম্পত্তি, ব্যক্তিগত ব্যবহারের অর্থাৎ কূপ খননের স্বাধীনতা থাকার জন্য কিভাবে অতিব্যবহার হয়েছে ও হচ্ছে। এর ফলস্বরূপ সাম্প্রতিক কালে রূপনারায়ণপুর অঞ্চলে গ্রীষ্মকালীন জলসমস্যা দেখা দিচ্ছে। অতিব্যবহারের ফলে যে জলসমস্যা দেখা দিচ্ছে তার সমাধানে রাষ্ট্র তথা সরকার ও অঞ্চলের মানুষ কিভাবে এগিয়ে আসতে পারে তার সম্ভাবনা ও অসুবিধার আলোচনা করা হবে। সর্বোপরি এই প্রবন্ধে প্রস্তাবিত সমাধানের পথ অবলম্বন করলে তা পরিবেশ ও এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানে কি প্রভাব ফেলবে তার আলোচনা করা হবে।

শিল্পায়ন ও পরিবর্তিত ভারতীয় নারী সমাজ

রেখা নারিওয়াল/ দেবাঞ্জনা চক্রবর্ত্তী

ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ

১৯৯০ সালের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অনেকেই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে ভারতবর্ষ বিশ্বায়নের পথে হাঁটলে সামগ্রিক সমাজের ছবিটি বদলে যাবে। কিন্তু তারা কেউই বোধ হয় পরিবর্তনের মাত্রা বা তার শীঘ্রতা সম্বন্ধে কোন আঁচ করতে পারেন নি।

দূরদর্শনের হাত ধরে ধীরে ধীরে যখন প্রায় সারা বিশ্বটাই আমাদের অন্দরে প্রবেশ করল, আমাদের সমাজের চিরাচরিত ছবিটিও গেল বদলে। সব থেকে প্রভাবিত হল বোধ হয় আমাদের নতুন প্রজন্ম। আবার এই নতুন প্রজন্মের মেয়েদের ঘটল আমূল পরিবর্তন। তাদের সবটাই প্রায় বদলে গেল। বদলে গেল তাদের পোশাক আশাক, খাওয়া দাওয়া, চিন্তা ভাবনা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সবকিছুই।

আজকে ১৯-২৫ বছরের মেয়েরা শুধুমাত্র সুখে ঘর সংসার করতে চায় না। তারা চায় অর্থ, প্রতিপত্তি, সাফল্য। তারা উপার্জন করতে চায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নয় বরং তার মধ্যে দিয়ে সাফল্যের আকাশ ছুঁতে, স্বপ্ন সফল করতে। তারা অর্থ উপার্জন করে সঞ্চয়ের জন্য নয়। বরং নিজের জন্য খবচ করতে। বর্তমান Consumer Society-র একটি বিশাল অংশ তারা। আজ তারা শুধু মাত্র শিক্ষিকা বা ডাক্তার হতে চায় না বরং চায় এমন পেশা গ্রহণ করতে যা তাদের খুব অল্প সময়ের মধ্যে অর্থ এবং পরিচিতি দুই দেবে।

শিল্পায়নের সাথে সাথে ভারতবর্ষের নতুন প্রজন্মের মেয়েদের পরিবর্তন নিতান্ত বৈপ্লবিক। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের গুণাগুণ বিচার করার সময় বোধ হয় আমাদের হয়েছে।

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ভারতের জাতিভেদ প্রথা ঃ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

অধ্যাপক অশোক কুমার মণ্ডল
ইতিহাস বিভাগ, হুগলী মহসিন কলেজ, চুঁচুড়া, হুগলী

ভারতের জাতিভেদ প্রথা অনন্য। বৈদিক যুগ থেকে বহতা নদীর ন্যায় আজও তা সমানে বয়ে চলেছে। পৃথিবীর অন্যত্র এই ধরনের ব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকলেও তা আমাদের দেশের মতো এতটা সুসংগঠিত, জটিল, ব্যাপক, বা ভাগ উপভাগে বিভক্ত ও স্থায়ী নয়। এই প্রথার উৎপত্তির ইতিহাস যেমন বহু মাত্রায় রহস্যজনক, সেরকমই এর প্রবাহও ভয়ানক বিচিত্র। যুগে যুগে তার নকশার পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু মূল ছক একইরকম থেকে গেছে। স্যার হেনরী মেইন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এনসেন্ট ল'-তে জাতিভেদকে মনুষ্যসৃষ্ট সবচেয়ে বিপর্যয়কর এবং জঘন্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ একে 'চতুর্বর্ণ' অভিধায় ভূষিত করেছেন। দ্বিজসত্তম ভরদ্বাজকে চতুর্বর্ণের প্রকৃতি প্রসঙ্গে মহর্ষি ভৃগু বলেছিলেন—

"ব্রহ্মাণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়ানাং তু লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শুদ্রানামকিতস্তথাঃ।।"

পরে তাঁর মন্তব্যঃ "ব্রহ্মা প্রথমে সমস্ত জগৎ ব্রাহ্মণময় করেছিলেন, পরে কর্ম অনুসারে সকলে নানা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।" গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিঃ "চাতুর্বর্ন্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মা বিভাগশ।"

বর্তমান ভারতে তিন সহস্রাধিক জাতের অস্তিত্ব দেখা যায়। তবে হাজার হাজার বছরের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত এবং পরিবর্তিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের প্রবাহ ধারায় এই জাতব্যবস্থা মূলতঃ উঁচু জাত ও তফসিলীজাত— এই দুটি বিভাগে এসে পৌছেছে। ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এই তফশিলীভূক্তজাত ও অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণী সমাজের প্রাধান্য বিস্তারকারী মুলস্রোত থেকে সব যুগেই বিচ্ছিন্ন থেকে গেছে। এরা যুগে যুগে নানারকম দৈহিক মানসিক, সামাজিক, আর্থিক নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে। শিক্ষালাভ ও সম্পদ সঞ্চয়ের অধিকার তাদের দেওয়া হয়নি; কারণ অকারণে নিগৃহীত হয়েছে। সমস্ত রকম অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাই অনগ্রসর, অনুন্নত, অন্তেবাসী।

ইংরেজ রাজত্বকাল থেকেই এই অবদমিত জাতির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কিছু আইন প্রণীত হয়। স্বাধীনোত্তর ভারতে ১৯৫০ সালের সংবিধনে তাদের স্বার্থ দুভাবে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। প্রথমতঃ অন্যান্য জাতের সঙ্গে এদের সমানাধিকারের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ চাকরী, শিক্ষা, আইনসভা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের নীতির দ্বারা বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের বন্দোবস্ত করা হয়।

বর্তমানে সংরক্ষণ নীতি একটি চরম বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সারা ভারত জুড়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। সংরক্ষণ বিরোধীরা সংরক্ষণের বিলোপসাধনের পক্ষে জোরালো সওয়াল করছেন। তাদের মতে, সংরক্ষণ নীতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর সময়সীমা অনন্তকাল হতে পারে না। সংরক্ষণকে সঠিক প্রেক্ষিতে বিচার করে দেখার সময় এসেছে। বিরোধীদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল, সংরক্ষণ উৎকর্ষ সাধনায় পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছে, আর তাই তা রাষ্ট্রের উন্নয়নের পক্ষে প্রবল বাধা হয়ে উঠেছে।

সংরক্ষণপন্থীদের স্পষ্ট অভিমত হল— সংরক্ষণ তার মূল্য ও উপযোগিতা হারায়নি, সফলতা লাভে ব্যর্থ হয়নি। হিন্দু সমাজের 'চতুর্বণ— প্রথা'য় যারা যুগ যুগ ধরে অত্যাচারিত, শোষিত, বঞ্চিত তাদের কাছে সংরক্ষণ আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান সোপান; রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ক্ষমতায় উত্তরণের প্রাথমিক প্রস্তুতি পর্বও বটে। আর তাই এভাবে সংরক্ষণ রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নের পথকে ক্রমশঃ মসৃণ ও প্রশস্ত করে তুলছে।

বিশ্বায়ন ও আমলাতন্ত্রের পেশাদারিত্ব

বিপ্লব চৌধুরী
প্রভাষক, বাণিজ্য বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন

বর্তমানে আমরা বাজার ব্যবস্থা ও বিশ্বায়ন দ্বারা যুগপৎ সম্পৃক্ত ও আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে ক্রমশ রাষ্ট্র ও বাজার একে অপরের পরিপুরক হয়ে উঠছে। এ কথা পরিষ্কার যে বাজার অর্থনীতির সঙ্গে যথাযথ তাল মিলিয়ে চলতে গেলে রাষ্ট্রকেও তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামোন্নয়ন, কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প তথা সার্বিক পরিকাঠামো, সবই রাষ্ট্রের দায়িত্বে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং তা হতে হবে সাপেক্ষ মতবাদ অনুসারী। বিশ্বায়নের আবহে আরও দুটি বিষয় সমান্তরাল ভাবে আমাদের সামনে এসে পড়েছে, তা হল প্রতিযোগিতা ও পেশাদারিত্ব। স্বাধীনতার পর থেকে বেশ কিছু সময় আমরা প্রতিযোগীতাহীন আবহে লালিত হতে হতে কথা দুটির গুরুত্ব ও ভাবার্থ প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। যে সব ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব পালন প্রয়োজন সেখানেও এসে পড়েছে বিশ্বমানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং তার উত্তরণ সম্ভব একমাত্র পেশাদারিত্বে। অর্থাৎ সরকারী ব্যবস্থাপনা যার অপর নাম আমলাতন্ত্র বা জন প্রশাসনকে হয়ে উঠতে হবে প্রতিযোগিতামুখী ও পেশাদারী, তবে এই ধারণা আমলাতন্ত্রের

ক্ল্যাসিকাল মতের সঙ্গে মেলে না। সমস্যার শুরু এখানেই।

ভারত সরকার নিজেও এই বিষয়গুলির প্রতি নজর দিয়েছেন, তার প্রমান পাওয়া গিয়েছে সম্প্রতি প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের একটি প্রস্তাবে। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদের কাজ-কর্মে আরো গতি আনার ও কাজের মান ক্রমোন্নত করার লক্ষে বিভিন্ন পেশাদারি সংস্থা থেকে ও বেসরকারি সংস্থার উচ্চ পদস্থ কর্মী আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই প্রস্তাব মান্যতা পেলে বর্তমান আমলাতন্ত্রের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে রাষ্ট্রযন্ত্রের সামগ্রিক কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ বিবাহ ঃ কৌলিন্য ও পণপ্রথা

ড. সাগর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন, বর্ধমান

বিংশ শতাব্দী অতিক্রম করে আজ এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে 'বিবাহ-কৌলিন্য-পণ' এসব ব্যাপারে আমরা কি সত্যি এগিয়েছি? এই প্রশ্ন নতুন করে তুলে ধরে সত্যিকারের পথ খোঁজা যে কত জরুরী সে কথাটার প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করার তাগিদেই বর্তমান ঐ তিনটি শব্দকে নিয়ে আজকে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করাই বড়ো কাজ বলে মনে হয়।

'পণ দেবো না— পণ নেবো না' শুধু রাষ্ট্র প্রবর্তিত আইন বলে কোনো ব্যক্তি শ্লোগান তুললেও তা যে আজকের সমাজেও কতটা হাস্যকর বা অসঙ্গতিপূর্ণ কথা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আজকের কুলীন— ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার আর নয়— শোনা যাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির কর্মকর্তারা নাকি সবচেয়ে বড় কুলীন— সুপাত্র তাই তার পণের অঙ্ক কতটা কি এসব কথাও তো অলোচনায় থাকবে।

'আইন আছে আদালত আছে'— তা কি আজো অনেকটা তামাসা— 'বড়লোকেরা পয়সা খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে'। সাহিত্য সম্রাটের কবেকার কথা আজো কি আমাদের বিয়ে— কৌলিন্য-পণ— এসব বিষয়ে ব্যথিত, বিচলিত, আন্দোলিত করবে? আমরা দাঁড়াবো কোথায়?

সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

কোশিক কুমার হাজরা ও লুনা ব্যানার্জী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মাইকেল মধুসূদন মেমোরিয়াল কলেজ, দুর্গাপুর

সংরক্ষণ কি?

আভিধানিক অর্থে সংরক্ষণ বলতে বোঝায় পরিত্রাণ বা রক্ষণ। অর্থাৎ সংরক্ষণ হল কোনো কিছু, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা, যেখানে কেবলমাত্র সেই বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীই অধিকার জ্ঞাপন করতে পারে। সংরক্ষণ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন— সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। উদাহরণ হিসাবে আদিবাসীদের জন্য বাসস্থান সংরক্ষণ, মহিলা ও তপশিলি জাতি উপজাতিদের জন্য শিক্ষা, চাকুরী ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংরক্ষণের উল্লেখ করা যায়।

উন্নয়ন কি?

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নয়ন ধারণাটির আঙ্গিকে ও মাত্রাতে পরিবর্তন এসেছে। উন্নয়ন অর্থে দেশে সমস্ত উৎপাদন ক্ষেত্রে যা কিছু নতুন করে তৈরী হচ্ছে তার আঙ্কিক পরিমাপের সীমিত ধারণাটির সঙ্গে পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে বণ্টনের প্রশ্নটি এবং আরও পরে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার প্রকৃত মানোন্নয়ণের ধারনাটি সাম্প্রতিককালে এই ধারণা আরোও ব্যাপ্ত লাভ করেছে। উন্নয়ণ বা বিকাশকে সমার্থক ভাবা হচ্ছে, স্বাধীনতা (সক্ষমতা) অর্জন ও রক্ষার প্রক্রিয়া হিসাবে যা অর্জিত হতে পারে মানুষের জন্য নির্ধারিত সামাজিক সুবিধা যেমন, শিক্ষা স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে। এর কিছুটা অংশের দায়িত্ব নেন জনকল্যাণকর সরকার আর বেশীরভাগটাই নির্ভর করে ব্যক্তিগত জীবিকার জায়গা থেকে লব্ধ সামর্থ্যের উপর। সর্ব্বোপরি প্রয়োজন হয় একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরী করা, যেখানে মানুষের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রয়োজনের প্রকৃত সুযোগ থাকবে।

সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রকৃতি এবং সম্পর্ক

সংরক্ষণ দেওয়া হয় দুর্বলতর অংশকে, যাতে তার দুর্বল দিকগুলিকে অতিক্রম করে সমাজের অন্যান্য সকলের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে পারে। সুতরাং সংরক্ষণের একটি ইতিবাচক দিক আছে যার সাথে উন্নয়নের ধারণাটি সম্পর্কিত। সংরক্ষণের একটি নেতিবাচক দিকও আছে এবং সেটি উন্নয়নের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কোন অযোগ্য প্রার্থী কেবলমাত্র সংরক্ষণের কারণে এমন পদের সাথে যুক্ত হচ্ছে যার ফলে সেই প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজে কোনরূপ উন্নতি ঘটাতে পারছে না। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সংরক্ষিত পদে উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে সেই বিশেষ কাজে ব্যাঘাত ঘটছে যা কোনভাবেই উন্নয়নের সহায়ক হতে পারে না।

সাম্প্রতিক প্রবণতা

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে জাতীয় সংবিধান নির্দিষ্ট কিছু বছরের জন্য বিশেষ কয়েকটি জাত, আদিবাসী এবং পরবর্তীকালে মহিলাদের

জন্য সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু সাম্প্রতিক প্রবণতায় দেখা যাচ্ছে যে অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতোই সংরক্ষণ ব্যবস্থারও রাজনীতিকরণ ঘটানো হচ্ছে। বর্তমানে ভোটের রাজনীতির কারণে ভোট ব্যাঙ্ক বৃদ্ধিব উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছে, সাথে যারা সংরক্ষণের আওতায় নির্দিষ্ট কিছু বছরের জন্য ছিল তাদেরও সংরক্ষণের সময় বারংবার বৃদ্ধি করা হচ্ছে কেবলমাত্র ভোটের দিকে লক্ষ্য রেখেই।

উপসংহার

সংরক্ষণের সাথে উন্নয়নের সম্পর্ক ওতোপ্রতভাবে জড়িত কিন্তু উন্নয়নের প্রয়োজনে যে সংরক্ষণ সেই সংরক্ষণের মাপকাঠি কি হবে সে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ এক্ষেত্রে জাত, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নাকি অর্থনৈতিক অবস্থা কোনটি মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হবে সেটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সংরক্ষণের ব্যাপারে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে জাতগত, বর্ণগত বা লিঙ্গগত বিভাজনের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা রূপায়িত হচ্ছে এবং সেখানে অবশ্যই অর্থনৈতিক অবস্থাকে গুরুত্ব দিয়েই তা করা হয় কিন্তু এ প্রসঙ্গে এই বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে কোনো একটি নির্দিষ্ট জাত, বর্ণ বা লিঙ্গের সকল মানুষই অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর হবে সেটি ভেবে নেবার কোনো কারণ নেই। সুতরাং এই বিষয়টিকে মাথায় না রেখে কেবলমাত্র ভোটের সমীকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে নির্দিষ্ট জাত, বর্ণ, সম্প্রদায় বা লিঙ্গের ভিত্তিতে রূপায়িত করলে সাম্প্রদায়িক তথা জাতভিত্তিক, রাজনীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে যেটি কখনোই সংরক্ষণের উন্নয়নমূলক দিক হতে পারে না।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ও স্বল্পবিত্ত ঃ উন্নয়নের নয়া দিশা

তিয়াস বিশ্বাস

গবেষক, ন্যাশনাল ইনস্টিটুট অব টেকনোলজি, দুর্গাপুর ও শিক্ষক, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন

৯০-এর দশক থেকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস নীতি (Structural Adjustment Programme বা SAP) গ্রহণ করে। এই SAP-কে ভিত্তি করেই ১৯৯১ সালে ভারত সরকার 'নয়া অর্থনৈতিক নীতি' গ্রহণ করে এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হয়। ঐ SAP-এর মাধ্যমে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও ভুবনীকরণ প্রক্রিয়া শক্তিশালী হচ্ছে এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা দুর্বলতর হচ্ছে। ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প কর্মসূচী গতিবেগ লাভ করে ৯০ এর দশকে। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়াশিংটনে ক্ষুদ্র ঋণ (মাইক্রো ক্রেডিট) সম্মেলনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প গুরুত্ব পায় এবং মনে করা হয় যে ক্ষুদ্র ঋণ বাজার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে।

উন্নয়ন মানে একজন নিম্নতর সোপানের মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করা। ভারতবর্ষে লক্ষাধিক মানুষ আজও দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে এবং এক্ষেত্রে অনাহার ও অর্ধাশনকে দূর করাই উন্নয়ন। উন্নয়নের উদ্দেশ্যে হল দীর্ঘ সুস্থ ও সৃষ্টিশীল জীবনযাপনের পরিবেশ নির্মাণ। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বনির্ভর দল তৈরির আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভারত সরকার স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীকে ব্যাঙ্ক সহায়তার মাধ্যমে গঠিত ও উন্নত করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই দল গঠিত হয় দুটি প্রণালীতে। এক হল জাতীয় কৃষি ব্যাঙ্ক গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থা ((NABARD) স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলির যথার্থতা বিচার করে দলগত ঋণদান করে গ্রামীন ক্ষেত্রে। অন্যটি হল স্বর্ণজয়ন্তী গ্রামীন স্বরোজগার যোজনা (SGSY) নামক প্রকল্প বিপুল সংখ্যক গোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে গ্রামের গরিব মানুষকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর গঠন ও উন্নয়ন একটি সময় সাপেক্ষ পদ্ধতি। দলগঠনের কার্যক্রম চারটি পর্যায়ে এগিয়ে চলে। কোন্ পর্যায়ে কতটা সময় লাগবে তা নির্ভর করে সদস্যদের নিষ্ঠা, সহযোগিতা, ঐক্যমত, মত ও আদর্শের মিলনের ওপর। একদিকে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ঋণ গ্রহণ তথা ঋণ পরিশোধের কাজ চলতে থাকবে, অন্যদিকে সঞ্চয়ের কাজও অব্যাহত থাকবে। তাতে পুঁজির পরিমাণ বেড়ে চলবে যা থেকে ফের ঋণ নেওয়া যাবে। প্রথমে ছোট অঙ্কের ঋণ নিয়ে ছোট সমস্যার প্রতিকার বা ছোট অর্থকারী উদ্যোগ। তারপর মাঝারি থেকে বড় অঙ্কের ঋণ নিয়ে মাঝারি বা বড় উদ্যোগ। এইভাবে সঞ্চয় করা ঋণ নেওয়া, আয় বাড়ানো, ঋণ পরিশোধ, আবার ঋণ, আরও আয় এই পদ্ধতিতে কাজ করতে করতে গ্রুপের সদস্যেরা স্বনির্ভর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে।

স্বল্প সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র নিপীড়িত মানুষজনের আর্থিক উন্নতি বর্তমানে একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রধানত গ্রুপ-ক্লাস্টার-ফেডারেশন মডেল এবং ব্যাঙ্ক লিংকেজ মডেলের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলির স্বল্প বিত্ত কার্যক্রম চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলির দারিদ্র্য দূর করার জন্য দুই বা তিন বছরের মধ্যে গ্রুপ সদস্যদের কমপক্ষে মাসে ২ হাজার টাকা আয় করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। ২০০৪-০৫ সালের 'কমিটি অন এমপাওয়ারমেন্ট অব উইমেন' এর রিপোর্টে দেখা যায় ব্যাঙ্ক-লিংকেজ স্কিমগুলিতে ১৭৬৬ টাকা প্রতি পরিবার এবং ২৮৫৫৯ টাকা প্রতি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ঋণ পাচ্ছে বা এখনও লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক দূরে রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় চার লক্ষ স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে। আগামী ২০১০ সাল নাগাদ ১০ লক্ষ গোষ্ঠী গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি' নামে একটি নতুন দপ্তর গঠন করেছে। বর্তমানে একক বা দলবদ্ধ (সর্বোচ্চ ৫ জন) সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রকল্প করার জন্য যে কোন উদ্যোগী এই প্রকল্পের জন্য বিবেচিত হয়। ৯০-এর দশক থেকেই ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প জনপ্রিয় হয়েছে আমাদের দেশে। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে গরিবদের আর্থিক উন্নয়ন এখন সারা বিশ্বের কাছে আদর্শ। একথা ঠিক যে, গ্রামাঞ্চলে যেভাবে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর প্রসার হয়েছে শহরাঞ্চলে তা হয়নি। তবে গ্রামে বা শহরে যেখানেই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে উঠুক না কেন তাকে স্থায়িত্ব দেওয়াই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পে প্রান্তবাসিনীরা ঃ বহির্বাটির কর্মরতা

ড. নবনীতা বসুহক
আসানসোল গার্লস কলেজ

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন এই বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তাদের স্বীকার করতেই হবে; নইলে তাদের লজ্জা, তাদের অকৃতার্থতা। নারী কালান্তর রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকাল থেকে মাত্র এক দশক দূরে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তবু এই সময়ে ঘটে গেছে উল্লেখযোগ্য ঘটনা— বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ। বিশ্বযুদ্ধের কারণে ঘটে গেছে অর্থনৈতিক সঙ্কট। আর দেশভাগের জন্য পূর্ববাংলার মেয়েরা এসে পড়েছে এদেশে। পরিবার সামলাতে অবলম্বন করেছে তিনটি পথ— একটা, ম্যাসাজ ক্লিনিকে কাজ যাকে বলা যায় ভদ্রভাবে বেশ্যাবৃত্তি। দ্বিতীয়, বিপুল একটা অংশ গেছে সোনাগাছিতে আর একটা অংশ যারা অল্পশিক্ষিত তারা বেছে নিয়েছে অফিসের কাজ। জহরলাল নেহেরু (তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন বাংলাদেশ থেকে যাঁরা এসেছেন তাদের বাসস্থানের সঙ্গে কাজের সুযোগও দিতে হবে। খুব বেশি বেতন নয়, স্বল্পমূল্য হলেই হবে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের মেয়েরা দেহ বা শরীর বিক্রি করলেন না— এরা বেছে নিলেন আত্মসম্ভ্রমপূর্ণ তৃতীয় পথটিই। বিভিন্ন ভাবে নানারকম পেশায় বেছে নিলেন বহির্বাটীর কাজ। অর্থনৈতিক বিন্যাসের দিকে তাকালে দেখব এরা মূলত নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে মূল যে বৃত্তিগুলি পাই—

১. পরিচারিকা বা কাজের লোক ঃ অবতারণিকা, দ্বিচারিনী, ঘাম, মানসী অভিসার, আয়া, হেডমিস্ট্রেস, সোহাগিনী, ধূপকাঠি, বিলম্বিত লয়, অভিসার, চা, ছাত্রী অপরাহ্ণ, বন্দিনী।

২. শিক্ষিকা ঃ চাকরী, হেডমিস্ট্রেস, কুশাঙ্কুর।

৩. করণিক বা অফিস-কর্মী ঃ অবতারণিকা, বোধন, চেক, ছোটদিদিমনি, মলাটের রঙ, ভগ্নাংশ।

৪. নন্দিনীদের বহির্বাটি এবার নন্দনচর্চা ঃ
শিল্পী— অঙ্গীকার
গায়িকা— অনধিকারিণী।

তবু এরা প্রান্তিক গোষ্ঠীর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।

পারিবারিক ক্ষেত্র ঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা অবিবাহিত।

(১) অবিবাহিতারা পরিবারের জন্য রোজগার করছে। এদের পরিবারের সদস্য— যেমন (মা, বাবা) এদের বাইরে বেরোনকে ভাল চোখে দেখছে না। অথচ পছন্দ তাদের অর্থটুকুকে। বাড়িতে এরা কৌণিক ভিন্ন বিন্দুর মত অবস্থান করেছে।

(২) আবার যিনি অভিভাবক তিনি এদের বাড়ির অন্য ছোট ভাইবোনদের কাছে হাজির করছেন ভিন্ন জীব হিসেবে।

(৩) যারা কাজের লোক বা আয়া জাতীয় কাজ করছে, পরিবারের কাছে তারা আলাদা ভিন্ন নিম্নস্তরের জীব হিসেবে পরিগণিত।

(৪) ব্যক্তিগত জীবনে কাউকে ভালবাসলেও তাকে স্বীকার করতে ভয় পায়, পারিবারিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কারণে।

অফিস বা কর্মক্ষেত্রে ঃ

- সহকর্মীরা এদের রূপকে গুরুত্ব দেয়, কাজকে নয়।
- বড় সাহেবের ঘোরার সঙ্গিনী হয় অনেক ক্ষেত্রে এরা।
- অফিস এদের পণ্য হিসেবে দেখে, এরাও মানসিকতায় পণ্য হয়ে যায় অনেক সময়।

রাষ্ট্র ঃ

- রাষ্ট্র এদের অর্থনৈতিক সুযোগদান করেছে কিন্তু যতটা স্বাচ্ছন্দ্য আসা প্রয়োজন তা দিতে পারেনি।
- যারা বাড়ির কাজ করে তাদের সম্মানজনক জায়গায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি আজও। আর তাই এরা প্রান্তিক গোষ্ঠী আজও।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের নারীরা আজও প্রাসঙ্গিক। ২০০৬ সালে এসে বহির্বাটীর কর্মরতা সম্পর্কে পরিবার, অফিস বা রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে অনেকটাই।

তবুও শেষ বিচারে আজও নারীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আশা করা হয় তারা তাদের রোজগারের টাকা তুলে দেবে পিতা বা স্বামীকে।

এই প্রান্তিক অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য, কর্মকর্তাদের নিজেদের, পরিবারের, কর্মক্ষেত্রের এবং রাষ্ট্রের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির আজও প্রয়োজন।

পর্যটন ও উন্নয়ন ঃ প্রসঙ্গ আসানসোল

মৌসুমী ঘোষ
অর্থনীতি বিভাগ, বি. বি. কলেজ, আসানসোল

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে সারা বিশ্বে উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হল। ড্যানিয়েল বেলের অনুসরণে আমরা তাকে ‘পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এজ’ বা শিল্পোত্তর যুগ বলে চিহ্নিত করছি।

উন্নত দেশগুলিতে ১৯৭০ সাল থেকেই বড় বড় কারখানাগুলো হঠাৎই যেন গুরুত্বহীন হতে লাগল। একই সঙ্গে চমকপ্রদ ভাবে বাড়ল তথ্যপ্রযুক্তি ও অন্যান্য সেবাক্ষেত্রের ভূমিকা।

উন্নতিশীল দেশগুলিতেও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে বাজার ব্যবস্থা ভীষণভাবে পাল্টে গেছে। বিশ্বের বহু শিল্পনির্ভর শহরগুলিতে এই ভাঙাগড়া প্রতিনিয়ত অনুভব করা যাচ্ছে। এর কারণ হিসাবে বলা যেতেই পারে যে আজ খোলা বিশ্বে স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা, ন্যানো টেকনোলজির যুগে দৈত্যাকৃতি বড় বড় কারখানার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

এই দোলায়মান অস্তিত্বের পটভূমিতে সবচেয়ে বেশি কেনাবেচা হচ্ছে আমোদ ও খুশির হইহল্লা। অবসর এখন খুবই চাহিদার বস্তু। আতিথেয়তা এখন মূল্যবান সম্পদ। অতিথি সৎকার এখন টাকার মূল্যে বিক্রী হয়। পর্যটন শিল্পর ভবিষ্যত একবিংশ শতাব্দীতে তাই অত্যন্ত সম্ভাবনাময়।

অতীতের শিল্প নির্ভর শহরের অনেকগুলিই আজ আকর্ষণ হারাচ্ছে মুক্ত অর্থনীতির প্রচণ্ড অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এবং একই সাথে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে না পেরে। একথা কিন্তু অনস্বীকার্য যে প্রত্যেক শহরেরই নিজস্ব কিছু সম্পদ থাকে, যা হয়তো পুরানো ঐতিহ্যবাহী কারখানা ছাড়াও অন্য কিছু। বিশ্ব জুড়ে অগ্রণী তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত ক্ষেত্রগুলি তাই উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন আশা জাগিয়েছে।

পর্যটনের আকর্ষণ হিসাবে শহরকে গড়ে তোলার জন্য এক নূতন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে বিশেষ কোন জায়গাকে বিক্রী করা প্লেস মার্কেটিং। এর মানে কিন্তু মালিকানার অধিকার পরিবর্তন নয়, পর্যটন বৃদ্ধি করা। পর্যটন শিল্পের উদ্দেশ্যই হল মানুষকে সাময়িক ভাবে একটি বিচিত্রসুন্দর পরিবেশের সন্ধান দেওয়া। মানুষ সেখানে অভ্যস্ত আরামে বিলাসে থেকে অপরিচিত পরিবেশে আনন্দ পায়। তাই কোন শহরকে পর্যটনের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুললে প্রথমেই উন্নতি হবে হোটেল, যানবাহন ব্যবস্থার এবং অন্যান্য ব্যবসাকেন্দ্রগুলি। একইসঙ্গে উপকৃত হবে স্থানীয় মানুষ, বাড়বে চাকরীর সুযোগ। যে জায়গায় যেটা বৈশিষ্ট্য তাকেই আমরা এ শিল্পের মূলধন ভাবতে পারি। লাস ভেগাসে যেমন প্রতিদিন সারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার মানুষ আসে ক্যাসিনোতে হাজার রকম জুয়ো খেলতে।

যে কোন জায়গারই কয়েকটি দর্শনীয় কেন্দ্র থাকতে পারে— হতে পারে তার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য, থাকতে পারে তার অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্য। ব্যবসার স্বার্থে পর্যটন বা শিক্ষামূলক পর্যটনও এর মধ্যে পড়ে। সে কোন জায়গার পর্যটন শিল্প গড়ে উঠলে পরবর্তীকালে বিশেষভাবে সেখানে গড়ে ওঠে বাজার যার দ্রব্যসামগ্রীতে পাওয়া যায় আঞ্চলিক বিশেষত্বর ছোঁয়া। এই শিল্পের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন জায়গাটার একটি আকর্ষণীয় ছবি জনমানসে তৈরী করা বা রূপায়ন করার। বিশ্বের বহু অতীতের শিল্পনির্ভর শহর নিজেকে এভাবেই নতুনভাবে আকর্ষণীয় করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। নাম করা যেতে পারে গ্লাসগো, লিভারপুলের।

পশ্চিমবঙ্গের ষাট দশকের অন্যতম শিল্পশহর আসানসোলের উন্নয়নপন্থা এবং পর্যটন নিয়েও এভাবে ভাবা যেতে পারে। বার্নপুরের ইস্পাত শিল্পর আধুনিকীকরণ যদিও শহরবাসীকে নতুন আশা জাগিয়েছে কিন্তু ক্রমাগত বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়লাখনি, পিলকিন্টন কাঁচ কারখানা বা সেনর‍্যালের বন্ধ দরজা যেন আমাদের জোর করে ভাবাচ্ছে নতুন কোন অগ্রগতির পথ। এ শহরে তো আরো অনেক কিছুই আছে। বর্ধমানের অন্য অঞ্চল থেকে একেবারেই আলাদা প্রাকৃতিক দৃশ্য, নিকটবর্তী বরাকরের প্রাচীন ঐতিহাসিক মন্দির, বা মাইথনের কল্যাণেশ্বরী মন্দির, জলধোর বহু পুরানো লোকদেবী ঘাঘরবুড়ীর মন্দির ও সংলগ্ন ছোট্ট জলপ্রপাত, গৌরাণ্ডীর নিরালা উষ্ণপ্রস্রবন, পরিত্যক্ত কয়লাখনি অথবা এককালের প্রাচীন দৈত্যাকৃতি কারখানা যা আজ ইতিহাস প্রতিটিই আলাদাভাবে দর্শনীয়। এছাড়া তো ব্যবসাভিত্তিক নিয়মিত পর্যটন আছেই।

আনন্দ যেহেতু পণ্য তাই আশা রাখা যেতেই পারে যে পর্যটন শিল্প সারা দেশকে নতুনভাবে সাজাতে পারবে।

জাতীয় সীমান্ত ও সীমান্তবাসী মানুষ ঃ একটি সমীক্ষা

ত্রিদিব সন্তপা কুণ্ডু

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বি.বি. কলেজ, আসানসোল

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা ও দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্ত নতুন করে অঙ্কিত হয়। বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর ভারত, পাকিস্তান ও কিছুকাল পরে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে বহুবিধ জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। কৃত্রিম সীমান্তরেখা সীমান্তবাসী মানুষের বহুদিনের অভ্যস্ত জীবনচর্চাকে এলোমেলো করে দেয় এক লহমায়। জাতিরাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের আয়োজনে সীমান্তবাসী মানুষের কণ্ঠ অবদমিত থেকে যায়। সেই অদমিত কণ্ঠ ক্রমশ শ্রুতিগোচর হয় কিছুটা ভিন্ন পথে। সীমান্তবাসী মানুষ তাদের প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্য দিয়ে জাতিরাষ্ট্রের যুক্তিকে প্রতিনিয়িত অগ্রাহ্য করে, নস্যাৎ করে। বেআইনী অনুপ্রবেশ, সীমান্ত চোরাচালান ও অন্যান্য বহুবিধ কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যা প্রতিফলিত হয়। জাতিরাষ্ট্রের যুক্তি ও সীমান্তবাসী মানুষের যুক্তি দুই বিপরীত মেরুতে এসে হাজির হয়। সীমান্ত অঞ্চলে তৈরী হয় এক নতুন সংস্কৃতি। জাতীয় জীবনের মূল স্রোত সংস্কৃতির সঙ্গে তাকে মেলানো দুষ্কর হয়ে ওঠে।

ভারতীয় জ্ঞানচর্চার উৎসমুখ ও রাষ্ট্রীয় অণুপ্রেরণা

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়
বানপ্রস্থ, হুগলী

বিজ্ঞানের উৎসমুখ খোঁজার ভূমিকায় এই প্রবন্ধের অবতারণা। আধুনিক যা কিছু পরমার্থ তার সবই প্রতীচ্যের অবদান এমন তত্ত্ব নিয়ে আজ আর কেউ মাথা ঘামায় না। তবে একটা প্রশ্ন যা নিশ্চয়ই চিন্তকদের ভাবায় তা হল ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞানের এই উন্নতি সম্ভব হল কী করে? প্রাচীন গ্রামীন সামাজিক সংগঠনে অর্থনৈতিক ভিত্তি ছিল কৃষি এবং হস্তশিল্প। সম্পত্তি ছিল সর্বজনীন সম্প্রদায়ের হাতে। সম্প্রদায়ের সভ্যমাত্রই ছিল সম্পত্তির অংশীদার। এখানেই ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের সম্ভ্রমের চোখে দেখা হতো। তাঁরা সমাজে অন্যতম সম্মানিত মানুষ হিসেবে পরিগণিত হতেন। ফলে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নয় সত্যোপলব্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক চিন্তার উন্নতি দেখা দেয় প্রাচ্যে। জ্যোর্তিবিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিকাশ খুব ধীর লয়ে চলতে থাকে। গ্রীক বিজ্ঞানের ইতিহাসে গণানুক্রমিক উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। আয়নীয় থেকে রোমান। ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চার উন্নতিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ চালকশক্তি ছিল কিন্তু ভারতবর্ষ বা চীনে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় রাষ্ট্রীয় বা স্থানীয় শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা এক বড় ভূমিকা নিয়েছিল। ইউরোপের ইতিহাসে সাম্রাজ্য বিস্তারে বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রয়োগ দ্রুত প্রযুক্তির ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

এতো গেল তুলনায় কোথাকার বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ রাষ্ট্রের বেশি সাহায্য পেয়েছে। কিন্তু এইভাবে জ্ঞানচর্চা বেশিদিন বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে নি। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতীয় গণিত চর্চাকারীদের কাছে পিথাগোরাসের গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা অজানা ছিল না। গ্রীক, আরবীয় এবং ভারতীয় জ্ঞানচর্চার মেলবন্ধন বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। পিথাগোরাসের চিন্তায় সমৃদ্ধ হয়ে যেমন গ্রীক বিজ্ঞান তাত্ত্বিক ও ফলিত উভয় ক্ষেত্রেই বিকাশ লাভে সমর্থ হয় তেমনি ভারতীয় জ্ঞানচর্চায়ও তার একটা প্রভাব পড়তে থাকে। গ্রীক চিন্তাধারায় সক্রেটিসের হাত ধরে সে যুক্তিবাদের প্রচলন হয়। তা রাজনৈতিক কারণে হলেও জ্ঞানচর্চায় সুদূর প্রভাব ফেলে। সক্রেটিসের পর গ্রীক চিন্তা মূলত দুটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়ায়। একটি নৈতিক, অপরটি প্রাকৃতিক। প্লেটো পরবর্তী গ্রীকচিন্তায় এই দুই ধারার চিন্তার মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনায় অবশ্য প্রয়োগচিন্তা সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠার ফলে নৈতিক চিন্তা পেছনে চলে আসে। বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে সামাজিক প্রেক্ষাপট খুবই জরুরী। প্রাচীন ভারতীয়দের শিক্ষা ব্যবস্থা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুযোগ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করেছিল। প্রাচীন হিন্দুদের শিক্ষাব্যবস্থা মূলত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এক্তিয়ারে ছিল। এক্ষেত্রে স্থানীয় রাজা বা জমিদার ধর্মাচরণের মত ব্রাহ্মণদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে সাহায্য করতেন। সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় বৌদ্ধ আমলে। সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোশকতায় বৌদ্ধবিহারগুলি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। বৌদ্ধ বিহারের শিক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মন্দির কেন্দ্রিক বিদ্যালয় স্থাপনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দক্ষিণভারতে এমন শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্ভবের কথা জানা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে তক্ষশিলা একটি বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র তবে নালন্দা ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফাহিয়েনের বর্ণনায় নালন্দার বিশেষ উল্লেখ না থাকলেও গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা এক বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

মৌর্য শাসনব্যবস্থার মানবিক দিক

শ্রাবণী দত্ত (বসু)
নিউ আলিপুর কলেজ, কলিকাতা

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মৌর্যযুগ একটি স্মরণীয় যুগ। মৌর্যযুগের আগমনে ভারতের স্থিতিশীলতা ও ঐক্য যেমন এসেছিল তেমনি মৌর্যরাজশক্তি মৌর্য শাসনব্যবস্থাকে আরও দৃঢ়তর করে তুলেছিল। এই শাসনব্যবস্থায় রাজা ছিল কেন্দ্রবিন্দুতে এবং রাজাকে ঘিরেই মৌর্য শাসনব্যবস্থা বিকশিত হয়েছিল।

মৌর্য শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে গেলে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা ও অশোকের অসংখ্য শিলালেখার উপর নির্ভর করতে হয়। কৌটিল্য তার সমাজচিন্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রাষ্ট্রচিন্তার উপর। কৌটিল্য বলেছেন যে দণ্ডনীতির প্রয়োগের দ্বারা আইন-শৃঙ্খলা বজায় থাকে, মাৎস্যন্যায় দূরীভূত হয় এবং চার বর্ণ ও চার আশ্রমের লোকেরা নিজ নিজ ধর্মে ও কর্মে মগ্ন হয়ে ধর্ম, অর্থ ও কাম (ত্রিবর্গ) লাভ করতে পারে। কৌটিল্যের দৃষ্টিতে তাই রাজার দণ্ডনীতি সমাজের রক্ষক, নিয়ন্তা ও পালয়িতা।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রাজ কর্তব্য ও দায়িত্বের উল্লেখ আছে। রাজা ছিলেন সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। যদিও তাকে এক সাধারণ নশ্বর হিসাবে মনে করা হত, তবুও তিনি দেবতাদের প্রিয় ছিলেন। বিরাট সাম্রাজ্যের উপর তাঁর অধিকার এবং বিশাল সৈন্যবাহিনীর উপর তার আধিপত্যই তাঁকে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী করেছিল। অনেক প্রাচীন

বিধি ছিল (পোরাণ পকিতি) যেগুলিকে যত স্বেচ্ছাচারী শাসকই হোননা কেন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছেন। প্রজাবর্গ ছিল রাজ্যের এক অপরিহার্য অংশ। প্রজাবর্গ ছিড় রাজ্যের এক অপরিহার্য অংশ। রাজা তাদের সন্তানের ন্যায় দেখতেন এবং তাদের কল্যাণের জন্য দায়ী থাকতেন। প্রথম কলিঙ্গ অনুশাসনে অশোক ঘোষণা করেছেন, "সবে মুনিসে প্রজা মমা" অর্থাৎ সকল মানুষ আমার সন্তান। তিনি তাঁর প্রজাদের সন্তানব্য মনে করতেন। তিনি রাজা হিসাবে নিজেকে মানব-সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের জন্য দায়ী বিবেচনা করেছেন। রাজা হয়েছেন সমাজের নিয়ামক। মনে রাখা প্রয়োজন, অশোক কৌটিল্যের আইন-বিধি প্রয়োগের দ্বারা সমাজের কল্যাণ করতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন ধর্মনীতির বাস্তব প্রয়োগের দ্বারা সমাজের কল্যাণ বিধান করা।

অশোকের ধর্ম্মের লক্ষ্য ছিল মানবকল্যাণ। তিনি প্রত্যেকটি ধর্মসম্প্রদায়কে গুরুত্ব দিয়ে সমান চোখে দেখেছিলেন। অশোক মনে করেন গৃহ, পরিবার ও গার্হস্থ্য আশ্রমে যদি সুস্থ মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তবে তা বিচ্ছুরিত হবে সমগ্র সমাজে। এই প্রসঙ্গে আচার-আচরণ ব্যবহার এবং সর্বোপরি চরিত্রের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কৌটিল্যের যুগে সমাজে 'দাস' নামে একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। কৌটিল্য দাসপ্রথাকে সুনজরে দেখেন নি। কৌটিল্যের মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় মেলে দাসদের প্রতি উদারতা প্রদর্শনে। অবস্থার চাপে যারা দাসত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, রাষ্ট্র সর্বদা তাদের সমমান রক্ষা করতে প্রয়াসী হয়েছে। রাষ্ট্র সর্বদা তাদের সম্মান রক্ষা করতে প্রয়াসী হয়েছে। কোনও দাসকে দিয়ে কোনও ঘৃণ্য কাজ করানো যাবে না। মুক্তিমূল্য দিলে অথবা পরিবর্তে কিছুদিনের জন্য সন্তোষজনকভাবে কাজ করাতে পারলে দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব— এই বিধান দ্বারা কৌটিল্য দাসপ্রথার উচ্ছেদ সাধনে উদ্যোগী হয়েছেন। এর থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, মৌর্যযুগের উৎপাদন ব্যবস্থা দাসপ্রথার উপর নির্ভরশীল ছিল না।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের তুলনায় শূদ্রের স্থান নির্ণয়ে কৌটিল্যের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক বেশী উদার। শূদ্রের সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত এবং সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার শূদ্র লাভ করেছে।

শিল্পায়ন ও নারী সমাজ

অরূপ ভট্টাচার্য

নারী সমাজকে অবহেলা করে সামাজিক অগ্রগতি অসম্ভব, বর্তমানে শিল্প উন্নত বিশ্ব ব্যবস্থা নিজরূপ পরিগ্রহ করেছে কেবলমাত্র পুরুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে— একথা ভাবার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। নারী সমাজ শিল্পক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছে তা অনস্বীকার্য। ব্রিটিশ শাসনকালে বিদেশী পুঁজিপতিরা নিজেদের মূলধন বিনিয়োগ করে এদেশে সস্তা কাঁচামাল ও সস্তা শ্রমিকের সাহায্যে যে শিল্প কারখানাগুলি গড়ে তুলেছিল তার প্রধান চালিকা শক্তি ছিল এই নারী সমাজ। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন প্রকার আইন গ্রহণ করে ভারত সরকার শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি করার চেষ্টা করলেও নারী শ্রমিকের উন্নতিকল্পে বিশেষ কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। নারী শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী আন্দোলনের বীজ নিহিত আছে কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের যুগে শ্রম শক্তির নানা পট পরিবর্তন হলেও নারী শ্রমিকের কোন প্রকার কল্যাণ হয়নি। বর্তমানে নারীকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করার নানা কৌশল- আবিষ্কৃত হয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই ভোগবাদী আচরণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যেভাবে ছায়া ফেলেছে তা আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে। উন্নয়নের নামে যে অরাজকতা চলেছে তা প্রতিরোধ করাই এই আলোচনার অন্যতম লক্ষ্য।

নয়া-অস্পৃশ্যতা ঃ একটি সমীক্ষা

বসন্ত লস্কর

প্রাক্তন শিক্ষক, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন

বিগত তিরিশ বছর বাংলা গ্রামজীবনে যে পরিবর্ত্তন এসেছে, তা একান্তই বাহ্যিক, যদিও বহিরঙ্গের এই পরিবর্ত্তন মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যতটুকু গুণগত পরিবর্ত্তন আশা করা গিয়েছিল, তার একশতাংশও পূরণ হয়নি। প্রমাণ, নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা জাতপাতের সমস্যা। ভারতের অন্য যে কোনো রাজ্যের তুলনায় অনেক কম এরকম প্রবোধবাক্য আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর। গ্রামীন পূজাপার্ব্বনে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীকে জোর করে ব্রাত্য করে রাখা, মিড-ডে মিলের জাত-খোয়ানোর ভয়, তথাকথিত উঁচু-নীচু জাতের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের বিরুদ্ধে গ্রাম ষোলোআনার মধ্যযুগীয় ফতোয়া— এসবই জাতপাতের সবল অস্তিত্ব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এইসব সামাজিক কুসংস্কার থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার দায়িত্ব যাদের হাতে ছিল, সেইসব গ্রামবাংলার নেতারা দায়িত্ব পালনে চূড়ান্ত অসফল। তাদের ব্যর্থতার কারণ, প্রথমত তাদের নিজেদের সামাজিক অবস্থান যা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা করতে প্রয়াসী করে তোলে। দ্বিতীয়ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মানেই ভোটব্যাংকে তার প্রভাব পড়ার ভয়। ফলে, কুসংস্কারকে মদত দেওয়াই তাদের পক্ষে অধিকতর লাভজনক, যুগপৎ ব্যক্তি এবং দলীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে। প্রতিবেদনটিতে এই সমস্যার প্রেক্ষাপট এবং সম্ভাব্য সমাধানের কথা বলা হয়েছে।

বীরভূম জেলার চাষের বিন্যাস এবং প্রবণতা ও স্থানীয় অর্থনীতির প্রবৃত্তির ওপর প্রভাব

দিলরুবা খাতুন
শান্তিনিকেতন

Cropping Pattern বলতে আমরা বুঝি, কোনও অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ে কী ধরনের শস্য কত পরিমাণে উৎপাদিত হয় এবং উৎপাদনের পরিবর্তনে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব।

এই গবেষণাপত্রে আমার লক্ষ্য হল 'Bureau of Applied Economics and Statistics, Govt. of West Bengal'-এ পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বীরভূম জেলার দশ বছরের (১৯৯৩/৯৪-২০০৩/০৪) Cropping Pattern-এর ধারার পরিবর্তন দেখানো এবং তার কারণ নির্ধারণ। প্রথম পদক্ষেপে আমরা দেখলাম Cropping Pattern-এর ধারা ও তার পরিবর্তন। এই জন্য আমরা হিসাব করলাম বিভিন্ন শস্যের জন্য মোট জমির আনুপাতিক পরিমাণ, উৎপাদনের শতকরা বৃদ্ধি এবং কৃষি জমির শতকরা বৃদ্ধি। এর ফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে একদিকে জমির পরিমাণ(?) এবং ধান, গম, সরষে ও ডালের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; অপরপক্ষে আলু চাষের জমির পরিমাণ অত্যন্ত পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় খাদ্যশস্যের পরিমাণ লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই অঞ্চলের Cropping Pattern-এর পরিবর্তনের অনেকগুলি কারণ লক্ষ্য করা যায়। এই কারণগুলি হল প্রাকৃতিক কারণ, সামাজিক কারণ, প্রযুক্তিগত কারণ প্রতিষ্ঠানগত কারণ, ঐতিহাসিক কারণ, অর্থনৈতিক কারণ ইত্যাদি। এই নিবন্ধে আমরা অর্থনৈতিক কারণটিকেই প্রাধান্য দেব। অর্থাৎ জলসেচের সুবিধা, চাষীদের অর্থনৈতিক অবস্থা, সারের ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করব। আমরা এখানে বিভিন্ন শস্য এবং খাল দ্বারা জলসেচের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাদের আনুপাতিক হিসাব দেখে বুঝেছি যে খাল দ্বারা জলসেচ এই এলাকায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক্ষেত্রে বাণিজ্যীকরণের সীমা নির্ধারণ করা যায় কৃষকদের ব্যয়ের সাপেক্ষে। আমরা দেখলাম যে বীরভূম জেলার কৃষি সম্পূর্ণ বাণিজ্যনির্ভর নয়, আবার পুরোপুরি নিজ ব্যবহারেরও নয়। এটিকে আধা-বাণিজ্যিক কৃষিব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

বীরভূম জেলা প্রধানত কৃষিভিত্তিক। সুতরাং এই স্থানের উন্নয়নের জন্য উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদনের জন্য Cropping Pattern-কে অনুকূল হতে হবে। এই স্থানের আবহাওয়া ভেষজ উদ্ভিদ চাষের পক্ষে অনুকূল। কৃষকদের সঠিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা এই স্থানের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারী প্রচেষ্টারও প্রয়োজন।

সেন্সারশিপ আর ভারতীয় গণতন্ত্র

পার্থ রাহা
ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স, ৬৬ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা - ৯

বৃটিশ সরকার সিনেমায় সেন্সারশিপ প্রথা চালু করেন ১৯১৮। ইন্ডিয়ান সেন্সারশিপ এ্যাক্ট (১৯১৮) এই আইনের মধ্যে শুধু রাজদ্রোহ বা অন্তর্ঘাতই ছিল না। যা কিছু বৃটিশ বিরোধী তারই উপর সেন্সারের কোপ পড়ল। 'হাঞ্চ ব্যাক অব নটরডম' বা 'ব্যাটলশিপ পটেমকিন'কে ভারতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। সেন্সারশিপের এই কারণ শুধু রাজনৈতিক ছিল না। বৃটিশ ব্যবসায়ীরা কোনভাবেই তাদের ব্যবসার বাজারের ভিতর অন্যদের, এমনকী হলিউডের অনুপ্রবেশকে ভাল চোখে দেখেন নি।

স্বাধীনতার পর আশা করা গিয়েছিল অবস্থার পরিবর্তন হবে। কিন্তু বাস্তবে শুধু 'বৃটিশ বিরোধী' শব্দটি বাদ দিয়ে ঐ আইনকেই জিইয়ে রাখা হল 'হিংসা' দেখানো যাবে না এই অজুহাতে '৪২' বা 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন'-এর বৃটিশ সরকারের পুলিশী অত্যাচারের দৃশ্যর উপর কোপ পড়ল। কেননা শাসক শ্রেণির শ্রেণি চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু মুম্বই কিন্নরীদের অতি কৃপণ বেশবাসের হিল্লোলিত নাচের দৃশ্যর উপর সেন্সারের কাঁচি কোন প্রভাব ফেলে না, এবং চ্যানেল, স্টার মুভিজের খোলামেলা দৃশ্য খুলে দেখাতে কোন বাধা নেই। অপরদিকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টা পনেরো মিনিট বিজ্ঞাপন দেখানো হয়, সেখানে আই.এ.পির সমীক্ষা থেকে জানতে পারি শিশুরা যখন মাধ্যমিকের গণ্ডী পেরবে ততদিনে তারা তিন লক্ষ চল্লিশ হাজারেরও বেশি বিজ্ঞাপন দৃশ্য দেখবে এ বিষয়ে সেন্সর কর্তৃপক্ষ কোন নজর দেবার প্রয়োজন মনে করেনি। বরং বিশ্বায়নের যুগে এর প্রতি সস্নেহ সম্মতির নিদর্শনই দেখা যায়। অপরদিকে ওবের হাউসের আন্তর্জাতিক তথ্যচিত্র প্রতিযোগিতা সোনার সম্মান পাওয়া ভয়েস ফ্রম বালিয়াপার্নকে কর্তৃপক্ষরা দূরদর্শন বা সিনেমা হাউসে দেখানোর অনুমতি দেননি। এই হল ভারতীয় গণতন্ত্রের মুখ উজ্জ্বল করা চরিত্র!

এখন আবার বিশ্বায়নের মোহে আবদ্ধ কিছু হর্তাকর্তারা সেন্সারশিপ একেবারে তুলে দিয়ে 'অবাধ স্বাধীনতা'র জিগির তুলেছেন 'মুক্ত দুনিয়ার আদর্শে'। আরো বেশি 'হিংসা' আরো বেশি 'নীল' আবহাওয়া তৈরি করে ভারতবাসীকে আরো 'আধুনিক' আরো 'বিশ্বায়নমুখী' করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, এও বোধহয় ভারতীয় গণতন্ত্রের আর এক মহিমা।

অপুষ্টিজনিত রোগ এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ঃ একটি অভিজ্ঞতালবদ্ধ সমীক্ষা

ডাঃ সুকান্ত মুখার্জী
এইচ, আই, টি হাউসিং, ইছাপুর, হাওড়া

আমরা জানি যে, ১৯৯০ সালে নিউইয়র্কে, ১৯৯১ সালে মনট্রিলে এবং ১৯৯২ সালে রোমে ক্ষুধা, দারিদ্র এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যার উপরে যে বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, পরে ভারতবর্ষের কয়েকটি জায়গাতেও এই ধরণের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যেখানে উক্ত সমস্যার কারণগুলি কী হতে পারে তা খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছিল। তার মধ্যে— মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট একটি সমস্যা।

ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে দেখা যায় যে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত মানুষের শতকরা হিসাব ভয়াবহ অবস্থায় আছে।

বর্তমান গবেষণা পত্রে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে, উক্ত সমস্যার (বিশেষ করে অপুষ্টিজনিত রোগ) অনেক কারণ-এর মধ্যে একটি কারণ মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সম্পর্কে উক্ত সমস্যায় জড়িত মানুষেরা আদৌ কিছু জানে কিনা। এছাড়া আর্থ-সামাজিকগত ভাবে দূর্বল স্তরের মানুষেরা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট এর অভাবে অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে কিনা (বিশেষ করে শিশু এবং মহিলারা), আক্রান্ত হলে, কেন হচ্ছে, কীভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। পরিশেষে কিভাবে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

খাদ্য এবং ক্যানসার

ডাঃ শঙ্কর কুমার নাথ
(অনকোলজিস্ট), ডিপার্টমেন্ট অফ রেডিওথেরাপী, আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ এ্যান্ড হসপিটল, কলিকাতা

ভারতবর্ষে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে বা অন্যভাবে বলা যায় যে, চিকিৎসার জগতে আধুনিক পদ্ধতিতে রোগ নিরূপণ হওয়ার ফলে পূর্বের থেকে বর্তমানে অনেক বেশি সংখ্যক ক্যানসার রোগ খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে।

এই সমস্ত ক্যানসার রোগীদের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়ই দেখা যাচ্ছে যে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলের রোগীদের ক্ষেত্রে খাদ্য নির্বাচন যদি সঠিকভাবে হয়ে থাকত তাহলে পরে অন্তত পক্ষে শতকরা ৬০ শতাংশ মানুষ ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হতেন না।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমরা যদি আঁশযুক্ত খাদ্য প্রতিদিনকার খাদ্য তালিকায় রাখি, তাহলে আমরা বেশ কিছু ধরনের ক্যানসার এর ছোবল থেকে মুক্তি পেতে পারি।

বর্তমান গবেষণা পত্রে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে ফাস্ট ফুড না খেয়ে আঁশযুক্ত খাবার যেমন হাতে গড়া রুটি, গাজর, কড়াইশুঁটি, মুগ-মুসুর ডাল, আলু ইত্যাদি খাদ্য আমাদের প্রতিদিনকার খাদ্য তালিকায় রাখলে পরে কোলন ক্যানসার, স্তনের ক্যানসার, প্রস্টেট গ্রন্থি ক্যানসার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা যায়।

বামফ্রন্টের জমানায় পশ্চিমবঙ্গে কী গণতন্ত্র বিলুপ্ত?

সুহাস চট্টোপাধ্যায়
ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সস, ৬৬ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা - ৯

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পরপর ৭টি বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার চালাচ্ছে। বামফ্রন্ট-বিরোধী দলগুলি বলে, এ রাজ্যে গণতন্ত্র বলতে কিছু নেই বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

বামফ্রন্ট সত্যই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছে কিনা তা বিচার করতে হলে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার আগে এ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কি ছিলো তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পরে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করার পর যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে এ রাজ্যের শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় এবং আধা-ফ্যাসিস্ত আক্রমণ শুরু হয় সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের ওপর। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত চার বছর সময়কালে তিনবার রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা হয়। এই সময়কালে নির্বাচিত সরকারগুলিকে ২২ মাসের বেশি শাসন ক্ষমতায় টিকতে দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পরে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছুদিন নির্বাচন না করে রাষ্ট্রপতির শাসন চালিয়ে যায়। ১৯৭১ সালে যে নির্বাচন হয় তাতে সিপিআই (এম) একক ভাবে সবচেয়ে বেশি আসন লাভ করে। কিন্তু তা সত্বেও সিপিআই (এম)কে সরকার গঠন করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। ১৯৭২ সালে আবার বিধানসভার নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনের আগে কংগ্রেস

দলের গুণ্ডাবাহিনী সিপিআই (এম)-এর কম পক্ষে ২০ হাজার কর্মী ও সমর্থককে তাদের এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়। নির্বাচনের দিন তারা বহু নির্বাচন কেন্দ্রের অধিকাংশ বুথ দখল করে নিয়ে পোলিং অফিসারদের কাছ থেকে সমস্ত ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয় এবং কংগ্রেস ও তাদের সহযোগী দলগুলির প্রার্থীদের নামের পাশে ছাপ্পা মেরে সেগুলি ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়। এইভাবে নির্বাচনে জয় লাভ করে সিদ্ধার্থ রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস দলের সরকার গঠিত হয়। তারপরেও বামপন্থী শক্তির— বিশেষত সিপিআই (এম)-এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলের আক্রমণ বন্ধ হয়নি। বরং তা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। সিদ্ধার্থ রায়ের সরকারের প্রথম তিন বছরে ১০২ জন সিপিআই (এম) সদস্য এবং সমর্থককে খুন করা হয়। কিন্তু খুনীদের পুলিশ কখনই গ্রেপ্তার করেনি। কংগ্রেস দলের সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে প্রায় তিনশত কলকারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। সি আই টি ইউ অন্যান্য বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের অফিসে গুণ্ডাবাহিনী দখল করে নেয়। এইভাবে এ রাজ্যে আইনের শাসনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়।

এর পরে ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরী অবস্থা জারী করে সারা দেশে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের মানুষ বুর্জোয়া গণতন্ত্রের যে সব অধিকার অর্জন করেছিলেন জরুরী অবস্থা জারী করার পর তা সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেওয়া হয়।

১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ লোকসভার নির্বাচনে দেশের মানুষ দ্বিধাহীনভাবে জরুরী অবস্থা জারী করার বিরুদ্ধে রায় দেন। স্বাধীনতা লাভের পর একটানা দেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর এই প্রথম কংগ্রেস দল লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। পশ্চিমবঙ্গেও তারা ৪২টিআসনের মধ্যে মাত্র তিনটি আসন লাভ করে।

কেন্দ্রে জনতা সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গ সহ নটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিআই (এম)-এর নেতৃত্বে গঠিত বামফ্রন্ট দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করে। সিপিআই (এম) একাই বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু তারা একদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠা না করে বিধানসভায় বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলির নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার অনুপাতের তুলনায় তাদের বেশি প্রতিনিধিকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই সিদ্ধার্থ রায় সরকারের শাসনকালে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে এবং বিভিন্ন কলকারখানায় যে সব শ্রমিক-কর্মচারী কর্মচ্যুত হয়েছিলেন তাঁদেরও কাজ ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সিদ্ধার্থ জমানায় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে সব কর্মীকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে বিচারাধীন অবস্থায় অথবা বিনাবিচারে জেলে আটক রাখা হয়েছিল তাদের প্রত্যেককে— এমনকি আটক নকশালপন্থীদেরও মুক্তি দেওয়ার জন্য আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে দীর্ঘদিন যাবৎ পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার নির্বাচন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সালেই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন করে গ্রামীণ উন্নয়নের দায়িত্ব পঞ্চায়েতগুলির হাতে তুলে দেয়। এর ফলে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে এবং রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি তৃণমূল স্তর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। রাজ্যের পৌরসভাগুলির গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে পৌর আইনের যথোপযুক্ত সংশোধন করতে হয়, যার জন্য কয়েকটা বছর লেগে যায়। নতুন আইনে কলকাতা কর্পোরেশন সহ রাজ্যের সমস্ত পৌরসভার হাতে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি অধিকার দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। তারপর থেকে রাজ্য বিধানসভা, পঞ্চায়েত এবং পৌরসভাগুলির নির্বাচন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এই সব নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকলেও, বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত, দুচারটে পঞ্চায়েত সমিতি এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পৌরসভা কংগ্রেস দল দখল করতে সক্ষম হয়। তৃণমূল কংগ্রেস গঠিত হবার পরে এই দলও বেশ কিছু স্বশাসিত সংস্থায় ক্ষমতা দখল করে। বামফ্রন্ট সরকার ঐ সব সংস্থার পরিচালনায় কখনই হস্তক্ষেপ করেনি। ঐ সব সংস্থা যে কোন বিরোধী দলই পরিচালনা করুক না কেন, তারা কোন রকম বৈষম্যের শিকার হয়নি। দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই এ পর্যন্ত এই রকম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র নেই এ কথা বলা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

শিক্ষার মাধ্যমে উন্নয়ন ঃ ভারতবাসীর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়
ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সস, ৬৬ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা - ৯

দুশ বছরের শাসন-শোষণের ফলে সাধারণ ভারতবাসীর জীবন সর্বতোভাবে যে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল সে ইতিহাস আমরা জানি। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে ১৯৪৭-এর আগস্ট মাসে ভারত ভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল। ভারত রাষ্ট্রের নাগরিকরা নতুন দিনের স্বপ্ন দেখলেন। শিক্ষা-বঞ্চিত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন দারিদ্র্যক্লিষ্ট কোটি কোটি মানুষের মনে জেগে উঠল অনেক প্রত্যাশা। নবগঠিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিশ্রুতি ও কর্ম-পরিকল্পনা জনজীবনের উন্নয়নের আশাকে প্রাথমিকভাবে একটু শক্ত মাটিতে দাঁড়াবার অবকাশ করে দিল।

সার্বিক উন্নয়নের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসেবে জনশিক্ষা বিস্তারের গুরুত্বকে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে পথ নির্দেশের উদ্দেশ্য নিয়ে বেশ কয়েকটি কমিটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। সুচিন্তিত সারগর্ভ

পরামর্শেরও ঘাটতি ছিল না। সর্বাধিক আলোচিত কোঠারী কমিশন শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের হাতিয়ার বলে ঘোষণা করলেন। তাঁদের প্রতিবেদনের শিরোনাম হল 'শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন' (Education and National Development)। এখন ২০০৫ সালেও কেন্দ্রীয় সংস্থা এন. সি. ই. আর. টি জাতীয় স্তরে বিদ্যালয় পাঠক্রমের রূপরেখার সুপারিশে বলছেন শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজের পরিবর্তন সাধন। আবার একই দলিলে বলা হয়েছে যে আজও ভারতবাসীর মধ্যে ৩৭ শতাংশ অক্ষরপরিচয়হীন। কয়েক কোটি ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ের নাগাল পাচ্ছে না।

আজ আমরা ভারতীয় সমাজের যে বাস্তব চিত্র দেখছি সেখানে বিকাশহীন বৃদ্ধির সমারোহ। জি. ডি. পি. বৃদ্ধির গৌরবে, সেনসেক্স-এর উত্তেজনায় আমাদের ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানবোন্নয়ন সূচকে আমাদের অধোগতির লজ্জা। মুষ্টিমেয় বিত্তশালীর সম্পদস্ফীতির সঙ্গে সহাবস্থান করছে অসহায় কৃষকদের আত্মহত্যা। আইন করেও বন্ধ করা যাচ্ছে না শিশু শ্রম, বাল্যবিবাহ আর কণ্যাভ্রূণ হত্যার নৃশংসতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জাতি বিদ্বেষ, তথাকথিত নিম্নবর্ণের ওপর অমানুষিক উৎপীড়ন প্রতিকারের পথ পাচ্ছে না। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে সুকৌশলে ব্যাপ্ত করার কাজে সহায় হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি।

আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে এই পীড়াদায়ক বৈপরীত্যের সঙ্গে শিক্ষায় পশ্চাৎপদতার কার্যকারণ সম্পর্ক এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ হওয়া জরুরী। এই নিবন্ধে আছে সেই প্রসঙ্গে কিছু আলোকপাতের বিনম্র প্রয়াস।

শিল্পায়নে কৃষির ভূমিকা ঃ কয়েকটি প্রশ্ন

সৌম্য চক্রবর্তী
অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চলেছি সেটি কোনো আলোচনা সভায় উত্থাপিত হলে প্রথমেই যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় তা হলো এই যে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সম্ভবত এই বিষয়ের মূল বিতর্কগুলির উত্তর আগেই পাওয়া হয়ে গেছে, ফলে এই বিষয়ে প্রায়োগিক দিকগুলি নিয়ে আলোচনা চলতেই পারে। কিন্তু এই বিষয়ে কোনো তাত্ত্বিক প্রশ্ন উত্থাপন মানে শুধুই ফিরে দেখা। তবে অনেক ক্ষেত্রে বারেবারে ফিরে দেখা নতুন আলোকপাতও তো করতে পারে। আর সেই আশা নিয়েই আমাদের এই চর্চা।

যে কোনো শিল্পায়নরত অর্থনীতির কাছই আমাদের আলোচ্য প্রশ্নটি সব সময়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত যে দেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অনেকটাই সেখানে কৃষি ও শিল্পের নিজস্ব গতি ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। স্বভাবতই অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা ভারতীয় অর্থনীতির বিদগ্ধ গবেষক অধ্যাপক আশাক রুদ্র-র আলোচনায় বারে বারে ফিরে এসেছে কৃষি ও শিল্পের আন্তঃসম্পর্ক। বিশেষত পরিকল্পনা বিষয়ক আলোচনায় এই দুই ক্ষেত্রের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছেন। তাঁর বক্তব্যে কৃষি ও শিল্পের বহুমুখী ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা খুবই স্পষ্ট। তাঁর পরিকল্পনা কাঠামোয় তাই কৃষি ও শিল্পের গতির ভারসাম্যের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। আর এখানেই আমাদের আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা। এই আলোচনায় আমরাও কৃষি-শিল্পের ভারসাম্যের কথাই বলবো। সেই সাথে ভারসাম্যের কার্য-কারণ প্রক্রিয়াটিকেও আরও একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করবো।

কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রশ্নটি সত্যিই পুরনো। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক এর সাথে জড়িত। এই প্রশ্নটির দুটি দিক আছে। প্রথমটি হলো কৃষির শিল্পের ওপর নির্ভরশীলতা, আর দ্বিতীয়টি এই অবস্থানের ঠিক উল্টো এক কার্য-কারণ সম্পর্কের সাথে জড়িত। অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রশ্নটি কৃষির উপর শিল্পের নির্ভরশীলতা বিষয়ক। আমাদের আলোচনার বিষয় এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিই ঃ শিল্পের প্রসারে কৃষির অবদান ঠিক কোথায় এবং কীভাবে তা কার্যকর হয়।

আমাদের নিজস্ব বক্তব্যে আসার আগে, প্রথমেই যা দরকার তা হলো এই বিষয়ে ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ চর্চাগুলির পর্যালোচনা, যা আমাদরে নিজস্ব আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

এই চর্চাগুলি আমাদের এযাবৎকার বিশ্বাসগুলিকে টলিয়ে দেয়। কৃষিতে শিল্পের বাজারকে খোঁজার প্রক্রিয়াকে প্রশ্ন করে। শিল্পায়নের সাথে বাজারের সঙ্কীর্ণতার সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজাকে থামতে দেয় না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নে মেধাস্বত্ব ঃ একটি পর্যালোচনা

উৎপল কুমার বিশ্বাস/মহুয়া হোম চৌধুরী
বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর
পেটেন্ট তথ্য কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংসদ

বিশ্বায়ন ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার সাথে সাথে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মেধাস্বত্ব এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বাণিজ্য সংক্রান্ত সুবিধা অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য বিভিন্ন বহুপাক্ষিক চুক্তির উত্থান এবং নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংগঠন (ITO) ও বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্ভব পণ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করে। একটা সময় ছিল যখন ''সোনা'' ছিল বিশ্ববাণিজ্যে একটি দেশের সঙ্গে অন্য দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত লেনদেনের উপায়, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকট তৈরী হয় সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালে ৩১শে অক্টোবর GATT (General Agreement on Trade & Tariff) চুক্তি সাক্ষরিত হয়। GATT চুক্তিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মেধা বা বুদ্ধির আদানপ্রদানের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না, অর্থাৎ কিনা কোন দেশের উদ্ভাবন অন্য কোন দেশ যদি বিকল্প পদ্ধতিতে তৈরী করে, তা প্রতিহত করার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না, ফলে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার প্রকাশ (WTO) জরুরী হয়ে পড়েছিল এবং তারই ফলস্বরূপ মেধাস্বত্ব সুরক্ষার জন্য TRIPS চুক্তির উদ্ভব হয় ১৯৯৫ সালে।

মেধাস্বত্ব সুরক্ষার সাথে সাথে তা বাণিজ্যকরণ ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে হরপ্পা ও বৈদিক সংস্কৃতিতেও পৃথিবীর নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবন করে তা সামাজিক কার্যে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে মেধাস্বত্বের সূত্রপাত ব্রিটিশ রাজত্বের সময়ে ১৮৫৬ সাল থেকে অথচ আজও সারা বিশ্বে যেখানে প্রতি বছর ৮ লক্ষ মিলিয়ন পেটেন্ট আবেদন জমা পড়ে সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষে এর পরিসংখ্যান মাত্র ১৫,০০০।

আন্তর্জাতিক বিশ্বে অর্থনৈতিক এবং মেধাসম্পদ এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যোগসূত্র তৈরী করেছে পেটেন্ট। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মেধা সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও কোন রকম সংগঠিত পদ্ধতিতে তা সংরক্ষণের প্রথা না থাকায় মেধাসম্পদ তার গুরুত্ব হারাচ্ছে। শুধুমাত্র আইনের বাঁধাধরা নিয়মে এই সম্পদ রক্ষা করা যায় না। TRIPS চুক্তির নিয়ম অনুযায়ী ভারতবর্ষে পেটেন্ট আইন সংশোধিতহয়। সেই অনুযায়ী ভারতবর্ষে পেটেন্ট আইনকে সংশোধন করে শুধু উৎপাদন পদ্ধতি নয় দ্রব্য এবং পণ্যটির জন্য পেটেন্ট চালু হয় ২০০৫ সাল থেকে।

আজকের বিশ্বায়নের যুগে মেধা সংরক্ষণের সঙ্গে মেধা বাণিজ্যকরণও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবিষয়ে দুরকম মতবাদ দেখা যায়— তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ও উন্নত দেশগুলিতে। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এখনও পর্যন্ত মেধা বাণিজ্যকরণ প্রবণতা দেখা যায় না। আজ বিশ্বায়নের যুগে, মেধা বাণিজ্যকরণের জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের গবেষণা ও উপযুক্ত পরিকাঠামো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটা সাধারণ ওষুধ নিয়ে গবেষণা চালাতে খরচ পড়ে ৩০ কোটি ডলার অর্থাৎ ১০০০ কোটি টাকার বেশি। এমতাবস্থায় উন্নত দেশগুলির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে নতুন উদ্ভাবন ও স্বল্প পরিকাঠামোর গবেষণার পথ প্রশস্থ করতে হবে। সেক্ষেত্রে জৈব সম্পদের ভাণ্ডার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে তার নিজস্ব সম্পদ, দক্ষতা ও পরম্পরাগত জ্ঞানকে উন্নত প্রযুক্তির আঙ্গিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। না হলে আবার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে বাসমতি ও নিমের মত আরও অনেক সম্পদ হারিয়ে ফেলতে হবে। অর্থাৎ এমতাবস্থায় ভেষজ সম্পদের ভাণ্ডার ভারতবর্ষকে তার জৈব সম্পদকে কাজে লাগিয়েই, নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নের পথ সুগম করতে হবে। অর্থাৎ বর্তমানে, বিশ্ববাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে নতুন উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ সংরক্ষণ ও শিল্পক্ষেত্রে তার বাণিজ্যকরণ এবং লভ্যাংশকে কাজে লাগিয়ে নতুন গবেষণার দিক উন্মোচিত করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে বাসমতি চালের পেটেন্ট এবং নতুন ভৌগোলিক নির্দেশিকা আইন ১৯৯৯ এবং নিয়মাবলী ২০০২ এর কথা পর্যালোচনা করাটা প্রাসঙ্গিক। US এর Rice Tech কোম্পানী বিভিন্ন রকম চালের বীজ ও গাছ সম্পর্কিত পেটেন্ট ''বাসমতী রাইস লাইনস্ এ্যান্ড গ্রেইনস্''-এর জন্য আবেদন করে USPTO-তে, যার অধিকাংশই ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের সীমান্তবর্তী এলাকায় উৎপাদিত বাসমতি সম্পর্কিত। ভারতবর্ষ থেকে ঐ পেটেন্টটি পুনরায় পরীক্ষা করার জন্য আবেদন পাঠানো হয় ২০০০ সালে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে Rice Tech ঐ পেটেন্ট সম্পর্কিত অনেকগুলি দাবী তুলে নিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ এমতাবস্থায়, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পেটেন্ট ছাড়াও মেধাস্বত্বের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ভৌগোলিক নির্দেশিকা সংরক্ষণের দিকেও যত্নশীল হতে হবে। না হলে বাসমতি নিমের মত অনেক সম্পদ হারিয়ে ফেলতে হবে। এটাই আশার যে ভারত সরকার এই ধরণের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য ''ভৌগোলিক নির্দেশিকা আইন ১৯৯৯'' চালু করে। এই আইন অনুযায়ী ভৌগোলিক নির্দেশিকা হল নির্দিষ্ট চিহ্ন যা বিশেষ কোন অঞ্চলে বহুদিন ধরে উৎপাদিত হওয়ার জন্য ও বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়ার কারণে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠা স্থাপন করতে সাহায্য করে তাকেই বোঝানো হয়। যেমন দার্জিলিং চা, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, বর্ধমানের মিহিদানা এবং সীতাভোগ ইত্যাদি। এই

ভৌগোলিক নির্দেশিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি পরম্পরাগত সম্পদ, দক্ষতা, কৃষিজ সম্পদ ও জৈব সম্পদকে সুরক্ষিত করতে পারে।

এমতাবস্থায় ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশগুলির উচিত ভৌগোলিক নির্দেশিকাগুলি চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে ঐ সমস্ত দ্রব্যের পরিচিতি এবং বাজারদর প্রতিষ্ঠা করা। না হলে অবিলম্বে আবার আমরা বাসমতি এবং নিমের মত আমাদের ঐতিহ্য দক্ষতা, জৈব সম্পদ হারিয়ে ফেলব।

এই পর্যালোচনা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার যে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যে মেধাসম্পদের প্রাচুর্য্য রয়েছে তা সংরক্ষণ করে ঐ সম্পদের বাণিজিক স্থান উন্নত করতে হবে। বিশ্বের দরবারে পরিচিতি দান করতে হবে এবং নতুন উদ্ভাবনার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের দিকগুলি তুলে ধরতে হবে। শুধু তাই নয়, পরম্পরাগত জ্ঞান থেকে অর্জিত জ্ঞান প্রযুক্তির আঙ্গিকে সাজিয়ে তুলতে হবে, তাহলেই নতুন প্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ''হলুদ'' যা বহুকাল ধরেই ভারতবর্ষে ''আঘাত নিবারক'' ঔষধ হিসাবে চিহ্নিত তার এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে আমরা যদি নতুন কোন ক্যাপসুল বা Tablet তৈরী করতে পারি যা কিনা নতুন উদ্ভাবনকে চিহ্নিত করবে, তবেই ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশগুলি ''দ্রব্য পেটেন্টের'' মত আইনের মোকাবিলা করতে পারবে ও বহুজাতিক ঔষধ কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দীতায় দাড়াতে পারবে। অর্থাৎ দ্রব্য পেটেন্টকে কাজে লাগাতে হবে, ভেষজ সম্পদকে নতুন প্রযুক্তির আঙ্গিকে নতুন উদ্ভাবনার মধ্যে দিয়ে মেধাস্বত্ব চুক্তির মোকাবিলা করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র সেচ ভূগর্ভ জলসম্পদের ব্যবহার, ও ভূগর্ভ জলসম্পদের সংরক্ষণ আইন

প্রদীপ সেনগুপ্ত

অনামিকা এ্যাপার্টমেন্টস, কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একমাত্র আসমুদ্র হিমাচল রাজ্য। এর ভূপ্রকৃতি যেমন বিচিত্র তেমনই বিচিত্র ও বিপুল এর প্রাকৃতিক সম্পদ। আমরা যদি শুধুমাত্র জলসম্পদের কথাই ধরি তাতেও দেখা যায় এই রাজ্য সে ক্ষেত্রেও অগ্রগণ্যদের মধ্যে অন্যতম। এই জলসম্পদের প্রাচুর্যের জন্যই এখানে উন্নয়নের সোপান হিসাবে কৃষি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। স্বাধীনতার পর থেকে এবং বলতে গেলে ৭০-এর দশক থেকেই ক্ষুদ্র সেচ এই রাজ্যে বৃহৎ সেচ ব্যবস্থা হিসাবে স্থান করে নিয়েছে ধাপে ধাপে।

একদিকে যেমন সরকারিভাবে এবং সমবায় ভিত্তিতে ক্ষুদ্র সেচের অগ্রগতি চলতে থাকে অন্যদিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় নলকূপের সাহায্যে সেচের প্রবণতাও বাড়তে থাকে। বিশেষত বোরো ধানের চাষকে ঘিরেই ভূগর্ভের জল বিক্রী একটা লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়। এর পরিণতিতে ভূগর্ভের জলভাণ্ডারে টান পড়তে থাকে দেখা যায় দক্ষিণবঙ্গের অনেক জেলাতেই জলস্তর এমন জায়গায় নেমে গিয়েছে যে বাৎসরিক বৃষ্টির জলের ভূগর্ভের অনুপ্রবেশ সেই ক্ষতিপূরণ করতে পারছে না। সরকারীভাবে ভূগর্ভের জলের গতিপ্রকৃতি, পরিমাণগত ও গুণগত মাননির্ধারণের কাজ ৭০-এর দশক থেকেই নিয়মিতভাবে শুরু হয়েছে ও তা চলছে। সেই সাথে এই রাজ্যে তিনটি ক্ষুদ্র সেচ সুমারী করা হয়। প্রথম সুমারী হয় ১৯৮৬-৮৭ সালে, দ্বিতীয়টি ১৯৯৪-৯৫ সালে এবং তৃতীয়টি ২০০০-২০০১ সালে সংঘটিত হয়। এই প্রতিটি সুমারীতেই গ্রামভিত্তিক সমীক্ষা চালানো হয় ও কোথায় কী ধরণের ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা রয়েছে এবং তার জন্য কতটা সেচ সেবিত এলাকা তৈরী হয়েছে বা মোট সেচ সেবিত এলাকার পরিমাণ কত তা নথিবদ্ধ করা হয়।

দেখা যাচ্ছে যে গত কুড়ি বছরে গভীর ও অগভীর নলকূপের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ভূগর্ভের জলের ভাণ্ডারে টান পড়েছে ও জলস্তর অনেক জেলাতেই নেমে গিয়েছে। আর একটা বিষয় হল গত পনের বছরে যে অগভীর নলকূপের সংখ্যা বেড়েছে তার অধিকাংশই ব্যক্তিগত মালিকানার ও তা সাবমার্সিবল পাম্প যুক্ত স্বল্প ক্ষমতার নলকূপ যাকে স্থানীয় ভাষায় মিনিডিপ বলা হয়। ভূগর্ভের জলতল নেমে যাওয়ার একটা প্রধান কারণ এই মিনিডিপ থেকে বিপুল পরিমানে জল উত্তোলন।

উন্নয়নকে অব্যাহত রেখেও যাতে এই অপরিমিত ভূগর্ভের জল নিষ্কাশনকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের আটটি জেলায় ১৯৯৩ সাল থেকে একটি পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হল। বলা হল যে সব ব্যবহারকারী ব্যক্তিগত মালিকানায় সাবমার্সিবল পাম্প যুক্ত স্বল্প ক্ষমতার নলকূপে বিদ্যুৎ সংযোগ চান তাদের সুইডের (রাজ্য জল অনুসন্ধান অধিকার) অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

এ সব সত্বেও ভূগর্ভের জলস্তরের নিম্নগতি অব্যহত রইল ও দেখা গেল বহু ব্লকেই বর্ষার পরে জলস্তর তার আগের অবস্থায় ফিরে আসছে না। ২০০৪ সালে ভূগর্ভের জলের যে মূল্যায়ণ হল তার ভিত্তি হিসাবে দুটি বিষয় দেখা হল। (১) ভূগর্ভের জলস্তর নেমে যাওয়ার প্রবণতা আছে কিনা এবং (২) ভূগর্ভের জলের উন্নয়নের মাত্রা কত শতাংশ। এই হিসাবে রাজ্যের ব্লকগুলিকে ভাগ করা হল চার ভাগে ঃ (১) নিরাপদ (২) স্বল্প সংকটজনক (সেমি ক্রিটিকাল) (৩) সংকটজনক (ক্রিটিকাল) (৪) অতিব্যবহৃত (ওভার এক্সপ্লয়টেড)।

পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে ভূগর্ভের জলের অপরিমিত উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না দেখে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গ

ভূগর্ভস্থ জল (সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও প্রনিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০5 বলবৎ করা হল ও সেই সংক্রান্ত নিয়মাবলী গত ২০০৬ সালের ১লা আগস্ট থেকে চালু হয়েছে। এই আইনে বলা হয়েছে যে ঃ

● রাজ্যের যে কোনও স্থানে সেচ, শিল্প, পানীয় জল অথবা যে কোনও ক্ষেত্রে নলকূপ বা কূপের জন্য পারমিট এবং রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক।

● পারমিট প্রদান এবং রেজিস্ট্রিকরণের জন্য, প্রতিটি জেলায় (কলকাতা বাদে) জেলাস্তরীয় ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ অথরিটি গঠিত হয়েছে। কলকাতার জন্য কলকাতা কর্পোরেশন স্তরীয় ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ অথরিটি গঠিত হয়েছে।

● এই দুই স্তরের কাজকর্মের নীতি নির্ধারণের জন্য স্থাপিত হয়েছে রাজ্যস্তরীয় ভূগর্ভস্থ জলসম্পদ অথরিটি।

এই আইন বলবৎ হলেও এর পরিণতি কি হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। ভূগর্ভের জল পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে সবুজ বিপ্লব এনেছে। গ্রামাঞ্চলে সেচের এবং কৃষির অগ্রগতির যে চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার অন্যতম প্রধান কারণ ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার অগ্রগতি। সেই সাথে এক শ্রেণির জল মালিকের উদ্ভব হয়েছে যারা যে কোনও ভাবেই হোক ভূগর্ভের জলের ওপর নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে কিছু চাষী শুধুমাত্র সেচের জলের জন্যই এই সাবমার্সিবল মিনিডিপের মালিকদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে রয়েছে। এক দিকে উন্নয়ন ও অন্যদিকে ভূগর্ভের জলসম্পদের ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দুটোই আজ পশ্চিমবঙ্গে দেখা যাচ্ছে। বর্তমান আইন এই দুয়ের সামঞ্জস্য কিভাবে রক্ষা করবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনীতি একটি প্রতর্ক

সৌমিত্র বসু

এবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো বেশ সুকৌশলে শাসকশ্রেণির জন্যেই ভবিষ্যতের একটা দূরূহ কাজ সেরে রাখলো; এবারে অরাজনৈতিকীকরণের প্রক্রিয়াকে তারা বেশ গুরুত্ব দিয়েই এবং খুব সুচারু ভাবে করেছে, সম্পন্ন না করে উঠতে পারলেও তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা তারা এবারে করেছে।

যে কোনো সমাজে তিনটি ধারণাত্মক সমাজ, খণ্ড সমাজ হিসেবে বিরাজ করে ঃ এক, Civic Society বা পুরোনো সমাজ, দুই, Civil Society বা সুশীল সমাজ আর তিন, রাজনৈতিক সমাজ বা Political Society.

Civic Society বা পুরোনো সমাজ মূলত আন্দোলিত হয়, বা চিন্তিত হয় এবং কাজে উদ্দিষ্ট হয় মূলত পৌর পরিষেবা দাবীদাওয়া নিয়ে। অর্থাৎ পৌর-পরিষেবাই সেখানে মূল উপপাদ্য বিষয়বস্তু এবং সে ব্যাপারে চাপান উতোর বা বিরোধিতা উপস্থাপন ইত্যাদি নিয়েই ব্যস্ত থাকা এটাই কিন্তু পৌর সমাজের এক্তিয়ারের বিষয়বস্তু। এর বেশি এই সমাজ বা খণ্ড সমাজ ভাবতে রাজি নয়। বা এর বাইরের ইস্যুগুলোকে খুব একটা আমল দিতে এরা রাজি নয়।

Civil Society বা সুশীল সমাজ মূলত বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চেষ্টা করে তার মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত এবং মধ্যবৃত্ত অংশের প্রাধান্য বিস্তার করবার মতো কোনো অধিকারও সুযোগ সুবিধা নিয়ে চিন্তিত থাকে। সুশীল সমাজ কিন্তু অনেকটাই নাগরিক (নগর কেন্দ্রিক অর্থে) অভিমুখ নিয়েই এগিয়ে যায়। যাবতীয় উদারনৈতিক চিন্তা ও কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত নীতিমালার সূতিকারই (সূতিকাগার নয়) সুশীল সমাজ। সুশীল সমাজ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বা শ্রেণী দাবীগুলো নিয়ে উহ্য থাকতে চেষ্টা এবং সেই সংক্রান্ত যাবতীয় প্রতর্ককে এড়িয়ে চলে। সুশীল সমাজ কখনোই ক্ষমতার প্রশ্নে কোনোরকম ভাগ নিতে রাজি হয় না। এই সমাজ যে ধরণের প্রশ্নগুলোকে সামনে আনে তা হল মানবাধিকার। সুশীল সমাজের অধিকার অর্থাৎ Human rights, Civil liberties, bak swadhinotar অধিকার, সংগঠিত হওয়ার অধিকার, অন্যান্য খণ্ড সমাজের জন্য কিছুটা অবকাশ যেমন নারী স্বাধীনতা, সমকামীদের স্বাধীনতা, প্রতিবন্ধীদের স্বাধীনতা, জেলবন্দীদের স্বাধীনতা ইত্যাদি। তারা যে অধিকারের প্রশ্নটিকে উর্দ্ধে তুলে ধরে সেটা খণ্ডিত সমাজের খণ্ড স্বাধীনতার অধিকার।

রাজনৈতিক সমাজ বা Political Society মানুষের শ্রেণি দাবীগুলোকে নিয়ে অধিকারের ও ক্ষমতায়ণের প্রশ্নগুলোকে সামনে তুলে ধরে। রাজনৈতিক সমাজ মানে মানুষের সচেতন এবং বিশেষ করে শ্রেণী সচেতন মানুষের অধিকারের প্রশ্নে আন্দোলিত হওয়া সমাজ। বামপন্থার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বিভিন্নভাবে সমাজকে রাজনৈতিক সমাজে পরিণত করা বা মানুষকে রাজনৈতিক সচেতনতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

কমিউনিস্টরা যেমন নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান সমাজকে রাজনৈতিক সচেতনতার পথে নিয়ে গিয়ে রাজনৈতিক সমাজে পরিণত করার, শত্রুপক্ষ ঠিক সেই রকম ভাবেই অনন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যান যাতে রাজনৈতিক সমাজকে সুশীল সমাজ দিয়ে প্রতিস্তাপিত করা যায় এবং তার পর পৌর সমাজ দিয়ে আবার সুশীল সমাজের ওপর বসিয়ে দেওয়া যায়। এই দুই ধরনের প্রতিস্থাপন দিয়ে তারা রাজনীতিবিহীন এক অসচেতন ও মধ্য সমাজে পরিণত করতে চায়। এই পদ্ধতিতেই তার ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে রাজনীতির দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত করতে চায়। এটা করতে পারলেই ক্ষমতার অলিন্দের পরিবর্তনগুলো আর কখনই তাদের অসম বিনিময় পদ্ধতি ও ব্যবসায়িক শোষণের গতিপ্রকৃতিগুলোকে আর ছুঁতে পারবে না।

বিধানসভা হচ্ছে রাজ্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। প্রতিনিধি বা বিধায়কদের দায়িত্ব বা কর্তব্য হচ্ছে মানুষের অধিকারের প্রশ্নে আইন প্রণয়ন করা। বিধিমতো দেখতে গেলে বিধায়কের কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাটা মানায় না, কিন্তু আজকাল বিধায়কদের উন্নয়নের টাকা দিয়ে একটা ভ্রষ্টাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। টাকাটা বিধায়কের পৈতৃক সম্পত্তি নয়, তাই

তার উচিত টাকাটা তুলে পরিষেবায় নিয়োজিত পুরপ্রধানের হাতে দিয়ে দেওয়া এবং হয়ত তার ওপর নজরদারি রাখা, কিন্তু রাস্তাঘাট বা পানীয় জলের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা বিধায়কের কাজ নয়। একটা অদ্ভুত নিয়ম করা হয়েছে যে বিধায়কের নাকি স্বাক্ষর দরকার মানুষের পরিচয় নির্ধারণের জন্যেই এটা একেবারেই একটা অপ্রয়োজনীয় কাজ। বিধায়কের ব্যক্তিগত উপস্থিতি কোন অর্থেই প্রয়োজন পড়ে না, একটি কেন্দ্রের প্রায় দেড়লক্ষ ভোটারের ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা সই সাবুদ একজন মাত্র বিধায়ক করবেন এটা অবান্তর। এই বিশেষ প্রয়োজনগুলো আরো নিচের স্তরের আধিকারিক বা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের করা উচিত। ''কাজের মানুষ, কাছের মানুষ'' ধরনের স্লোগানগুলো আসলে বিধায়ককে রাজনৈতিক দায়দায়িত্ব থেকে সরিয়ে তাকে দিয়ে পৌর কাজ করিয়ে নেওয়ার চাল। আর এই চালকে সুষ্ঠুভাবে করার জন্যই তৈরী হয়েছে বিধায়কের উন্নয়নের ফাণ্ড। পুরোটাই অরাজনৈতিকী-করণের চালবাজি। বিধায়কের আইন প্রণয়নকারী দায়িত্ব তার নিজের রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এবার এরও ওপরে সাংসদের অধিকার দেশ ব্যাপী আরো বড় রাজনৈতিক প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করার এবং সমগ্র দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিমালা নিয়ে বিতর্ক ও আন্দোলন করার, তার বদলে বছরে দুকোটি টাকার এক অদ্ভুত খুড়োর কল বানিয়ে সাংসদদেরও এই উন্নয়নের ঘেরাটোপের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

এই বারের নির্বাচনে প্রচার মাধ্যমগুলো এবং অবুঝ বিরোধি এবং সবুঝ শাসক দলগুলো মিলে অধিকার ও রাজনৈতিক পলিসির প্রশ্নকে দূরে সরিয়ে রেখে ছেঁদো উন্নয়নের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এলো ও মানুষের মনে এটাকেই একমাত্র ভবিতব্য বলে চালালো। অসচেতন মানুষ রাজনৈতিক দলগুলোর কথাকে যতটা না গুরুত্ব দেয়, প্রচার মাধ্যমগুলোর কথাকে সর্ব্বে গুরুত্ব দেয়, তারা যা প্রচার করে মানুষ তা বিশ্বাস করে। এই যেমন এক খণ্ড জমি পাওয়ার আশায় এক কালে যারা বামফ্রন্ট বিরোধিতায় সিদ্ধহস্ত ছিলো তারা আজ বামফ্রন্ট স্তুতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। মানুষ এদের প্রচার করা ছাই পাঁশ বিশ্বাস করছে এবং এদের প্রচারের ওপর আস্থা রেখে নিজের মতামত বদলে ফেলছে। এটা অরাজনৈতিকীকরণের আর এক ধাপ।

'উন্নয়ন'-এর শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কার জন্য উন্নয়ন সেটাই শ্রেণী প্রশ্ন, কোন শ্রেণী একটি উন্নয়নের কর্মনীতি দ্বারা তাদের জীবন চর্চা ও জীবন প্রবাহের বৈষয়িক উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, তাকে উন্নয়ন বলা যায়।

অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবন প্রবাহে সরকারী লগ্নী বা সমূহিক লগ্নী বা Public investment করলে যদি cost of production (উৎপাদনের খরচ) বা cost of distribution (বিতরণের খরচ) কমে তবে তাকে উন্নয়ন বলা যায়। এটা না হলে ব্যক্তিগত স্তরে মানুষকে তার ব্যয়ভার বহন করতে হয়।

কিন্তু আবার উন্নয়নের কোনো artefact বা কোনো বিশেষ ব্যবস্থা করলে সেটা মূলতঃ সমাজের ক্ষেত্রে শ্রেণির কাজে লাগবে সেটা দ্বারা উন্নয়নের শ্রেণি বিশ্লেষণ হয়। যেমন পার্কসার্কাস থেকে খিদিরপুর উড়ালপুলে Salt Lake নিবাসী আমলাদের Writers Buildingএ পৌঁছতে সুবিধে হয় বলে ওটা আপামর জনসাধারণের বা নিম্নবিত্ত মানুষেরব জন্যে গড়া হয়নি।

এতো কিছু সত্ত্বেও উন্নয়ন সাধারণভাবে অধিকারের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে না। অধিকারের বিষয়টি আইন প্রণয়ন ও তার ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয় হতে পারে।

এবারের নির্বাচনে সব বুর্জোয়া দলগুলোর উন্নয়নের ধাঁচার বিরুদ্ধে বিপ্লবী গণতন্ত্রের স্লোগান ছিলো ''উন্নয়ন বনাম অধিকারে''র ইস্যুটি।

ঝুম চাষ এর ক্ষতিকারক প্রভাব বন্ধে সরকারী উদ্যোগ ও তার বর্তমান অবস্থা ঃ মিজোরাম'এর দুটি গ্রামের তুলনামূলক চিত্র

ড. অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

সোসিওলজিক্যাল রিসার্চ ইউনিট, আই. এস. আই

ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের আট বোনের মধ্যে মিজোরাম একটি অনন্য রাজ্য। ঝুম চাষ এই রাজ্যে প্রধান উপজীবিকার মাধ্যম হিসাবে বহুদিন যাবৎ প্রচলিত। পাহাড় ঘেরা এই রাজ্যে ঝুম চাষের ফলে প্রকৃতি পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে বলে বহু বছর যাবৎ বিভিন্ন গবেষণায় ও রিপোর্টে দেখানো হয়েছে।

সপ্তম পরিকল্পনায় এই পদ্ধতিতে চাষ কমিয়ে আনবার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। জাতীয় জমি ব্যবহার কর্মসূচীর (NLUP) আওতায় এই সমস্যাকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে বন্ধ করে দেবারও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।

কিন্তু ১১তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেখা যাচ্ছে ঝুম চাষ এখনও মিজোরামে বহাল তবিয়তেই তার জায়গাতেই অধিষ্ঠান করছে।

এই গবেষণাতে মিজোরামের দুটি পাশাপাশি গ্রামের তথ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে ঝুম চাষ বন্ধের সরকারী উদ্যোগ সংক্রান্ত কর্মসূচীর বর্তমান অবস্থা।

সুন্দরবনের ধর্মীয় জীবন (খ্রীষ্টীয় অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতক

কল্লোল দাশগুপ্ত

বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবন বা 'ম্যানগ্রোভ' অরণ্য সুন্দরবনের বিস্তার অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিস্তৃত ভূমিভাগের অংশ নিয়ে। এই অঞ্চলের ধর্মবিশ্বাস দুটি শাখায় পল্লবিত হয়েছিল উচ্চকোটির ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি লৌকিক ধর্মের আপন স্বকীয় ঐতিহ্যধারাকে বজায় রাখার মধ্য দিয়ে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে ইসলামের আগমনের পূর্বাবধি হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্যই মূলত বঙ্গদেশে দেখা যায় যার ব্যাতিক্রম সুন্দরবনের ক্ষেত্রে হয়নি। ধর্মপালের 'খালিমপুর তাম্রশাসন', লক্ষ্মণ সেনের 'বকুলতলা তাম্রশাসন' এবং 'গোবিন্দপুর তাম্রশাসন'-এ ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের প্রতি ভূমিদান সংক্রান্ত বিষয়কে যেমন স্বীকৃতি দেয় তেমনি ব্রাহ্মণগণের এই অঞ্চলে চরম উত্থানকালকে চিহ্নিত করে। 'ডাকার্নব' নামক বৌদ্ধ পুঁথি এই অঞ্চলকে বৌদ্ধ তান্ত্রিক আরাধনার চৌষট্টিটি পীঠস্থানের একটি রূপে জ্ঞাত করে। তেমনি ডোম্মনপালের 'রাক্ষসখালি তাম্রশাসন' রত্নত্রয় মহাবিহারের উল্লেখ বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চ অবস্থানকে স্বীকৃতি দেয়। মূর্তিতাত্ত্বিক নিদর্শন খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ধর্মীয় জীবনের যে স্বীকৃতি দেয় তাতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রাবল্যই এই অঞ্চলে প্রবল ছিল।

ইসলামের প্রসার সাংস্কৃতিক জীবনের বহুক্ষেত্রের ন্যায় ধর্মজীবনকেও নব-কলেবর দান করে। প্রবল দারিদ্র্য ও সামাজিকভাবে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের নিগ্রহ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই একাধারে যেমন নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন তেমনি বৌদ্ধ ও নাথপন্থীরা ইসলামকে গ্রহণ করেন। পাঠান রাজত্বের শেষপর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে এই অঞ্চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রাধান্যলাভ করে। কারণ মহাপ্রভু এই অঞ্চলের আদি গঙ্গার গতিপথেই নীলাচলে যাত্রা করে। পরবর্তীকালে পুনরায় শক্তি ও তন্ত্র সাধনার উত্থান ঘটে।

আদিম কৌম সমাজের লৌকিক ধর্মবিশ্বাস নিজ ধারায় প্রবাহিত হওয়ার সাথে উচ্চকোটির হিন্দু ও ইসলামের সাথে আত্মীকরণ ঘটেছিল। বর্নের বিপদ, বিভিন্ন ব্যাধির প্রকোপ তথা গৃহপালিত পশুর রক্ষাকর্তারূপে বহু দেব--দেবীর উত্থান ঘটে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— মাকালঠাকুর, বনবিবি, কালু রায়, দক্ষিণ রায় বা বারাঠাকুর, পঞ্চানন্দ ঠাকুর, বড়খাঁগাজী, বিশালক্ষ্মী, চেলাইচণ্ডী, হাড়িঝি প্রমুখ।

লৌকিক ধর্মবিশ্বাস পরবর্তীকালে আর অঞ্চলিক কৌম সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বিস্তৃত হয়েছে সকল বর্গের ও সম্প্রদায়ের মধ্যে। যার দ্বারাই রচিত হয়েছে এই অঞ্চলের এক সুবিস্তৃত ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসের পরিমণ্ডল।

বর্মায় সামরিক শাসন বনাম গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা

পারমিতা দাস

প্রভাষক, টি. ডি. বি. কলেজ, রানীগঞ্জ

বর্মা ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে কিছুটা সমান তালে চলেছিল। বিশেষত বর্মার উত্তর-পূর্ব প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারতবর্ষ ও বর্মার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু ১৯৩৭ এবং ১৯৬২ সালের পর থেকেই বর্মার ইতিহাস স্বতন্ত্র রূপ নেয়। ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি, আশিয়ান, ইউনাইটেড নেশনস প্রত্যেকেই বর্মায় গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণের জন্য নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বর্মা ও ভারতবর্ষের সাধারণ অতীত, ভিন্ন বর্তমান এবং বর্মায় গণতন্ত্রের ফিরে আসার সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা করা। যদিও ১৯৮৯ সালে বর্মার সামরিক সরকার বর্মার নাম মিয়ানমার করেছেন কিন্তু সেখানকার গণতন্ত্রের সমর্থকরা গ্রহণ করেন নি এই নামকরণ।

ভারতবর্ষ ও বর্মা ১৮২৪ সাল থেকে একই ধরনের রাজনৈতিক পরাধীনতা ও অর্থনৈতিক শোষণের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। লর্ড আমহার্স্টের সময় প্রথম ইঙ্গ-বর্মা যুদ্ধ হয়েছিল ১৮২৪-২৬ সালে। এরপর লর্ড ডালহৌসির সময় ১৮৪৮-৫৬ সালে পেগু অধিকার করে ব্রিটিশরা। ১৮৮৬ সালে লর্ড ডাফরিনের সময় তৃতীয় ইঙ্গবর্মা যুদ্ধের মাধ্যমে বর্মা অধিগ্রহণ সমাপ্ত হয়। ১৮৮৬ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারত ও ব্রিটিশ বর্মা একই ঔপনিবেশিক আইনের অধীনে ছিল। কিন্তু ১৯৩৭ সালের পর এই দুই দেশের ইতিহাস বা রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ ভিন্ন পথ নেয়। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর উভয় দেশই গণতান্ত্রিক ও পার্লামেন্টারি সরকার গঠন করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বর্মায় আবার সামরিক শাসন ফিরে আসে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে।

১৯৮৯ সালের নির্বাচনে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি শতকরা ৮০ ভাগ আসন লাভ করে, কিন্তু সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করে নি। ১৯৯০ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে গুন্টা নির্মমভাবে দমন করে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান বর্মাকে অর্থলগ্নী করা বন্ধ করে দেয়।

গণতান্ত্রিক অধিকার দখলের অনেকগুলি উদাহরণ রয়েছে। যেমন— বাক স্বাধীনতা রোধ, প্রায় ১৫ বছব ধরে অংসান সুকিকে গৃহ বন্দী করা। মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি। মিলিটারি শাসকদের অত্যাচারের কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া হল এখানে। ইউ হ্লা খান, এন. এল. ডির সদস্য জেলের ভিতর মারা যান সেখানকার অসহনীয় অবস্থার জন্য। ইউ মং কো জেলের ভিতর নির্মম অত্যাচারে মারা যান। ১৯৯৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক সংস্থা রেডক্রসকে স্টেট ল অ্যান্ড অর্ডার রেস্টোরেশন কাউন্সিল বর্মার ভিতরে অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এরূপ বহু অগণতান্ত্রিক শাসনের উদাহরণ এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হবে।

বর্মায় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতা ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে। এদের মধ্যে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইউনাইটেড নেশনসের নিম্ন সচিব ইব্রাহিম গামবারির বর্মায় গমন।

এই প্রবন্ধ বর্মায় বাহ্যিক শক্তির ভূমিকা ও একবিংশ শতকে সামরিক শাসকদের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করবে। এই প্রবন্ধটি প্রাথমিক ও পরবর্তী উৎসর— গবেষণার উপর ভিত্তি করে রচনা করা হবে। প্রাথমিক উৎস যেমন আত্মজীবনী, অং সান সু কির সাক্ষাৎকার ইত্যাদি ও পরবর্তী উৎস যেমন "India and Burma : Wooing the Generals" রেকে এগ্রেস্টের লেখা, "Burma and General Ne Win" মং মং-এর রচিত ইত্যাদি রচনা এই প্রবন্ধ লেখার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে।

বিশ্বায়ন— ভারতীয় নারী ও সামাজিক অসাম্য

ড. সুতপা বসু
দর্শন বিভাগ, বি. বি. কলেজ, আসানসোল

সামগ্রিক ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে সামাজিক অসাম্য প্রধানত পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত সেই বিষয়গুলো হল ঃ

(১) গ্রাম ও শহর অসাম্য।
(২) স্ত্রী-পুরুষ অসাম্য।
(৩) ক্ষমতাগত অসাম্য।
(৪) শিক্ষাগত অসাম্য।
(৫) সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য।

এই পাঁচটি বিষয় বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেকটি সামাজিক অসাম্যের রূপ ও বহিঃপ্রকাশ। একটির সাথে অন্যটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ফলে এগুলোকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমাদের দেশেও বিশ্বায়ন পরবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় সমাজে সামাজিক অসাম্যের প্রশ্নটি জনসংখ্যার অর্ধেককে প্রভাবিত করেছে (এখানে উল্লেখযোগ্য যে মোট জনসংখ্যার ৫০% নারী)।

ভারতীয় সমাজে সামগ্রিক নারী সমাজ নানাভাবে দ্বিধাবিভক্ত এবং দ্বন্দ্বাকীর্ণ। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি সুবিধেভোগী এবং সুবিধেহীন, শিক্ষিত এবং শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, নির্যাতিতা নারী সমাজ এবং তার বিপরীত দিকেই রয়েছে উগ্র আধুনিক সুবিধাভাগী অংশ, এবং কৃষির সাথে যুক্ত নারী-শ্রমিক। কর্মহীন গৃহবধূ, Supplementary labour power মহিলা শিশু-শ্রমিক ইত্যাদি। ভারতীয় নারী সমাজ বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীতে আজও দ্বিধা-বিভক্ত সামগ্রিক সমাজ কাঠামোকে প্রভাবিত করছে।

বিশ্বায়নের যুগে নারীরা আজও বিভিন্ন দিকে অবহেলিত। **সমাজে নারীরা যে শ্রম করে তা আজও অর্থনীতিতে ধরা হয় না।** নারীর সামাজিক পরিচয়ের মানদণ্ড হল তার পুনরুৎপাদনের ক্ষমতা যা বাঁধা আছে তার পরিবারের চার দেওয়ালের মধ্যে। **শিক্ষার ক্ষেত্রেও** নারীর সংখ্যা (বর্তমানে) আজও অনেক কম। **ভ্রূণ-হত্যা** ভবিষ্যৎ-এ নারীর সংখ্যাকে কোথায় নামিয়ে আনবে তা ভাবতে ভয় হয়। **রাজনীতিতেও** মহিলাদের অংশগ্রহণ কম। এর জন্য দায়ী অশিক্ষা ও পশ্চাৎপদ ভাবনা। **প্রযুক্তিগত** বিদ্যার ক্ষেত্রে নারীরা কম আসছে। শুধু এই দিকগুলোতেই নারীরা যে বঞ্চিত তা নয়, স্বাস্থ্য ও সম্মানের অধিকারী হয়ে নিরাপদভাবে বাঁচার ন্যূনতম সম্ভাবনা থেকেও নারীদের একটা বড় অংশ আজও বঞ্চিত। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের কথা আজও প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন,

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার।

অর্থাৎ সমস্ত নারী সমাজকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। সমাজে নারী পুরুষের ভেদাভেদ বা অসাম্যকে দূর করে এক সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য চাই নারীর যথার্থ আত্ম-সচেতনতা যা নারীকে দেবে যথার্থ সমানাধিকার। পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের আগামী সম্ভাবনার সার্থে যুক্ত হবার পূর্বশর্ত হিসাবেই এগুলো জরুরী। নতুবা স্বাধীনতার ৫৯ বছর পরে আজও আমরা যখন মূল্যায়নে যাই— পরবর্তী মূল্যায়নে যেন তাই না হয় তা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে। মূল সমস্যাগুলো থেকে মুখ না ফিরিয়ে জনসংখ্যার অর্ধেককে সমাজ ও জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় যুক্ত করতে হবে সামগ্রিকভাবে।

বিশ্বব্যাপী অতি উষ্ণতা

মুনমুন ব্যানার্জী

শিক্ষিকা (ভূগোল বিভাগ), দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়

দিনে সূর্যালোকের প্রভাবে পৃথিবী উষ্ণ হয় এবং রাত্রে তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হয়, এটা স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক মানুষের কাজ কর্মের ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা স্বাভাবিকের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর এই অতিরিক্ত উষ্ণতাকে বলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্বব্যাপী অতি-উষ্ণতা।

প্রযুক্তি উন্নতি, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং বায়ু দূষণের ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রীন-হাউস গ্যাসগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ পৃথিবীর উষ্ণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ্রীন হাউস প্রভাব— শীত প্রধান দেশে উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, অঙ্কুরোদ্গম প্রভৃতি রক্ষার্থে একটি বিশেষ কাঁচের ঘর নির্মাণ করা হয় যা সূর্য রশ্মিকে প্রবেশ করতে দেয় কিন্তু প্রতিফলনে বাধা সৃষ্টি করে উষ্ণতা সংরক্ষণে সহায়তা করে এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি অব্যাহত রাখে।

বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প এবং ওজোন মিলিত হয়ে যে স্তর গঠন করে তা গ্রীন হাউসের কাঁচের মত ব্যবহার করে এবং বায়ুস্তর ভেদ করে সূর্যরশ্মিকে আপতিত হতে দেয়, কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হতে দেয় না, ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ে। বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউস গ্যাসগুলি না থাকলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা হত —১৮° সেন্টিগ্রড যা জীবের জীবনধারণের পক্ষে অসম্ভব হত।

কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন গ্রীন হাউস গ্যাস যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ওজোন, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ক্লোরোফ্লুওরো কার্বন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদির পরিমাণ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে এই গ্যাসগুলি সঞ্চিত হওয়ার ফলে ওজোন স্তরর ক্রমাগত ক্ষয় পেতে থাকে এবং অবশেষে অক্সিজেন স্তরে রূপান্তরিত হতে থাকে। ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন ওজোনকে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করতে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পরিবর্তিত ওজোন বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মিকে অতি সহজেই ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছাতে দেয়, এবং কোন রশ্মিকেই প্রতিফলিত হতে না দেওয়ায় অতি দ্রুত ভূ-পৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। এটিই গ্রীন হাউস প্রভাব নামে পরিচিত।

বিশ্বব্যাপী অতি উষ্ণতার ফলাফল— বর্তমানে বায়ুমণ্ডল তথা ভূপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা ০.৩ ডিগ্রী থেকে ০.৬ ডিগ্রী হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আনুমানিক ২০৩০ সাল নাগাদ এই হার দাঁড়াবে ১.৫ ডিগ্রী থেকে ৪.৪ ডিগ্রী পর্যন্ত। যার ফল হবে মারাত্মক—

● পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলবে এবং এর ফলে সমুদ্রে জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। বিজ্ঞানীগণ আশঙ্কা করছেন আগামী শতাব্দীতে জলতলের উচ্চতা ৬ থেকে ৩৭ ইঞ্চি বৃদ্ধি পাবে ফলে ইজিপ্টের শতকরা একভাগ, নেদারল্যাণ্ডের শতকরা চার ভাগ, আমেরিকার ফ্লোরিডার শতকরা ত্রিশ শতাংশ এবং বাংলাদেশের শতকরা আঠারো ভাগ নিমজ্জিত হবে।

● মেরু অঞ্চলের তুষার ছাড়া বিভিন্ন হিমবাহ যেমন গঙ্গোত্রী গলে যাবে ফলে নদীতে জলের পরিমাণ হ্রাস পাবে ফলে কৃষিকাজ ব্যহত হবে, পানীয় জলের অভাব লক্ষ্য করা যাবে।

● উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে ঋতুগুলির সময়সীমা পরিবর্তিত ও বর্ধিত হবে, উষ্ণতার এই পরিবর্তন মানিয়ে নিতে না পেরে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী ধ্বংস হতে পারে। কৃষি পণ্যের উৎপাদনও হ্রাস পাবে।

● উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সমুদ্রের জলতল বৃদ্ধি পাবে যা একসময় নদী খাতের মধ্যে প্রবেশ করে নদীর জলকে লবণাক্ত করে দেবে ফলে কৃষি-শিল্প ও পানীয় জলের অভাব দেখা যাবে।

● উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, এনকেফেলাইটিস প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বাড়বে।

অতি উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণের উপায়— অতি উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণের জন্য বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার স্তরের ওজোনকে সুরক্ষিত করতে হবে।

● ওজোন স্তর ধ্বংসকারী ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন-এর উৎপাদন ও ব্যবহার হ্রাস করতে হবে।

● শিল্প ও পরিবহন ক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

● বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে দূষণ নিয়ন্ত্রণ।

● জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

নারী মুক্তি : রাষ্ট্র ও উন্নয়ন

ড. ভবতোষ কুণ্ডু
ইতিহাস বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন

ভারতের ন্যায় এক বহুজাতি অধ্যুষিত বিশাল দেশে নারী মুক্তি ও স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন ও সংগঠন নারী জাতির মুক্তির বিষয়ে সোচ্চার হলেও এখন এটি একটি প্রশ্ন চিহ্নের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। এর অন্যতম কারণ ভারতের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশে, বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে, সমাজ মূলত পিতৃতান্ত্রিক। এই সমাজে পুরুষদের অধিকার সুরক্ষিত, তুলনায় নারীদের অধিকার বহুলাংশে উপেক্ষিত। উনিশ শতকের বাংলার তথাকথিত নবজাগরণের সময়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ মনিষীগণ নারী স্বাধীনতা, অধিকার ও মুক্তি বিষয়ে আন্দোলন পূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারেন নি। উনিশ শতক ও বিংশ শতক পেরিয়ে একবিংশ শতকের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা কি বলতে পারি যে নারীজাতির অধিকার ও মুক্তির দিকে অগ্রসরের ঈঙ্গিত মিলেছে? Flavia Agnes Subaltern Studies Vol XI-তে একটি রচনায় লিখেছেন যে ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের ফাঁকফোঁকরের মধ্য একজন পুরুষ দ্বিতীয় বা ততোধিক বিবাহের Criminal ফলাফল এড়াতে সক্ষম এবং এক্ষেত্রে হিন্দু রমনীরা তাদের বিবাহের বৈধতা এবং ভরণপোষণ নিয়ে অথৈ জলে পড়েন। উপসংহারে তিনি লিখেছেন যে দেশের ভিতরে যখন একই ধাঁচের Civil আইনের কথা ভাবা হচ্ছে তখন Plurality of Customs এবং মেয়েদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং অধিকারের বিষয়টি যত্ন সহকারে ভাবা উচিত।

অপরদিকে মুসলিম সমাজে ধর্ষণ ও তালাকের ক্ষেত্রে শরিয়তী আইনের উল্লেখ করে মহিলাদের চরম হেনস্থা ও অপমানের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে যে মহিলাদের সম্পর্কে ধর্মের নামে যে নির্যাতন চলছে তা কি মূল কোরান বা মুসলিম ধর্মগ্রন্থের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? সুখের বিষয় যে গত নভেম্বর মাসে এই রাজ্যে 'ধর্ম মুক্ত মানববাদী মঞ্চ' নামক একটি সংস্থা শরিয়তী আইনের বিলোপ চেয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ আইন প্রণয়নের দাবি নিয়ে একটি কনভেনশন করেছে। অন্য দিকে বোম্বাইয়ে ২৬শে নভেম্বর শিয়া পার্সোনাল ল বোর্ড মহিলাদের অধিকার রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আশা করা যায় হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজেই শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের আন্দোলনের ফলে আগামী দিনে মহিলাদের অধিকার ও মুক্তির বিষয়ে রাষ্ট্রীয় আইন রচনা বিষয় উত্থাপিত হবে এবং নারী জাতির উন্নয়ন বিষয় অগ্রাধিকার পাবে।

এইচ.আই.ভি/এডস এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অবস্থান

চিন্ময় ভট্টাচার্য
কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা

রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য শ্রমশক্তির গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং এই শ্রমশক্তির মূল উৎস হল শ্রমিকেরা। এইচ. আই. ভি. সংক্রমণের ফলে যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে এই শ্রমশক্তির, যা যে কোন দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার হিসাব অনুসারে সারা পৃথিবীতে এইচ. আই. ভি. সংক্রমিত মানুষের নব্বই শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ৪৯, যে বয়সের মানুষেরা যে কোন দেশের মূল শ্রমশক্তি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা গেছে শুধুমাত্র ২০০৫ সালে সারা পৃথিবীতে ৩০ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক এইচ. আই. ভি. সংক্রমণের ফলে আংশিক বা স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। এই সংস্থা মনে করে অবিলম্বে যদি শ্রমক্ষেত্রে এইচ. আই. ভি. সংক্রমণের হার কমানো না যায় তবে ২০২০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতিসাধন হবে, যার প্রভাব পড়বে বিভিন্ন দেশের সমাজ, শিল্প, এবং অর্থনীতির উপর।

শ্রম জগতে এইচ. আই. ভি./এডস এর ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের ফলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এই বিষয়টিকে শ্রমক্ষেত্রের অন্যতম প্রধান বিষয় হিসাবে ঘোষণা করে এবং ২০০১ সালে এই বিষয়ে একটি নির্দেশিকা (Code of Practice) প্রস্তুত করে। এই নির্দেশিকার মূল নীতিগুলি হল শ্রমক্ষেত্রে এইচ. আই. ভি./এডস কে জটিল রোগ হিসাবে স্বীকার করে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে এবং সংক্রমিত শ্রমিকদের কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এইচ. আই. ভি. সংক্রমণ প্রতিরোধে শ্রমক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সাথে সাথে শ্রমিকদের এই বিষয়ে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এই সংক্রমণ সম্পর্কে শ্রমিকদের যাতে কোনরকম ভুল ধারণা না থাকে সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। একমাত্র এইচ. আই. ভি./এডস আক্রান্ত হবার কারণেই কোন শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা যাবে না।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এই নির্দেশিকা অনুসারে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার, বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দেশের শ্রমিকদের সচেতন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আমরা অবগত আছি যে বর্তমান ভারতবর্ষে সংগঠিত ক্ষেত্রের তুলনায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক সংখ্যা অনেক বেশী। সেই কারণে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা এইচ. আই. ভি./এডস সম্পর্কে কতটা সচেতন তার উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে এইচ. আই. ভি./এডস সম্পর্কে দেশের শ্রমশক্তির অবস্থান।

এই বিষয়ে ধারণা পাওয়ার জন্য হাওড়া, হুগলী, কলকাতা উত্তর চব্বিশ পরগণার অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিভিন্ন পেশায় (নির্মাণ শ্রমিক, রিক্সা চালক, বিড়ি শ্রমিক, মুটিয়া ইত্যাদি) নিযুক্ত ২০০ জন শ্রমিকদের মধ্যে একটি সমীক্ষা করা হয়।

এই সমীক্ষায় শ্রমিকদের মূলত যে প্রশ্নগুলি করা হয়, সেগুলির কয়েকটি হল— এইচ. আই. ভি./এডস সম্পর্কে তারা জানেন কিনা, এইচ. আই. ভি. সংক্রমণ কি কি কারণে হতে পারে সে বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা তাদের আছে কিনা, একই সঙ্গে কর্মরত কোন শ্রমিকের যদি এইচ. আই. ভি. সংক্রমণ হয় তবে সেই শ্রমিকের সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন আচার-আচরণ (একসঙ্গে বসে খাওয়া, কথা বলা, বসবাস করা ইত্যাদি) কেমন হবে।

সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে বেশির ভাগ শ্রমিকদের মধ্যে এইচ. আই. ভি./এডস সম্পর্কে যথাযথ বৈজ্ঞানিক ধারণার অভাব আছে। স্বাভাবিকভাবেই এইচ. আই. ভি./এডস সম্পর্কে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সঠিক চেতনা বিকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের আরও উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

মাধ্যমিক স্তরের ছেলেমেয়েদের ওপর তাদের পিতামাতার শিক্ষার মান ও পেশার গুরুত্ব

ড. রুমকী গুপ্ত
সাইকোলজি রিসার্চ ইউনিট, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট, কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। রাজ্যের খুব কম সংখ্যক ছেলেমেয়েই মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত উন্নীত হওয়ার সুযোগ পায়। বিশেষ করে যে সব পিতামাতারা শিক্ষাক্ষেত্রে এবং পেশার ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে, তাদের ছেলেমেয়েরা আরও কম সংখ্যায় এই সুযোগের সৎব্যবহার করতে পারে। সুতরাং বর্তমান তথ্যপত্রের মূল উদ্দেশ্য হল মাধ্যমিক স্তরের ছেলেমেয়েদের ওপর তাদের পিতামাত্র শিক্ষা ও পেশার গুরুত্ব বিচার করা। স্নাতক স্তরের পিতামাতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশী ভালো ফল করে। অন্য দিকে, যে সব পিতারা স্বনিয়োজিত পেশায় জড়িত, তাদের ছেলেমেয়েরা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। মায়েদের ক্ষেত্রে এই ছবি একটু অন্যরকম। যে সব মায়েরা 'প্রফেশনাল' শ্রেণীতে নথিভুক্ত হয়েছেন, তাদের ছেলেমেয়েদের কৃতিত্ব বেশী। তবে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এই ফলাফল বিভিন্ন রকমের।

মেধাসম্পদ ও সংরক্ষণের সমস্যা

ড. তুষার কান্তি ভট্টাচার্য
রিডার, দর্শন বিভাগ, আসানসোল গার্লস কলেজ

ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভারতে সংরক্ষণ জরুরী, কারণ ভারত অন্তহীন কুসংস্কার এবং সীমাহীন দারিদ্র্যে জর্জরিত একটি দেশ। এই দেশে বিপুল সংখ্যক অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের মধ্যে যাঁরা উন্নয়নকামী তাঁদের উন্নয়ন সংরক্ষণ ব্যতীত অসম্ভব। দেশের সমস্ত মানুষকে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার দিক থেকে একটা সহনীয় দূরত্বের মধ্যে আনবার একমাত্র উপায় সংরক্ষণ। কিন্তু সংরক্ষণের সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে আছে বঞ্চনার প্রশ্ন। কিছু মানুষকে সংরক্ষণের সুবিধা দিতে হলে অন্য কিছু মানুষকে বঞ্চিত হওয়ার অসুবিধা পেতেই হবে। এখানে ব্যক্তিস্বার্থ উপেক্ষা করলেও একটি জাতীয় স্বার্থের প্রশ্ন থেকেই যায়। সেটা হল, সংরক্ষণের কারণে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মেধাসম্পদের সদ্ব্যবহারের কোন সুযোগ রাষ্ট্রের হাতে থাকে না। দেশের সমস্ত নাগরিকের মেধাসম্পদ যাতে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগে তার ব্যবস্থার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সংরক্ষণ সংক্রান্ত দ্বিতীয় বড় সমস্যা হল সংরক্ষণের নীতি নির্ধারণ করা। সংরক্ষণের আওতায় কোন্ কোন্ ক্ষেত্র থাকবে, কোন্ কোন্ মানুষেরা সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন, কোন্ অবস্থা পর্যন্ত পাবেন এবং সর্বোপরি সংরক্ষণের সীমা— এই চারটি মূল বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি এমনভাবে স্থির করা প্রয়োজন যাতে সংরক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। এই জাতীয় স্বার্থ বলতে আমরা অবশ্যই বুঝব একতা এবং মানবতার স্বার্থ।

পর্যটন শিল্প ও তার প্রভাব

ডা. হিমানী ভট্টাচার্য
মনোমিতি বিভাগ, ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা, ২০৩, বি.টি. রোড, কলকাতা - ১০৮

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে পর্যটন শিল্পের অবদান অসামান্য। এই শিল্পকে কেন্দ্র করে দেশের একটি বৃহৎ অংশ তাদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে পর্যটন স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ঐ এলাকার মানুষের রুজি রোজগার ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। শুধু তাই নয়, বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজস্ব রূপকে বুঝতে হলে এই শিল্পের ব্যাপক প্রসার দরকার। বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা হয়ত দিল্লী, হরিদ্বার, কাশী, বৃন্দাবন বারবার দেখেছে কিন্তু বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। পশ্চিমবাংলার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার অন্তগত দীঘা হল একটি পর্যটন কেন্দ্র। সমীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে, ঐ পর্যটনকে কেন্দ্র করে রামনগর, আনন্দপুর, বীরকুল, চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে।

সামাজিক বিকাশে মধ্যবর্গীয় নারীদের ভূমিকা

ড: মঞ্জুলিকা গুপ্তা
চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়

গণতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজে মধ্যবর্গীয় নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যবর্গই এমন এক মেরুদণ্ড যার উপর ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, বিশ্বাস ও পরম্পরা দাঁড়িয়ে আছে। নারীই আজকের ভেঙ্গে যাওয়া পরিবারগুলোকে জোড়া লাগাতে পারে।

শ্রী রাজেন্দ্র যাদবের ''সারা আকাশ'' বইটি আমি অনেক দিন ধরে পড়াচ্ছি। এটি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদ দ্বারা স্বীকৃত পাঠ্যবই। এতে এক ''প্রভা''র চরিত্র আছে। আমি তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হই এবং গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে শ্বশুরবাড়ীতে সমস্থ বঞ্চনা, যন্ত্রণা ও কষ্ট মুখ বুজে সহ্য না করেও কিভাবে সম্পর্ক বজায় রেখেছি।

আমার ছাত্রীদের কাছে আমি আহ্বান জানাই প্রভার আদর্শে অনুপ্রাণিত হও। তোমাদের পনের জন্য যে টাকা বাবা-মা জমাচ্ছেন সেই টাকায় স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করো। আমার সাথে যোগাযোগ কর, আমি বাবা-মাদের বুঝিয়ে বলব এবং তোমাদের সাহায্য করব।

চিত্তরজন এর অবস্থান বাংলা-বিহার ঝাড়খণ্ডের সীমান্তে। এখানকার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। মেয়েরা অধিকাংশই দুর্বল শ্রেণীর। তাদের সামাজিকভাবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করি। এ কাজ করতে গিয়ে বহু অভিজ্ঞতার সাগর জমা হয়েছে, যে জন্য আমি আমার ''প্রভাদের'' কাছে কৃতজ্ঞ। সেই অভিজ্ঞতাই এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

অভিভাসন (মাইগ্রেসান) ও গ্রাম উন্নয়ন

অনিল কুমার চৌধুরী
সোসিওলজিক্যাল রিসার্চ ইউনিট, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট, রোজভিলা, গিরিডি, ঝাড়খণ্ড

এখনও অর্থনীতির নিরিখে গ্রামীন ভারতের বেশির ভাগ পরিবারের জীবনধারণের মূল উৎস হোল কৃষি বা কৃষিকাজ। আবার এদের বেশির ভাগই হোল প্রান্তিক চাষী, ছোটো চাষী, ভাগচাষী বা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক। প্রচলিত কথাটা হোল ভারতবর্ষের প্রান্তিক, ছোট চাষীরা সাধারণত মূলধনের অভাবে তাদের জমির চাষবাস ঠিকমতন করতে পারে না এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ ঠিকমতন বুঝতে চায়না, বা বুঝতে পারে না। অথচ সকলেই স্বীকার করেন, স্বাধীন ভারতের কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগের সুফল মূলত বড়চাষী ও মাঝারি চাষীরাই নিয়েছেন বা পেয়েছেন। ভারতবর্ষে এখনও বেশীর ভাগ এলাকা এক ফসলী এবং সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। ফলত দ্রারিদ্র বেশী এবং বাঁচাটা অহোরহ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে।

''চিৎমাডি' একট বহুজাতিক গ্রাম যেটা ঝাড়খণ্ড রাজ্যে, গিরিডি জেলার, বেঙ্গাবাদ ব্লকের অবস্থিত। যেখানে পনেরো বছর আগেও মানুষরা এক টুকরো ছোটো কাপড় ও দুবেলা মাড়ভাত খেয়ে কোনমতে বেঁচে থাকতো। আজ সেধু গ্রামের পরিবর্তনটা বিশেষ করে লক্ষণীয়। শুধু মাত্র দারিদ্র থেকে অভিভাসন, অভিভাসন থেকে সংস্কৃতিক আরোহন। আর তা থেকেই গ্রামের সার্বিক পরিবর্তন সূচিত হোল। আমার কাজের মধ্যেই এই প্রক্রিয়াটি দেখানোর চেষ্টা করছি।

সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রের দ্বিমুখী সমীকরণ : সমাপ্তির সম্ভাবনা নাকি সম্ভাবনার সমাপ্তি

শ্রী পরিক্ষীৎ ঠাকুর
আন্তজাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Politics বা রাজনীতি কথাটির মর্মের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে state বা রাষ্ট্র কথাটি। তাই Politcal Science-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে রাজনীতি বিষয়ের চেয়েও রাষ্ট্রবিজ্ঞান কথাটি বহুল প্রচলিত। একবিংশ শতকে এসেও বিশ্বায়ন, উদারীকরণের ছবি তুলে রাষ্ট্র নামক এই প্রতিষ্ঠানটিকে অস্বীকার করার কথা বলা হলেও মনুষ্য জীবনের নানা স্তরে রাষ্ট্রীয় উপস্থিতি দেখে মনে হয় যেন এটি একটি প্রায় চিরন্তন প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তথাকথিত আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে মাইকেল মানের মতে মাত্র তিনশ বছর আগে।

মনে রাখা প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় রাজনীতি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু তা কিন্তু একদিনে তৈরী হওয়া কোনও প্রতিষ্ঠান নয়, বরং মানুষের প্রয়োজনের স্বাপেক্ষে সমাজ ও ব্যক্তির চাহিদার বিকাশের প্রেক্ষিতে বিবর্তিত এক সাম্পতিকতম প্রতিষ্ঠান। আধুনিক রাষ্ট্র জাতিভিত্তিক ভূখণ্ডীয় অখণ্ডতার মাত্রা বিশিষ্ট রাষ্ট্র। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আধুনিক রাষ্ট্র গঠন সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙনের পটভূমিতে এবং পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল। ইউরোপে মধ্যযুগে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার কোনও ভূখণ্ডীয় বা জাতীয় সীমানা ছিল না। আধুনিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, খ্রীষ্টিয় ধর্মীয় আধিপত্যবাদের পতন, ভূখণ্ডীয় জাতিভিত্তিক পুঁজিবাদী বাজার সৃষ্টি প্রভৃতি ঘটনার আর্বিভাবের ঐতিহাসিক ফলরূপে বিচার করা প্রয়োজন।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তৃতীয় বিশ্বের একটির পর একটি সমাজে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেশীয় বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সম্মুখীন হয়ে আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের ধারণার মধ্যেই পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক সাফল্য ও রাজনৈতিক অধিপত্যের উৎস খুঁজে পেয়ে জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় প্রায় সমালোচনাহীনভাবেই স্বতন্ত্র প্রেক্ষিত থেকে আত্মীকরণ ও অনুকরণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পাশ্চাত্যের আর্থ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ছাড়াও তৃতীয় বিশ্বে ছিল একাধিক জাতিগোষ্ঠীয় স্বাতন্ত্র্যসূচক সংস্কৃতি, নৃকুলগত বৈশিষ্ট্য ও ভাষাগত ঐতিহ্য যার ফলে প্রত্যেকে একই সত্তার ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ না হয়ে স্বতন্ত্র আত্ম পরিচিতি পেতে তৎপর ছিল। যার ফলে এইসকল দেশে আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের দ্বন্দ্বপ্রসূত একটা সংকট প্রথম থেকেই ছিল। এই আত্মপরিচিতি সহ অস্তিত্বের সংকট ও জাতীয় সীমানায় অন্তর্গত অংশের কিছু জনগোষ্ঠীর প্রাপ্তিকতার অনুভব ও তার সম্মিলিত পুঁজিভূত প্রকাশই পাশচাত্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে আধুনক সন্ত্রাসবাদের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আলোচ্য প্রবন্ধে প্রথমে আমি চেষ্টা করব সন্ত্রাসবাদের উৎস কোথায়? ইতিহাস ঘাটলে বোঝা যাবে যে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে এটাকে বিভিন্ন জন বিভিন্ন লক্ষ্যে পৌছনোর উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। অভিধানিক অর্থ ধরে এর উৎস থেকে এর প্রয়োগগত শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্য কি এর অর্থকে কিভাবে বাস্তব সম্পর্কিত করা যায় সে বিষয়টিরও আলোচনা করা যেতে পারে। এরপর এর ধারণাগত তাত্ত্বিককাঠামো তুলে ধরার চেষ্টা ও সেটা করার পথে আগত প্রতিবন্ধকতার বিচারের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে যে সন্ত্রাসবাদের সর্বজনগ্রাহ্য কোনও সংজ্ঞা কি সম্ভব বা একে কোনও মতবাদ আদৌ বলা যায় কি।

এরপর রাষ্ট্র ও সন্ত্রাসের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদের স্বীকার রূপে রাষ্ট্রের ভূমিকাও যোগ বিশেষে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের ব্যবহারের দ্বিমুখী বিষয়টিও বিচার করা। তাছারা রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদ নির্মূলীকরণে কি উদ্যোগ নিচ্ছে এবং সেই উদ্যোগের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের বিমূর্ততা হেতু সমূহ সমস্যার বিষয়টিও তুলে ধরার চেষ্টা করা যেতে পারে।

সন্ত্রাসের বহুরূপতা ও তার মোকাবিলার গৃহীত কৌশলের সমস্যা মোকাবিলায় সম্ভাব্য বিকল্প কী, এবং সেই বিকল্প বাস্তবে প্রয়োগ ক্ষেত্রে সমস্যা কী এবং তার দোযহিলায় কোন ধরনের রাজনৈতিক চিন্তার ধারণাগত ও কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন সেই বিষয়টির সম্ভবতা বিষয়ে পর্যালোচনার একটি প্রয়াস করা যেতে পারে।

বিশ্বায়ন, পুঁজির পুনর্বিন্যাস ও শ্রম-পুঁজির বিরোধের নয়া রূপ

শর্মিষ্ঠা সেন
অর্থনীতি বিভাগ, শ্যামসুন্দর কলেজ, বর্ধমান

সারা পৃথিবী জুড়ে শিল্প দুনিয়ায় কর্মসংস্থান যে ভাবে কমছে ও এখনো কমে চলেছে এবং শ্রমিক সঙ্গের আন্দোলন ও অন্যান্য কার্যকলাপের পরিধি যেভাবে সঙ্কুচিত হয়ে চলেছে তা সামাজিক পরিবর্তনে শ্রমিকশ্রেণী ও তার আন্দোলনের ভূমিকাকে নানারকম প্রশ্নের সামনে এনে ফেলেছে। কারো কারো মতে শ্রমিকশ্রেণী কলেবরে যে হারে বেড়েছে শিল্প দুনিয়ায় কাজ বেড়েছে তার চেয়ে কম হারে। যার ফলে শিল্প শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্বই সঙ্কটের মুখে যারা একটা সংগঠিত শক্তি হিসাবে রুখে দাঁড়াতে পারে ধনতান্ত্রিক শোষণের

বিরুদ্ধে। সুতরাং বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তন যতই জরুরি হোক না কেন তাতে শ্রমিক শ্রেণীর কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেওয়ার সম্ভাবনা এমনকি তার প্রাসঙ্গিকতাও ক্রমহ্রাসমান।

মূলধারার অর্থনীতিবিদ্দের মতে অর্থনীতি আজ শিল্পায়নের স্তর পেরিয়ে এসে শিল্পোত্তর (post-industrial) পরিণত স্তরে উন্নীত। এতটাই পাকাপোক্ত সে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো যে পুঁজি-শ্রমের স্বার্থের অনিবার্য বিরোধ, যা থেকে পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের সম্ভাবনার সূত্রপাত যা বিভিন্ন দেশে গোটা উনবিংশ ও বিংশ শতক ধরে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তার আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা এমন আন্দোলনের আর কোন প্রয়োজনই হবে না। কেননা গত শতকের সত্তর ও আশির দশকের সঙ্কট কাটিয়ে ওটা এই নয়া-অর্থনীতিতে যেমন বাণিজ্যচক্রে বিশেষত মন্দা পর্যায়টির কোন গুরুত্ব থাকবে না— তেমনই এই অর্থব্যবস্থা পুঁজি ও শ্রম উভয়ের পক্ষেই লাভজনক হওয়ায় পুঁজি-শ্রমিকের বিরোধেরও কোন ভিত্তি থাকবে না। নিজ নিজ স্বার্থপূরণ ও সম্পূর্ণ উন্নয়নের তাগিদেই তারা পরস্পরের সহযোগিতা করবে।

অন্যদিকে ক্ষীণভাবে ভিন্ন যুক্তিচক্রকে হলেও কিছু কিছু মার্কসীয় অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য এই সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে। যাঁরা মনে করেন ধনতন্ত্রের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে তাঁদের মতেও শ্রমকে কেন্দ্র করে আর আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তোলা যাবে না। কারণ পুঁজিবাদের এই পর্যায়ে অটোমেশন ও নানারকম প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গণহারে কর্মসঙ্কোচন করেছে— অন্যদিকে মুনাফাবৃদ্ধিবর লক্ষ্যে তারা পুঁজি-বহির্ভূত সাধারণ মানুষের শ্রমিক সত্তার তুলনায় ভোক্তাসত্তাকে অনেক বেশি জাগিয়ে তুলেছে। বা ভোক্তাসত্তার উপর তাদের জোর দিতে হচ্ছে। এর ফলে পুঁজিবাদের টিকে থাকার ও মুনাফাবৃদ্ধিব উৎস সেও একসময় তা থেকে আহরিত উদ্বৃত্ত ক্রমশ তার পরিমাণ কমতে থাকবে ও পুঁজিবাদের পতন হবে। কিন্তু পুঁজি যে ভোগবাদ প্রসারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কর্মীসত্তার তুলনায় ভোক্তাসত্তার উপর জোর দিচ্ছে-এর সমর্থনে যে পরিসংখ্যান তাঁরা ব্যবহার করেছেন তা বিস্ময়করভাবে ত্রুটিপূর্ণ। যেমন আমরা জেনেছি এই তত্ত্বের সমর্থনে রিফকিন যখন তাঁর 'কাজের অবসান' বা 'End of Work' তত্ত্বটির অবতারণা করছেন আমেরিকান অর্থনীতির পটভূমিকায় তখনই নয়ের দশকের মাঝামাঝি শুধু ঐ অর্থনীতিতে চার বছরে প্রায় আশি লক্ষ নতুন কাজ বৃদ্ধি হয়েছিল।

ভূটানী উদ্বাস্তু : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

ড. রূপা কুমার বর্মন
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

স্বেচ্ছাকৃত বা বাধ্যতামূলক উচ্ছেদে রাষ্ট্রের ভূমিকা তথা সাম্প্রতিক দক্ষিণ এশিয়ার উদ্বাস্তু সমস্যার ইতিহাস। ভূটান একটি অতি পরিচিত রাষ্ট্র। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত বহু সংস্কৃতির দেশ ভূটান তার নেপালীভাষী নাগরিক তথা জনগণের স্বাভাবিক মানবাধিকার অস্বীকার করে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যার ফলে অসংখ্য নেপালী ভাষী ভূটানী স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে ভূটান ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছেন নেপাল সহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে। ভূটানী জাতিয়তাবাদ তথা ভূমিপুত্রদের (ড্রুকপা) আধিপত্য বজায় রাখার নাম করে ভূটান যে অবস্থান নিয়েছে তার আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই প্রাসঙ্গিক।

বহু নৃগোষ্ঠির সমন্বয়ে গঠিত ভূটানে নেপালীভাষীদের আগমন ঘটেছিল মূলত সস্তা শ্রমিকের যোগানদার হিসাবে। তবে ধীরে ধীরে ভূটানের পর্বতময় জলহাওয়ায় তারা নিজেদের স্থায়ী নাগরিকে পরিণত করে। কিন্তু ভূটান কোনদিনই নেপালী ভাষীদের পূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা দিতে রাজী ছিল না। এই অবস্থায় ভূটানের নেপালীভাষী জনগোষ্ঠি ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে তোলে ভূটান রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস (Bhutan State Congress)। এই কংগ্রেস ভূটানের রাজার কাছে আবেদন জানায় নেপালীভাষীদের রাজনৈতিক অধিকারের দাবী নিয়ে। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভূটান রাজকীয় সরকার 'ভূটান নাগরিক আইন', প্রণয়নের মধ্য দিয়ে নেপালী ভাষীদের নাগরিক হিসাবে মেনে নেয়। কিন্তু ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর নতুন করে আবার অসংখ্য নেপালীর আগমন ভূটানের জনবিন্যাসের বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তিত করে এমন ভাবে যে ভূটানের ভূমিপুত্রগণ সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে থাকে। ফলে ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভূটান তার নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি (জোংখা)-কে রক্ষা করার জন্য একটি নতুন নাগরিকত্বের আইন প্রণয়ন করে। নতুন নাগরিকত্ব আইন প্রয়োগের ফলে যারা ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর ভূটানে এসেছিলেন তারা ভূটানী নাগরিকত্ব হারায়। ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পর এই আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে ভূটান ফলে অসংখ্য নেপালীভাষী বাধ্য হয়ে বা স্বেচ্ছায় ভূটান ত্যাগ করে আশ্রয় নেয় নেপালের উদ্বাস্তু শিবিরে। ভূটান ও নেপালের মধ্যে ১৯৯০-এর দশক থেকে অসংখ্যবার দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হলেও ভূটানের এই উদ্বাস্তু জনগণ নেপাল তথা রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্বাস্তু হাইকমিশনের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে রয়েছে। আলোচ্য গবেষণাপত্রে ভূটানী উদ্বাস্তু সমস্যার স্বরূপ অনুধাবনের প্রয়াস করা হয়েছে।

ভারতের মানবাধিকার এবং জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মৌল অধিকার : সংবিধানভিত্তিক একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

সত্রাজিৎ ব্যানার্জী

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের স্নাতকোত্তর প্রথম বর্ষের ছাত্র

১. মানবাধিকার— এই অভিধাটি প্রাথমিকভাবে প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণাটিকে ব্যক্ত করতো। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পরিকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে মনবাধিকারে ধারণাটি নানাভাবে সংশোধিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে একাধিক স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হয়েছে।

২. প্রাচীন ভারত, বিদেশী শাসনাধীন ভারত এবং উপনিবেশিক শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতে মানবাধিকারসমূহ নানাভাবে শাসক তথা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দ্বারা সংজ্ঞায়িত, নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত (কখনও বা লঙ্ঘিত) হয়েছে।

৩. প্রত্যেক ব্যক্তির এমন কিছু আবশ্যিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রয়োজন যেগুলি (জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ-পরিচিতি, সামাজিক মর্যাদা, আয় নির্বিশেষে) তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে হিত সম্ভাবনাগুলির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটাতে এবং তার সামাজিক (বিষয়গত), আত্মিক (বিষয়ীগত) ও অন্যান্য চাহিদাসমূহের চরিতার্থতার জন্য অপরিহার্য স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে। সংক্ষেপে, একজন ব্যক্তিমানুষ হিসাবে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আবশ্যিক অধিকার হল মানবাধিকার। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, ব্যক্তির মৌল, মানবিক, অপরিহার্য, অবিচ্ছিন্ন, পর্যাপ্ত (মানুষ হিসাবে জীবন ধারণের জন্য) স্বীকৃত অধিকারই হল মানবাধিকার।

৪. সাধারণভাবে মানবাধিকারের ধারণা ব্যক্তির অত্যাবশ্যক গুণাবলীর চাহিদা সম্বলিত অধিকারসমূহ এবং ব্যক্তির অন্তর্নিহিত গুণাবলীর অভিব্যক্তি ও তার উৎকর্ষতা সাধন— এই বিপুল পরিধিসম্পন্ন হলেও জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে কেন্দ্র করেই মানবাধিকারের বিভিন্ন দিকগুলি আবর্তিত হয়। সেকারণে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে মৌল অধিকার সমূহের মধ্যে মুখ্য অধিকার (fundamental of fundamental rights) হিসাবে অভিহিত করা হয়।

৫. জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার নগর সমাজে ব্যক্তির মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের পাথেয়। ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্তির কারণ হিসাবে সুপ্রিমকোর্ট একদা ঘোষণা করে যে, ভারতে নাগরিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ, তার বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ সংবিধানিক বিধি অনুযায়ী নির্ধারিতহবে। জীবন ও বক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার ও অন্যান্য মৌল মানবাধিকার ভারতীয় সংবিধান লিপিবদ্ধ করার তাৎপর্য হল—

(ক) সংবিধানের নজরদারিতে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকারসমূহ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

(খ) পারস্পরিকভাবে সমাপতিত মৌল মানবাধিকারগুলির মোটামুটি একটা এক্তিয়ার চিহ্নিত করার উদ্যোগ, সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিবিপদ্ধ বিধিগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

৬. ভারতীয় সংবিধানে জীবন ও বক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার সংক্রান্ত উল্লেখ বহু অর্থ-সমন্বিত এবং বাস্তব প্ররিস্থিতির সাপেক্ষে এই অধিকার সমূহের গণতান্ত্রিক প্রয়োগ বহুমুখী।

জীবন ধারণ সংক্রান্ত অধিকার

জীবন-এর অর্থ কেবলমাত্র জৈবিক চাহিদা বা পশু প্রবৃত্তির শর্তসমূহ পূরণ করা নয়, তা বিদ্যমান সভ্যতার মাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ও তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা সমূহের যথাবিহিত পূর্ণাঙ্গ বিকাশের শর্তসমূহকেও বোঝায়। সুতরাং জীবনধারণের মৌল অধিকারগুলিক বিশ্লেষণ করলে সেই অধিকারের নিম্নলিখিত দিকগুলির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

- বাসস্থানের অধিকার।
- পর্যাপ্ত বেতন ও জীবিকার অধিকার।
- শিক্ষার (লাভের) অধিকার।
- (সু) স্বাস্থ্য এবং সময়মতো চিকিৎসার অধিকার।
- জীবন সংরক্ষণের দায়িত্ব।
- উপযুক্ত (দুষণমুক্ত, সংস্কৃতিক ও পরিবেশগত) পরিবেশে বসবাসের অধিকার।
- যাতায়াতের অধিকার।
- মানবিক মর্যাদাসহ জীবনধারণের অধিকার।
- আত্মহননের অধিকার।
- মৃত্যুর অধিকার।
- সুনির্দিষ্ট সময় অন্তর অসুস্থ ব্যক্তির মৃত্যুর অধিকার।
- সামাজিক নিরাপত্তা ও পরিার সংরক্ষণের অধিকার।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার

- একান্ত ব্যক্তিগত নিজস্বতা রক্ষার অধিকার।
- বিদেশ গমনের অধিকার।
- কোন চুক্তিগত দায়বদ্ধতা রক্ষার অসামর্থ্য/অক্ষমতা হেতু কারারুদ্ধ না হওয়ার অধিকার।
- কারারুদ্ধ বন্দীদের প্রতি মানবিক আচরণ প্রদর্শন।
- জেল-হাজতে নির্যাতনের প্রতিবিধানের অধিকার।
- দ্রুত বিচার-কার্য নিষ্পন্ন হওয়া।
- ন্যায়-সঙ্গত বিচারের অধিকার।
- বন্দীদের মুক্তিলাভের অধিকার।
- আইনি অনুদান লাভের অধিকার।

৭. ভারতের মতো বিপুলায়তন ও বৈচিত্র্য সমন্বিত উপমহাদেশ তথা রাষ্ট্রে বিভিন্ন মত ও পথের পার্থক্য সত্ত্বেও মানব সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যে (আর্থ-সামাজিক অসাম্যকে উপেক্ষা করে) সার্বজনিন মানবাধিকার রক্ষার প্রয়াস সংবিধানে উল্লেখিত জীবন ও বক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে এই ধরনের অধিকার সংরক্ষণ একটি সর্বার্থসাধক পদক্ষেপ হিসাবেই পরিগণিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং ধারার অন্তর্বস্তু এবং নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আদালত হিসাবে সুপ্রিমকোর্টের একাধিক সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষে মৌল এবং গণতান্ত্রিক মানবাধিকারের ভিত্তিস্বরূপ জীব॰ ও বক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে ব্যক্তি স্বার্থের অনুকূলে সংরক্ষণের জন্য সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে।

গণতন্ত্র ও উন্নয়ন— উন্নয়নশীল দেশগুলির অভিজ্ঞতা

ড. ধীরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেন্টার ফর আরবান ইকনমিক স্টাডিজ, অর্থনীতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অর্থনৈতিক প্রয়োজনীতার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রাসঙ্গিকতা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি ও পরিপূরকতার মধ্যে ব্যাপক পারস্পরিক সম্পর্কের বিচার করতে হবে। এই সম্পর্কগুলি শুধুমাত্র করণকারক (instrumental) নয় গঠনমূলকও। আর্থিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারা গুরুত্বপূর্ণভাবে নির্ভর করে প্রকাশ্য বিতর্ক এবং আলোচনার উপর আর সেই প্রক্রিয়ার নিশ্চয়তার জন্য আবশ্যক মৌলিক রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং কোন দেশের নাগরিক অধিকার অক্ষুন্ন রাখা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বৃদ্ধি উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য এবং একই সঙ্গে উন্নয়নের প্রাথমিক সহায়ক। আমরা জানি, ব্যক্তি বিশেষের সামর্থ্য অতি ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভর করে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর। অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা নানান আকারে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক সুযোগ স্বচ্ছতার আশ্বাস ও সংরক্ষণমূলক নিরাপত্তাগুলির মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতার করণকারকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা (instrumental roles of freedem)। এই সকল করণকারক অধিকার, সুযোগ এবং দাবির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই দৃঢ়। সেই সম্পর্ক বিভিন্ন পথে নিয়ে যেতে পারে। উন্নয়নের প্রক্রিয়া এই সম্পর্কগুলির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। এই ধরনের পারস্পরিক পারস্পরিক সম্পর্ক বিশিষ্ট স্বাধীনতাগুলির পরিপূরক হিসাবে বহুবিধা প্রতিষ্ঠানকে বিকশিত এবং সহযোগিতা করা প্রয়োজন— গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আইনের প্রক্রিয়া, বাজারের কাঠামো, শিক্ষা এবং সুস্বাস্থ্যের যোগান ও ব্যবস্থা, প্রচার মাধ্যম এবং অন্যান্য যোগাযোগের সুবিধা ইত্যাদি। এই বিষয়গুলিতে বেসরকারি উদ্যমের সঙ্গে সরকারি ব্যবস্থা থাকবে এং আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যথা বেসরকারী সমাজসেবী (NGO) এবং সমবায়ভিত্তিক সংস্থাগুলি। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সামর্থ্যকে সবল করার আর নিরাপদে রাখার জন্য রাষ্ট্র এবং সমাজের বিস্তৃত ভূমিকা রয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গণতন্ত্র এবং মৌলিক নাগরিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরোধিতা আসে মূলত তিনটি ভিন্ন দিক থেকে। প্রথমত দাবি করা হয় যে, এই সকল স্বাধীনতা অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকর। আমরা জানি যে, এই মতবাদের প্রবর্তক হচ্ছেন সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী Lee Kuan You। একে সংক্ষেপে "Lee thesis" বলা হয়। এই তত্ত্ব Neo-classical economists-এর তত্ত্বগুলির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত। দ্বিতীয়ত, যুক্তির খাতিরে বলা হয় যে, দরিদ্র মানুষকে যদি বাছাই করার বা পছন্দ করার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে নির্ঘাত তারা আর্থিক প্রয়োজন পূরণের প্রস্তাবকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকারের উপরে স্থান দেবে বা নির্বাচন করবে। অতএব ব্যাপারটি সুযোগ দিলেই গণতন্ত্রের বিপক্ষেই যাবে। এই দ্বিতীয় যুক্তিটি প্রথমটির পরিপূরক। তৃতীয়ত, খুব সাধারণভাবে দেখানো হয় যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার এবং গণতন্ত্র এগুলি একান্তভাবেই 'পশ্চিম'-এর দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার লাভ করে। এরা তথাকথিত 'এশীয় মূল্যবোধ'র বিপক্ষে— এই কারণে মনে করা হয় যে, শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা স্বাধীনতা ও অধিকারের চেয়ে অধিক কাম্য। যেমন ধরা যাক, সংবাদপত্রের সেন্সরশিপ শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার খাতিরে উন্নয়নশীল দেশে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, পশ্চিমে উন্নত বা উন্নত দেশে নয়। কিন্তু "Lee thesis"-টির ভিত্তি অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমিত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত— সাধারণভাবে বিভিন্ন ধরনের তথ্যের চেয়ে সাধারণভাবে কোনও আর্থিক পরিসংখ্যানের বিশ্লেষণের উপরে নয়। চিন বা দক্ষিণ কোরিয়ার উঁচু হারে অর্থনৈতিক উন্নতির থেকে ইতিবাচক ভাবে প্রমাণ দেয় না যে— এই কার্যসাধনে স্বৈরতন্ত্র (authoritiarism) আরও সক্ষম। অন্যদিকে দেখানো যায় যে, আফ্রিকা মহাদেশের বৎসওয়ানা (Botsowana) সারা পৃথিবীর দ্রুততম অর্থনৈতিক উন্নতিশীল দেশ এবং গণতন্ত্রের একটি মরুদ্যান।

পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সাফল্যে কী নীতি ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী কার্যকরী হয়েছিল সেটা আমরা এখন ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারছি। বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে এখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ''সহায়ক কৌশলগুলির'' তালিকায় আসে উন্মুক্ত প্রতিযোগীতা আর্ন্তজাতিক বাজারকে ব্যবহার, সাক্ষরতা এবং বিদ্যালয় শিক্ষার উঁচু হার, সফল ভূমিসস্কার এবং লগ্নি, রপ্তানি এবং শিল্পায়নে নানাবিধ উৎসাহদান। এগুলি যে গণতন্ত্রবিরোধী তার কোনও প্রমাণ নেই কিংবা এই সকল নীতিগুলিকে দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও চিনে বর্তমান স্বৈরতন্ত্রের সাহায্য নিতে হয়েছিল তারও কোনও প্রমাণ নেই। অর্থনৈতিক বিকাশের বিচার করতে হলে কেবলমাত্র মোট জাতীয় উৎপাদন ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রসারের অন্য কোনও নির্দেশক গণ্য করা একেবারেই উচিত হবে না। সাধারণ মানুষের জীবনধারা ও সামর্থ্যের উপরে গণতন্ত্রের প্রভাব দেখতে হবে।

গণতন্ত্র ও রাষ্ট্র

সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা

আমরা সাধারণত গণতন্ত্র বলতে যা বুঝি তার প্রাথমিক রূপ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল গ্রিক নগররাষ্ট্রে। অন্তত স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে এই জাতীয় একটা ধারণা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অথচ প্লেটো কিংবা অ্যারিষ্টটল কেউই এই নগররাষ্ট্রে ক্রীতদাসদের নূন্যতম বেঁচে থাকার অধিকারকে স্বীকার করেন নি। সেই সূত্রে স্টেসিবিয়াস কিংবা ডিমোক্রিটাস বা জিনো (Zeno) অথবা এপিকিউরাসের জীবনাদর্শ বা রাজনৈতিক দর্শন আমাদের কাছে পরিচিত নয়। যেমন ঋষি জাবালি সহ অন্যান্য লোকায়ত দার্শনিকদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে না। গণতন্ত্র মানে নিম্নবর্গ ও অন্যান্য অন্ত্যজশ্রেণীর মৌলিক অধিকারগুলির আবশ্যিক স্বীকৃতিই হলো জীবনবোধের মৌল শর্ত।

তাই কি? গণতন্ত্র হলো এক জীবনবেদ। রবীন্দ্রনাথ তাই সসীমের মধ্যে অনন্তকে পেতে চেয়েছেন। এই অধিকার চায় সকলেই। বেশভূষা, সৌখিন পারিপাট্য, সৌজন্যের সীমান পেরিয়ে যে মানুষ হাড় জিরজিরে চেহারা নিয়ে অনাগত ভবিষ্যতের অজ্ঞাত আশঙ্কায় অপেক্ষামান তার অধিকার কে দেবে? রাষ্ট্র না স্বঘোষিত শাসক? ভূমির সঙ্গে মানবতার বিচ্ছেদ, শ্রম থেকে শ্রমিকের হারিয়ে যাওয়া, চায়ের দোকানের আধন্যাঙটো শিশুটির জীবনপাঠের অকালবোধন কোন্ বেহেস্তের ইশারা দেয়? তাঁদের তো আকাশে, বাতাসে, ভূমিতে কোন অধিকার নেই। তাই বিবেকবানরা সমীক্ষা করে বলেন ঃ ওদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। সেই ধূর্জটিপ্রসাদের কথায় "তাহারা"। "তাহারা" আর "আমরা" হলো না। বিশ্ব সমাজতন্ত্র নিঃশব্দে নয়, সময়কে সাক্ষ্য রেখেই বিদায় নিল। সমাজতন্ত্রের সাহায্যে যে বিষের দহন জ্বালাকে নির্বাসিত করেছিলেন ভবিষ্যতের সন্তানেরা তাঁদের জানা ছিল না যে সমাজতন্ত্রেরও অবসান হয়। কিছু মানুষ কৌশলে সমাজতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়ে রাষ্ট্রশক্তিকে নির্বিশেষে মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর স্বার্থে কাজে লাগায়। বাকি থাকে তো স্তালিনসহ অগুন্তি শহীদের আত্মবলিদানকে অপমান করা।

সেই যজ্ঞই চলছে। বার্নাডশ জোন্ অফ্ আর্কের ওপর একটা নাটক লিখেছিলেন। তাতে জোনকে উনি সন্ত জোন্ বলে সম্মান জানিয়েছেন। এমন অসংখ্য সন্ত জোন্ অন্বেষণ করছে ভোরের পাখীকে। ভোরের পাখীরা হলো স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। ক্ষমতা ও রাষ্ট্রশক্তির বীভৎস খেলা আজ মহাকালের দোরগোড়ায় উপস্থিত হয়েছে। সেই রঙ্গমঞ্চে আর এক নাটক মঞ্চস্থ হতে চলেছে। পক্ষে মৃত্যুর ভয়াল রূপ, বিপক্ষে জীবনের স্বাধিকার ঘোষণা। গণজীবন স্বাধীনতার স্বাদ পাবার জন্য উন্মুখ। সেখান গণতন্ত্রের প্রত্যয়ী উপস্থিতি। বিশ্বজুড়ে তার অবস্থান। প্রচলিত পদ্ধতি দিয়ে নতুন পৃথিবীকে অস্বাদন করার দিন শেষ। পথকারী নতুন পথের সন্ধান করবেই। কারণ জীবনধর্মই তাই।

শিক্ষা আন্দোলন : সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে

ডাঃ অমিত চট্টোপাধ্যায়
রামকৃষ্ণনগর, সোদপুর, কলকাতা

ভারতে বিশেষত আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাচিত্র যদি আমরা বিশ্লেষণ করতে বসি তাহলে যা পাবো তা আশাব্যাঞ্জক নয়তো মোটেই বরং সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে তা এক আশংকার বিষয়।

মানবচেতনার বিকাশে শিক্ষার বিশেষ ভূমিকার কথা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারি না। এক্ষেত্রে আবার শিক্ষা নামক শব্দটার ব্যবহার অনেকক্ষেত্রেই অন্য অর্থ প্রকাশ করে। এখানে শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষা নামক শব্দটা আমাদের বৈষম্যমূলক সমাজে একটি যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে। কেননা "শিক্ষার" ভিত্তিতেই সামাজিক স্তর বিন্যাস ঘটানো হয়। শিক্ষিত মানুষ আর ভদ্রলোকদের সমীকরণ করা হয়। 'শিক্ষিত' মানুষ তার চারপাশের মানুষকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে শেখে। আর এভাবেই শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য হারিয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে শিক্ষা কী? শিক্ষা কেন? শিক্ষা কীভাবে? যেখানে অবস্থা এইরকম সেখানে আবার কারিগরী ও প্রযুক্তি শিক্ষার ব্যাপক প্রবণতা। সুতরাং প্রশ্ন করা যায় শুধুমাত্র কারিগরী ও প্রযুক্তি শিক্ষা কিংবা বিজ্ঞান শিক্ষাই যথেষ্ট? চেতনার বিকাশে ইতিহাস, ভাষা ও অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের পাঠও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আমরা শিক্ষা বলতে সাধারণত বুঝি জগত সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তুলবে, প্রশ্ন করতে সাহসী করবে, নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই খুঁজে নিতে এবং তার সত্যতা যাচাই করে নিতে উৎসাহী করবে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা অবশ্যই সমাজচেতনার সাথে যুক্ত। মানুষের সমাজকে কতটা বিশ্লেষণ করা যায়, চলতি ভাবনাগুলোকে কতটা প্রশ্ন করা যায়—এসবই শিক্ষার আসল কার্যকারীতা। চারপাশের সুবিধাজনক পরিবর্তন ঘটানোও শিক্ষার কাজ। এখন কোন পরিবর্তনটা কাম্য, কোনটা নয় সেটা বোঝাও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কিন্তু বাস্তবচিত্র আমাদের অন্য কথা বলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "প্রকৃত মানুষ" হবার শিক্ষা কোথায়? জ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে সভ্যতা আজ অনেকটাই এগোলেও আজও বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষা,

কুশিক্ষা ও অন্ধসংস্কারের শিকার। বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে কোনো নিপীড়িত শ্রেণীর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল অধিকার অর্জন এবং তার সুরক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই কারণে আমরা সভ্যতার ইতিহাসকে অন্যভাবে শিক্ষার ইতিহাসও বলতে পারি। এক্ষেত্রে শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষা মনস্তত্ত্ব খুবই জরুরী বিষয়। কারণ শিক্ষার বিষয়টা অবশ্যই একটি দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়।

এদিক থেকে দেখলে আমাদের দেশে শিক্ষার একটি ইতিহাস আছে। আমাদের গ্রামবাংলার শিক্ষাদান পদ্ধতিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য আছে। যদিও শিক্ষার সুযোগ ও অধিকার কুক্ষিগত ছিলো সমাজের উচুবর্ণের মানুষ ও সুবিধা পাওয়া গোষ্ঠীর কাছে। এটা দুঃখজনক হলেও সত্যি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলস্বরূপ জন্ম নেওয়া নব্যশ্রেণীর উত্থানের সাথে সাথে ব্রিটিশরা এদেশের Traditional knowledge কে সমূলে উৎপাটন করে চালু করল মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষা। এ শিক্ষা দেশ, মাটি ও মানুষ থেকে শিক্ষার্থীকে বিযুক্ত করে, বিযুক্ত করে নিজের চারপাশের বৃহত্তর সমাজ থেকেও। এই অবস্থায় যতই উচ্চশিক্ষার বহর ততই বিযুক্তি।

সমাজ বিপ্লব বা সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে ডাক হতে যে নিপীড়িত শ্রেণীকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করে তার অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটানোই প্রধান বা একমাত্র কাজ। কিন্তু অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে— অর্থনৈতিক বঞ্চনাই একমাত্র সত্য নয়, বঞ্চনার প্রকাশ মানবসত্ত্বার আরো অনেক গভীরে। তাই শিক্ষা ও চেতনা বিকাশের সংগ্রামও গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে। শিক্ষার সুযোগ পাওয়াটাই বড়ো কথা নয় বরং এটিকে জন্মগত মৌলিক অধিকারে পরিণত করা দরকার।

শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা আমাদের শুরু করা উচিত সেই সময় থেকে যখন ব্রিটিশরা এ দেশীয় পদ্ধতি বাতিল করে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী প্রবর্তন করল আধুনিকতারর দাবী নিয়ে। এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ জন্ম নিল বাংলার রেনেসাঁ। এই রেনেসাঁকে প্রশ্ন করা শুরু হয়েছিল সত্তর দশকের উত্তাল বাংলার যুবছাত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। যদিও নানান ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে সেইসব প্রশ্নগুলো হারিয়ে গেলো। ইউরোপের চোখ দিয়ে সব কিছু বিচার বিশ্লেষণ করার শুরু আমাদের ঐ সময় থেকেই। আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ইতিবাচক দিকগুলোকে খোঁজার কাজ থেকেও আমরা মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমাদের ঘাড়ে চেপে বসলো জীবন বিমুখ মৃত শিক্ষাব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কেড়ে নিয়ে কর্তৃত্ববাদী পদ্ধতিতে সমগ্র জনতার একটা ক্ষুদ্র সুবিধাভোগী শ্রেণীর হাতেই থেকে গেল। শিক্ষার রাজনৈতিক দর্শন গেল পাল্টিয়ে। খোয়া গেল শিক্ষার্থীর চিন্তার স্বাধীনতার অবাধ অধিকার গণতন্ত্রহীনতা গ্রাস করল সমগ্র সমাজ ও দেশকে। যে সমাজ যে রাষ্ট্র আজ আমাদের চোখের সামনে বিরাজ করছে তার বিচার বিশ্লেষণে এই মাত্রা আনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চেতনার সাথে শিক্ষার সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ঠ। আবার সমাজবিকাশে চেতনার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অবস্থানই নয় যে কোনও শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে class for itself আর class-in-itself-এর বিষয়টাও আমাদের খেয়ালে রাখা উচিত। এক্ষেত্রেও চেতনার কথা আবার চলে আসে। সুতরাং আজকের এই অন্ধকার দশা থেকে মুক্তি পেতে চেতনার গভীরতাও বিস্তারই আমাদের অবলম্বন।

এইসবের গুরুত্ব উপলব্ধি করে দেশ বিদেশের বহু চিন্তানায়ক ও শিক্ষাবিদ ও সমাজবিদ্‌রা নানারকম ভাবনাচিন্তা আলাপ-আলোচনার অবদান রেখেছেন এবং এখনও তা অব্যাহত। শুধু তাই নয় এদের মধ্যে অনেকে আবার সাধ্যমতো নিজের নিজের উদ্যোগে বিষয়গুলো প্রয়োগ করতেও চেষ্টা করেছেন।

রাষ্ট্র তার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য দিয়ে মূলত তার সেবাদাস ও সৈনিক তৈরী করে। এইভাবে সমাজের গভীরে তার আসন ক্রমশঃ স্থায়ী করে। রাষ্ট্র প্রথমে দখল করে আমাদের মগজগুলো। তারপর অন্য সবকিছু।

রাষ্ট্রের এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসন থেকে বেরিয়ে আসাটাই সার্বিক মুক্তির একমাত্র পূর্বশর্ত। সুতরাং রাষ্ট্রের আগ্রাসন থেকে শিক্ষাকেও মুক্ত করা দরকার। এজন্য দরকার সামাজিক উদ্যোগ ও প্রয়োজনীয় দর্শন। গণউদ্যোগে বিকশিত সামাজিক অন্দোলন অবস্থা পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে।

ছাত্র-যুব সমাজ সবকালে সব দেশেই যে কোনও পরিবর্তনকামী আন্দোলনের জনক। কিন্তু আমাদের দেশে সমাজের এই সংবেদনশীল ও প্রতিবাদী অংশকে প্রচলিত অবক্ষয়ী শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে নশ্বর ও কেরিয়ারের ফাঁদে আটকে রেখেছে, তাতে সমাজ সচেতনতা দুরে থাক সামান্য জীবনবোধটুকুও গড়ে উঠতে পারছে না। ফলে এই ছাত্র যুব সমাজ পঙ্গু ও বিকৃত মানসিকতার শিকার। যতটা পরিমাণে এই অবস্থা বিদ্যমান সেই পরিমাণেই সমাজের যেকোনও প্রগতি থমকে দাঁড়িয়ে আছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের সামনে আরো গভীর অন্ধকার অপেক্ষা করে আছে। তাই শিক্ষা আন্দোলন এতটাই জরুরী বিষয় আমাদের কাছে।

এখন সমস্যা হল কিভাবে এই আন্দোলনে সামিল হওয়া যায়। খুব সীমিত পরিসরে এভাবে এই আন্দোলনের সামিল হওয়া যায়।

প্রথমত দেশবিদেশের নানা মানুষজন অনেকদিন ধরে শিক্ষা সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন আবার কেউ কেউ সেইসব ভাবনা অনুসারী কিছু কিছু কাজও করেছেন। আমাদের কাজ হবে সেইসব ভাবনা ও কাজগুলোকে চর্চা করে পুরোনো অভিজ্ঞতা থেকে শেখা এবং সাথে সাথে আমাদের প্রয়োজন সাপেক্ষে শিক্ষা বিষয়ক তাত্ত্বিক বির্নিমাণ করা। শিক্ষার ইতিহাস ও দর্শনকে সঠিকভাবে বুঝতে পারলে তবেই সম্ভব বর্তমান সময়কে মাথায় রেখে কিছু কাজ ঠিক করে নিয়ে তা প্রয়োগ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যম ক্রমাগত মূল্যায়ন ও পুনঃপ্রয়োগ করে চলা।

দ্বিতীয়ত, যেসব ছাত্রছাত্রী বর্তমানে মূলস্রোতের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পাচ্ছে তাদের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক কিছু কাজ শুরু করা। এটি প্রথমদিকে মূলস্রোতের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারা হয়ে চলতে

থাকবে। এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ক্লান্ত ও হতাশ মানুষ ও শিক্ষার্থীদের মনে নতুন কিছু পাবার আকাঙ্খা তৈরী হবে। শুধুমাত্র আকাঙ্খাই নয়, এর বিকল্প যে কিছু হওয়া সম্ভব সেই ভাবনাকেও শক্তিশালী করা দরকার। এই আকাঙ্খা, স্বপ্ন ও আত্মবিশ্বাস হয়তো সুবিধা পাওয়া শ্রেণীর মধ্যেই হয়তো হয়ে উঠবে। তাদের এই হয়ে ওঠার উপর নির্ভর করবে পরবর্তী কালের আমূল পরিবর্তনের শিক্ষা আন্দোলন। সার্বিক শিক্ষা আন্দোলন কী এবং কীভাবে হতে পারে, কোথায় এর আপাত শেষ তার খুঁটিনাটি রূপরেখা কাজে না নেমে তাত্ত্বিকভাবে এখনই তৈরি করা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা বেশ জোরের সাথে বলা যায় যে এছাড়া সম্ভবত আর কোনো উপায়ও নেই।

সন্ত্রাসবাদ, রাষ্ট্র এবং আন্তঃসম্পর্ক

লতিকা সরকার

ইতিহাস বিভাগ, রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ

ভুবনায়নের একটি নেতিবাচক পরিণাম হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। এই বিশ্বগ্রামে 'সন্ত্রাসবাদ' এখন দৈনন্দিন জীবনচর্যার অঙ্গ। সন্ত্রাসবাদের অভিঘাতে একুশ শতকের পৃথিবী দোদুল্যমান। কিন্তু এই 'সন্ত্রাসবাদ'কে সংজ্ঞায়িত করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। 'সন্ত্রাসবাদ' বিষয়টি আপেক্ষিক, একপক্ষের কাছে যা 'সন্ত্রাস' হিসাবে প্রতিভাত হয়, অপরপক্ষ তার মাধ্যমেই আদর্শকে বাস্তবায়িত করেন। আবার কেউ বা এর মাধ্যমে নিছকই স্বার্থসাধন করেন।

'সন্ত্রাস' যদিও বিশ-একুশ শতকে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে এবং সন্ত্রাসের বিশ্বায়ন ঘটেছে, যুগে যুগে রাষ্ট্রব্যবস্থায় এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারত তথা বিশ্বের নানান রাষ্ট্রে ধর্মদ্বেষ ও বৈদেশিক আক্রমণের ফলস্বরূপ যে হিংসার উদ্ভব ঘটেছিল তা কখনও বা সন্ত্রাসের ছায়া, কখনও বা চূড়ান্ত সন্ত্রাস। আধুনিক যুগে সন্ত্রাসের সূচনা পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ফরাসী বিপ্লবের রক্ষাকল্পে জ্যাকেবিন দল সৃষ্ট 'সন্ত্রাস'কে। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তবর্তী কালে পরিলক্ষিত হয় ফ্যাসিস্ট ও নাৎসী পরিচালিত ভয়াবহ সংগঠিত সন্ত্রাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্বে দেখা গেছে বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম সন্ত্রাস, এক লহমায় ভূমিসাৎ হয়েছে জাপানের হিরোসিমা নাগাসাকি শহর দুটি ও লক্ষাধিক অসামরিক মানুষ।

সন্ত্রাসের উৎপত্তির মধ্য কেবল ধর্মীয় মৌলবাদেরই ভূমিকা নেই-এর পিছনে রয়েছে একদিকে যেমন শোষণ, দারিদ্র্য; অপরদিকে তেমনি দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, পরাধীনতার গ্লানি, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও অন্ধের মতো সন্ত্রাস বা প্রতি-সন্ত্রাসের অনুগামী হওয়া। আদর্শ পূরণের ক্ষেত্রে সন্ত্রাস যেমন একটি অস্ত্র, সন্ত্রাস প্রতিহত করার জন্য প্রতি-সন্ত্রাসকেও হাতিয়ার করেছে মুখোশধারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি।

সন্ত্রাসবাদ লালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা বহুমুখী। কখনও বা সে সরকারকে রক্ষার জন্য বিরোধী শক্তিগুলিকে ফ্যাসিস্ট কায়দায় ধ্বংস করে ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে যুঝবার জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আবার প্রতিবেশী দেশকে প্রতিনিয়ত অস্বস্তি এবং অশান্তিতে রাখার জন্যও সন্ত্রাস রপ্তানি করে থাকে কোনও কোনও রাষ্ট্র। সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দান, অস্ত্র সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ দেওয়াই তার পরম কর্তব্য হয়ে ওঠে। অপরপক্ষ তখন জাতীয় সংহতি ও দেশরক্ষার জন্য সন্ত্রাস-দমনের নামে প্রতি-সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে।

বিশ্বায়ন 'সন্ত্রাসবাদ'কে একটি আন্তর্জাতিক চরিত্র দান করেছে। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের ভূমিকা সমধিক। পূর্ব্বতন সোভিয়েত রাশিয়া তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্টা-কল্পে কিছু সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী তৈরী করেছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠান্ডা লড়াইয়ের কালে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদকে পূর্ণতা দিতে গিয়ে আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যেভাবে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী তৈরী করেছে নিয়ত প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র বিতরণের মাধ্যমে, তা আজ সর্ব্বজনবিদিত। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে এবং অপরাধচক্রের সঙ্গে যোগসাজসে ঘটনাচক্রে এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি আজ মহাশক্তিধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম—৯/১১ তারই প্রতিফলন।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের অভিঘাতে সমগ্র বিশ্ব উত্তাল। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে আজ সন্ত্রাসবাদের বিস্তার; নবতম সংযোজন সাইবার সন্ত্রাস। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এর প্রভাব ভয়ংকর। একে রুখতে জাতীয় অর্থের অনেকটাই অপচয় হচ্ছে অস্ত্র সংগ্রহে ও সেনা প্রশিক্ষণে। বৃহৎ রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া পরিত্রাণ নেই, এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে। আখেরে বৃহৎ রাষ্ট্রের দীর্ঘ যষ্ঠি (big stick) দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

সন্ত্রাসের বিশ্বায়িত রূপে রাষ্ট্রপুঞ্জ দেরীতে হলেও নড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে। আজ তাই সন্ত্রাসের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণই শুধু নয়— একে প্রতিহত করার নীতি নির্দ্ধারণের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের অবিরাম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কেবল রাষ্ট্রপুঞ্জই নয়, আঞ্চলিক সংগঠনগুলিও আত্মরক্ষার তাগিদে বারবার মিলিত হয়, কারণ এককভাবে সংগঠিত সন্ত্রাসের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রেও শুরু হয়েছে অদ্ভুত এক টানাপোড়েন। 'সন্ত্রাস' তাদের সাময়িকভাবে বিবাদ ভুলে ঐক্যমত হতে উদ্বুদ্ধ করে, পর মুহূর্তেই সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার অভিযোগে আর সন্দেহে সেই ঐক্যমতে বাধা সৃষ্টি করে।

সন্ত্রাসবাদের শিকড় ছড়িয়েছে অনেক গভীরে, এখন বিশ্বনিয়ন্তাদের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানানো ছাড়া গত্যন্তর নেই, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী' থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা হয়তো সম্ভব নয়, প্রতিহিংসা দিয়ে তো নয়ই, তাই সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নি।

আদিবাসী ও সাঁওতাল সমাজ : রাষ্ট্র ও উন্নয়ন

ড. ভবতোষ কুণ্ডু
ইতিহাস বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন

ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে মুন্ডা, ওঁরাও, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠী বিদ্যমান। এদের সকলের জীবনযাত্রা, সমাজ সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয় চেতনা এক নয়। সম্প্রতি সাঁওতালি সমাজ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের দেড় শত বছর পূর্তি উপলক্ষে অনেক অমার্কসীয় ও মার্কসীয় লেখক এবং নিম্নবর্গীয় ইতিহাস লেখকের ধারণাকে নস্যাৎ করে। অধ্যাপক শুচিব্রত সেন সাঁওতাল বিদ্রোহকে বর্ণ হিন্দুর বৃত্তের বাইরে এক সভ্য জনগোষ্ঠীর আন্দোলন বলে চিত্রিত করেছেন। এমনকি তিনি লিখেছেন যে সাঁওতালরা হিন্দুদের তুলনায় নিজেদেরকে উঁচু জাতের মানুষ মনে করত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে সাঁওতালদের ধর্ম তাহলে কি? তারা কি হিন্দু ধর্মের ভিতরে অথবা হিন্দু ধর্মের বাইরে অন্য ধর্ম গোষ্ঠী? বর্তমানে বিভিন্ন দল যখন একটি অভিন্ন দেওয়ানী আইনের কথা ভাবছে তখন সকলকে উদ্যোগী হতে হবে আদিবাসীদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রীয় চেতনার রূপরেখার অন্বেষণে। Hindu Elite লেখকদের রচনার উপর নির্ভর না করে সাঁওতাল বা আদিবাসী লেখকদের রচনা পাঠের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সাঁওতাল বা আদিবাসীদের লোকগাথা, সংস্কার, ঐতিহ্য, ধর্মীয় ভাষা ইত্যাদি ঐ গোষ্ঠীগুলির ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে রচনার মূল্যবান উপাদান। এ বিষয়ে অনিবার্যভাবে দ্বারস্থ হতে হবে নৃতাত্ত্বিকের নিকট।

অধ্যাপক শুচিব্রত সেন লিখেছেন যে সাঁওতালদের এক নিজস্ব সংস্কৃতি চেতনা ছিল। এক নিজস্ব রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অভ্যন্তরে এই সমতাপূর্ণ সমাজে ছিল না কোন জাতিভেদ, নারী স্বাধীনতা ছিল সুরক্ষিত এবং ভাষা শিল্প ও সঙ্গীতে ছিল এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। ভেষজ বিদ্যায় সাঁওতাল পারদর্শিতা এক স্বীকৃত সত্য আর যে পরিবেশ চেতনার ঢক্কা নিনাদে আজ চারিদিক মুখরিত, সে চেতনা সাঁওতালদের মজ্জাগত। আর জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, কৃষি, হস্তশিল্প সবেতেই বিরাজিত সাঁওতাল সভ্যতার স্বতন্ত্র অবদান। কিন্তু আজ আমরা দেখি যে সাঁওতালদের মধ্যে ডাইনি প্রথা, সাপের কামড়ে বা বিভিন্ন রোগে ঝাঁড়ফুঁক ও গাছগাছড়ার ঔষধের প্রয়োগ বিদ্যমান। তাহলে কি বর্তমান সাঁওতাল সমাজ তাদের অদি সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত? তাদের মধ্যে কি দারিদ্র ও অজ্ঞতার কারণে নানা ধরনের কুপ্রথা, কুসংস্কার ও গোঁড়ামি বাসা বেঁধেছে? এই কারণ অনুসন্ধান যেমন দরকার তেমনি ভারতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সাঁওতাল ও আদিবাসী সমাজের মধ্যে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক অগ্রগতির অলো পৌঁছাতে সচেষ্ট হতে হবে প্রগতিশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে, লেখক ও শিল্পীগণকে এবং সরকারকে।

জাতিভেদ— অতীত ও বর্তমান

বলরাম মজুমদার
বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলকাতা

সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় ভারতে জাতিভেদ প্রথা বহু পুরাতন।

যখন মানুষের বহুবিধ সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধি পেল তখনই সৃষ্টি হয় নানা ধরনের পেশার। সেই পেশাকে কেন্দ্র করে জাতিভেদ প্রথা আসে। প্রথম দিকে এই জাতিভেদ প্রথা সমাজের মানুষেব মধ্যে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করে। চাপিয়ে দেয় নিঃশব্দ শাসন। প্রচার করে নিজের পেশাকে মহান বলে। যেমন দেখি শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মীয় মানুষদের মধ্যে। তারা বলতে থাকে যারা শ্রমিক তারা অচ্ছ্যুৎ। তারা শূদ্র। যারা মাথা ঘামায়, শিক্ষা যাদের পেশা তারাই উচ্চবর্ণের। ধর্মের নামে ঘোষণা করে "চতুর্বণং ময়া সৃষ্টং" সুতরাং মেনে নাও।

সেই পুরাতন দিন থেকে আজো সমাজে ঐ পেশা ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা চলছে। সবাই সকলের বাঁচার সাহায্য নিয়েছে, অথচ ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতা বজায় রেখেছে। সাংস্কৃতিক সংঘাত সেইখানে।

এতো গেল ভারতের কথা। ইউরোপেও ধর্মের গোড়ামি, জাতিভেদের মত রক্তপাতের কারণ ছিল। ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট, সিয়া, সুন্নি, হিন্দু মুসলমান, ইহুদি ও খৃষ্টান, সাদা কালো-বহুহত্যা ও নির্যাতনের কারণ।

বর্তমানে জাতিভেদ প্রথা পেশার সঙ্গে জড়িত। একজন বিচারক, গবেষক, বণিক যে কখনই শ্রমিকদের সঙ্গে ওঠাবসা করেনা। মেলা মেশা কম।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে কিভাবে আমাদের চিন্তা করা উচিত তাই নিয়ে আলোচনা করবো।

সামাজিক সচেতনতা এবং ক্যানসার : একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ

কৌশিক রায়
সি. এন. সি. আই, কলকাতা

বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে সারা বিশ্বের মারা যায় শতাংশের হিসাবে প্রতি বৎসর প্রায় ১২ শতাংশ। উন্নতশীল দেশগুলিতে এই হিসাব হল ২.১ শতাংশ এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বা তৃতীয় বিশ্বে এই হিসাবটি হচ্ছে প্রায় ৯.৪ শতাংশ (৩.৮ মিলিয়ন)।

ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। কেবল ইহাই নহে, প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে প্রায় ৭ লক্ষ মানুষ ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এই নতুন করে ক্যানসার রোগে আক্রান্তদের সংখ্যা প্রতি বৎসর বেড়েই চলেছে। গবেষকদের মতে, ক্যানসার রোগ হওয়ার কারণ যাহাই হোক না কেন, যদি সমাজের একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে মানুষকে এই রোগ সম্বন্ধে, এই রোগ কেন হয়, কীভাবে হয়, কী কী কারণে হতে পারে, বা কোন কোন কারণগুলি এই রোগ হওয়ার পথটাকে ত্বরান্বিত করে ইত্যাদি ইত্যাদি যদি ঠিকমত অবহিত করানো যায় তাহলে অন্ততপক্ষে ৫ শতাংশ মানুষ নতুন করে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়া থেকে মুক্তি পেতে পারে।

বর্তমান এই গবেষণাপত্রে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে সত্যিই সামাজিক সচেতনতা (Social awareness) কাজটি কতটা কাজে আসতে পারে বা কাজে এসেছে। বিশেষ করে আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বল স্তরের মানুষেরা সত্যিই এইভাবে কতটা উপকৃত হতে পারে বা উপকৃত হয়েছেন— যার ফলে এই মারণ ব্যাধি থেকে কিছুটা হলেও অন্তত মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

জীবিকা এবং ক্যানসার : একটি সমীক্ষা

ডাঃ শঙ্কর কুমার নাথ
ক্যানসার বিশেষজ্ঞ, আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে নানান ধরনের নিত্য নতুন জীবিকা বা পেশার সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এর সাথে সাথেই এসেছে পেশাগত কারণে নানা ধরনের রোগ, তারমধ্যে অন্যতম রোগ হল ক্যানসার।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে কৃষি, কারখানা, খনি-শিল্প সব মিলিয়ে তৃতীয় বিশ্বে পেশাগত কারণে ক্যানসার রোগীর সংখ্যা মোট ক্যানসার রোগীর প্রায় ২০ শতাংশ। বিজ্ঞানী বা গবেষকদের মতে এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের চিত্রটাও প্রায় অনুরূপ। স্বভাবতই বিজ্ঞানীরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন এবং এখনও খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছেন যে কোন্ কোন্ বস্তুগুলি বা পদার্থগুলি ক্যানসার উৎপাদক বস্তু বা পদার্থ, যাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয় কারসিনোজেনিক বস্তু বা পদার্থ। এখানে উল্লেখ্য যে— উন্নত দেশগুলি এই সমস্ত কারসিনোজেনিক পদার্থ বা বস্তু যে সমস্ত শিল্পে পেয়েছেন, সেই সমস্ত শিল্পগুলিকে আইন করে তাদের দেশে বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের চিত্রটা আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়।

বর্তমান গবেষণা পত্রে আমরা দেখার চেষ্টা করব বা খুঁজে বের করার চেষ্টা করব যে নানান ধরনের পেশার মধ্যে বা নানান ধরনের শিল্পের মধ্যে কোনগুলি ক্যানসার রোগ হওয়ার পক্ষে অত্যন্ত বিপদজনক। সমাজের কোন শ্রেণীর মানুষেরা পেশাগত কারণে বেশি করে ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, এবং উক্ত সমস্যার সমাধানটাই বা কী হতে পারে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সংস্কৃতির সংকটে আদিবাসী সমাজ

নন্দিতা ব্যানার্জী
শিক্ষিকা, কে. এইচ স্কুল, হাওড়া

সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, ভাষা জীবনের কোনো একটা লক্ষ্য নয়। একটা লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায় অথবা একটা পদ্ধতি। ড. ম্যারেট তাঁর নৃতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে 'ভাষা' অধ্যায়ে বলেছেন যে, উপজাতীয়দের সংস্কৃতিগত ভিন্ন সমাজব্যবস্থাকে যখন সভ্য প্রভুরা পরিবর্তন করতে চান, তখন তাঁদের পক্ষে একটু সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। আদিবাসীদের সংস্কৃতিগত বা সমাজগত বৈশিষ্ট্যের সবটুকু বদলে দেওয়া খুব যথার্থ বা ন্যায্য হবে না।

প্রস্তাবিত প্রবন্ধে আদিবাসী সমাজের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তাদের ভাষাগত বিপর্যয়ের কয়েকটি অধ্যায় আলোচ্য। আদিবাসী জনগণের পক্ষে হাটে বাজারে ভারতীয় ভাষা ও অক্ষর গ্রহণ করার বস্তু। এর ফলে উপজাতীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত করা সহজসাধ্য হবে, এবং আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেও দখল সহজতর হবে। সর্বোপরি আদিবাসীদের নিজস্ব উপজাতীয় সাহিত্যের উন্নতি, উৎকর্ষ তথা ভারতীয় সাহিত্যেও আদিবাসী লেখক ও চিন্তাশীলের অকৃপণ দান গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

আস্থা ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট— উন্নয়নের সাথে, উন্নয়নের পথে

শ্রী প্রদীপ কুমার সামন্ত/ড. দিলীপ কুমার রায়
(ম্যানেজিং ট্রাষ্টি) (অনারারি ডাইরেক্টর-রিসার্চ)

সামাজিক উন্নয়নের পটভূমিকায় বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ক্রমবর্ধমান। প্রয়োজনের বিভিন্নতায় বেসরকারি সংস্থার গঠন ও আয়তন থেকে শুরু করে তার কাজের ধারা, প্রায় সর্বত্রই আছে বৈচিত্রের পরিপূর্ণতা। সমজের সেবা, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে ভারতবর্ষের পুরানো ঐতিহ্যের স্বীকৃতি সত্ত্বেও বেসরকারি সংস্থার সমাজ উন্নয়নে অংশ গ্রহণের প্রেক্ষিত বলা যায় স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময় থেকেই।

বেসরকারি সংস্থা বলতে এখানে মূলত N.G.O বা Private Voluntary Organization বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময় থেকেই সরকারি পরিকল্পনার রূপায়নে বিভিন্ন ধরনের N.G.O.রা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে আসছে। স্বাধীনতার কিছুদিন আগে থেকে ১৯৬০ সালকে যদি মাত্রা হিসাবে ধরা যায় দেখা যাবে যে পরবর্ত্তী সময়ে N.G.O. কাজকর্ম ক্রমাগত বাড়তেই থাকে, সংখ্যায় এবং কাজের ব্যপ্তিতে। দ্বিতীয় পর্যায়ের বেসরকারি উদ্যোগ উন্নয়নের ব্যাপ্তিতে এবং বিভিন্নতায় নিয়ে আসে এক নতুন মাত্রা। N.G.O.দের এই বাড়বাড়ন্তর দুটো কারণ আজও সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রথমত সরকারের যে কোন প্রকল্পই রূপায়নের ক্ষেত্রে একটা বিরাট আকার ধারণ করে এবং অনেক ধরনের সমস্যারও উদ্ভব হয়, যেটা N.G.Oদের ক্ষেত্রে হয় না। কারণ N.G.Oরা তাদের নির্দ্দিষ্ট এলাকা ধরে নিয়ে ছোট আকারে ঐ কাজটি করতে পারে, সরকারি ব্যাপকতার বাধ্যবাধকতা তাদের নেই। দ্বিতীয়ত যেহেতু N.G.O রা ছোট আকারে নির্দ্দিষ্ট-করা এলাকায় কাজ করতে পারে, সেই কারণে তারা অনেক বেশি করে মাটির সাথে, মাটির কাছাকাছি থেকে কাজ করবার সুবিধা পেয়ে যায়।

বিগত ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্য্যন্ত ভারত সরকার এই সমস্ত বেসরকারি উদ্যোগগুলি নিয়ে সেরকম ভাবে কোন চিন্তাভাবনাই করেনি। এমনকি N.G.O-দের অস্তিত্বেরও সেভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজনও পড়েনি। কিন্তু ভারত সরকার যে N.G.O নিয়ে, তাদের উদ্যোগ নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তাভাবনা করে আসছেন তার প্রথম প্রকাশ পাওয়া গেল ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০-১৯৮৫), যেখানে সরকার মনে করছেন N.G.O রা সরকারি উন্নয়নের সাথে উন্নয়নের পথে নতুন নতুন লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। সরকার সরাসরি তাদের জন্যে কতগুলি কাজের এলাকা নির্ধারণও করে দিয়েছিলেন। বয়সে নবীন 'আস্থা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট' এই মূহুর্তে তিনটি প্রকল্প নিয়ে উন্নয়নের পথে চলতে শুরু করেছে, বৃদ্ধাবাস প্রকল্প, পরিবেশ শিক্ষা প্রকল্প ও সংগ্রহশালা প্রকল্প।

রাষ্ট্র, সমাজ ও সুন্দরবনের মৎস্যজীবী সম্প্রদায় : একটি পর্যালোচনা

ড. সুবর্ণ কুমার দাস
অধ্যাপক, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সুন্দরবনের জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ বৃহত্তর সুন্দরবনের নদী, খাঁড়ি ও মোহনায় মৎস্যশিকারের উপর নির্ভরশীল। এখানকার জেলিয়া কৈবর্ত্য, মালো ও রাজবংশী সম্প্রদায় বংশানুক্রমে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। এঁরা 'জেলে' নামে অধিক পরিচিত। দেশভাগের পর উদ্বাস্তু হয়ে (Marginalized) ভারতীয় সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করেছে। বেশিরভাগ মৎস্যজীবী ওপার বাংলার যশোর খুলনা থেকে এসেছে। চাষবাস অপেক্ষা মাছ শিকারের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে এরা বেশি আগ্রহী। নদীর ধারে খাস জমিতে বসবাস করার জন্য এদের জীবন নদী মাটি ও অরণ্যকেন্দ্রিক। মাছ শিকার ছাড়া অন্য জীবিকার ক্ষেত্রে এদের আগ্রহ ও দক্ষতার অভাব নিজেরাই স্বীকার করে। ভারতীয় সুন্দরবনের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ মৎস্যশিকার পেশার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত। এই মৎস্যজীবিদের একটা অংশ নদীতে বাগদা পোনা ধরে। বাগদা পোনা ধরতে গিয়ে অনেক মৎস্যজীবী বাঘ ও কুমিরের পেটে চলে যায়। তার সঠিক হিসাব সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে রাখা সম্ভব হয় না। জীবনের অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে অনেক মৎস্যজীবি জঙ্গলে সমুদ্র-মোহনায় ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। সুন্দরবনের মৎস্যজীবিরা জঙ্গলের বাঘ, নদীর কুমির, কামোটের থেকে জলদস্যুদের বেশি ভয় পায়। জলদস্যু সুন্দরবনের মৎস্যজীবিদের কাছে একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা। মৎস্যজীবিরা পুরনো ও নতুন পদ্ধতিতে মাছ শিকার করে। সাবেকী যন্ত্রচালিত নৌকা তারা মাছ শিকারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। তবে মৎস্যশিল্পের বিকাশ ভারতীয় সুন্দরবনে সে অর্থে গড়ে ওঠেনি। আর্থ-সামাজিক দিক থেকে ভারতীয় সুন্দরবনের মৎস্যজীবিরা আজও অনেক পিছিয়ে আছে। মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের অসুবিধার জন্য সরকারী পদক্ষেপের বেশ কিছু দুর্বলতা আছে। মৎস্য শিকার একটি অর্থকরী পেশা হলেও এর সুফলের সিংহভাগ ভোগ করে আড়তদার। নদী-নির্ভর মানুষেব জীবনে এ এক বড় অভিশাপ। সমরেশ বসু তাঁর 'গঙ্গা' উপন্যাসে মহাজনের শোষণের এক নিখুঁত ছবি এঁকেছেন। অনেক সময় মৎস্যজীবিরা ভুলবশত বা লোভে পড়ে, কোর এলাকায় ঢুকে জল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। মনোজ বসু 'জলজঙ্গল' উপন্যাসে এ রকম একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে সুন্দরবনের মৎস্যজীবিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরা এবং রাষ্ট্র ও সমাজের ভূমিকা কী তা মূল আলোচ্য বিষয়।

তথ্য জানার অধিকার, স্বচ্ছতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা : একটি আলোচনামূলক বিশ্লেষণ

ড. প্রভাত কুমার মণ্ডল
রিডার পলিটিক্যাল সায়েন্স, দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ, দুর্গাপুর

আমরা জানি যে, গত ১২ই অক্টোবর, ২০০৫ সালে ভারতবর্ষে তথ্য জানার অধিকারকে এক ধরনের মৌলিক অধিকার হিসাবে তথ্য আইন রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের মত এরূপ একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের আইনের সবদিক থেকেই অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। এই আইন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে কার্যকর করা গেলে ভারতবর্ষের বুক থেকে অনেক রকম দুর্নীতিই অবলুপ্ত করা যাবে যার ফলে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক কাঠামো আরও মজবুত হবে এবং আপামর সব দিক থেকেই অনেক বেশি লাভবান হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, যেহেতু ভারতবর্ষের জনগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটের মাধ্যমে জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন যাঁরা কিনা পরবর্তীতে সমগ্র দেশ পরিচালনা করেন। তাই জনগণের অধিকার আছে এই সমস্ত নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা কখন, কোথায় কিভাবে, কাদের জন্য কাজ-কর্ম করছেন, তা জানার।

কিন্তু এই আইন বিফলে যাবে যদি না আমরা অর্থাৎ ভাল মন্দ পরিষ্কার ভাবে না জানেন যে এই আইনটা কী, কী এর স্বরূপ, এই আইনে কী বলা আছে। এই আইনের ফলে কে কার কাছে কতটা দায়বদ্ধ। সর্বোপরি গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায় এইসব সম্বন্ধে জনগণের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা প্রয়োজন, তবেই এই আইনের উদ্দেশ্য ফলপ্রসু হবে।

বর্তমান এই গবেষণা পত্রে, আমরা বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করব যে, তথ্য-জানার অধিকার বলতে কি বোঝায়। কোন্ কোন্ তথ্য জানার অধিকার দেওয়া আছে এই আইনে। সমাজের কোন্ কোন্ অংশের বা স্তরের তথ্য জানার অধিকার কাদেরই বা আছে। তথ্য-জানার অধিকার এর দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি প্রেক্ষাপটটাই বা কী, যার দ্বারা দেশের জনগণ এবং সমগ্র দেশ একই সাথে সবদিক থেকে লাভবান হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

শস্য রক্ষাকারী পতঙ্গের ব্যবহার এবং গুরুত্ব : একটি আর্থ-সামাজিক পরিবেশগত বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা

পরিমিতা গুপ্তা/এস. এম. সামিম
পি.জি. ডিপার্টমেন্ট অব জুওলোজি, রাঁচি ইউনিভার্সিটি, রাঁচি

ভারতবর্ষের সবুজ বিপ্লবের ফলে, তাৎক্ষণিকভাবে আমরা হয়তো শস্য-উৎপাদনের দিক থেকে কিছুটা লাভবান হয়েছি কিন্তু তার ফলে আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত ভাবে যে মূল্য আমাদের দিতে হয়েছে, তার মাশুল আজও আমাদের দিতে হচ্ছে। সবুজ বিপ্লব করার জন্য বা অধিক ফলনের জন্য যেসব বৈশিষ্ট্য আমাদের মেনে চলতে হয়েছিল এবং এখনও কিছু কিছু জায়গায় মেনে চলতে হচ্ছে সেগুলির মধ্যে অন্যতম কিছু হল উন্নত ধরনের শংকর বীজের ব্যবহার, কৃত্রিম ভাবে (মাটির নীচ থেকে) সেচের ব্যবস্থা, রাসায়নিক সারের ব্যবহার, রাসায়নিক কীটনাশক পদার্থের ব্যবহার এবং একই জমিতে বারংবার চাযের ব্যবহার করার রীতি। কৃষিক্ষেত্রে উক্ত পদ্ধতিতে এই ব্যয়বহুল চাযবাস চালিয়ে যাওয়ার ফলে আজ সেইসব কৃষিজমি হয়েছে অনুর্বর, বালুকাময়, আশেপাশের পরিবেশ হয়েছে প্রচণ্ডভাবে দূষিত, নানান ধরনের ছোটো বড় উপকারী প্রজাতির জীবের অবলুপ্তি, সর্বোপরি যে মানুষের জন্য অধিক ফলন, সেই মানুষই আক্রান্ত হয়েছে নানান ধধরনের নতুন নতুন রোগে এবং কিছু সময়ে আর্থ-সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত। যার চরম উদাহরণ হচ্ছে, সবুজ বিপ্লবের আঁতুড়ঘর পাঞ্জাবে— বর্তমানে পাঞ্জাবে একর প্রতি গমের উৎপাদনশীলতা আজ পূর্ব ভারতের অনেক রাজ্যের থেকেই কম।

এমতবস্থায়, কৃষি বিজ্ঞানীরা এবং জীব বিজ্ঞানীরা ভারতে শুরু করেছেন যতটা বেশি সম্ভব প্রাকৃতিক ভাবে চায-বাস করার জন্যে। এরই ফলস্বরূপ ভাবা হচ্ছে এবং গবেষণা চলছে শস্য-ধ্বংসকারী কীটদেরকে প্রাকৃতিকভাবে অন্য প্রজাতির পতঙ্গ দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে ধ্বংস করার। গবেষণকদের মতে যা অবশ্যই সম্ভব।

বর্তমান এই গবেষণাপত্রে আমরা দেখাব যে, ঐ সমস্ত শস্য-ধ্বংসকারী কীটদেরকে অন্য আর এক ধরনের প্রজাতির পতঙ্গের দ্বারা প্রতিরোধ করা যায়। যার ফলে, অর্থনৈতিকভাবে, পরিবেশগতভাবে এবং সামাজিকভাবেও আমরা অনেক বেশি লাভবান হতে পারি। আমরা আরও দেখব ঠিক কোন কোন প্রজাতির পতঙ্গ শস্য ধ্বংসকারী কীটদের প্রতিরোধ করতে পারে। এই ধরনের প্রতিরোধকারী বা উপকারী পতঙ্গদের কীভাবে বেশি বেশি করে বংশ বৃদ্ধি করানো যায় তাও দেখার চেষ্টা করা হবে। যেমন এই সব উপকারী পতঙ্গদের মধ্যে একটি প্রজাতি হল **হাইমেনোপটেরাস চালর্সিড**। আমরা এটাও দেখব কি ভবে কত বেশি বেশি করে শস্য ধ্বংসকারী বা অপকারী কীটদের চিহ্নিত করা যায়, তা নাহলে এদের প্রতিরোধ করার জন্যে উপকারী পতঙ্গদের আমরা চিহ্নিত করতে পারব না। যার ফলে এই প্রাকৃতিক ভাবে কাজ করার পদ্ধতিটাই বিফল হয়ে যাবে।

ভারতের অভিশপ্ত ব্রাহ্মণ্য ধারা এবং অবৈজ্ঞানিক জাতিভেদ প্রথা : একটি বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষা

ড. তীর্থংকর ঘোষ
সোসিওলজিক্যাল রিসার্চ ইউনিট, (আই. এস. আই.), কলকাতা

ভারতবর্ষের সংবিধান জাতি ব্যবস্থা বা জাতিভেদ প্রথাকে স্বীকার করেনি। এমনকি এটাও বলা আছে এবং নির্দেশ দেওয়া আছে যে, কেউ যদি উক্ত ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে বা ব্যবহার করে তাহলে তা আইনত দণ্ডনীয়। সংবিধানের যে সমস্ত ধারায় এবং উপধারায় এগুলি বলা আছে সেগুলি হল যথাক্রমে—

৩৩০ নং, ৩৩২ নং, ১৫(২) (৪) নং, ২৯ নং, ২৯(২) নং, ১৬(৪) নং, ৩৫ নং, ১৪৪ নং, ৩২০(৪) নং, ৩৩৩ নং এবং ৩৩৫ নং (সূত্রঃ ঘনশ্যাম সাউ, ২০০২, কাস্ট এন্ড ডেমোক্রেটিক পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়া)। তবুও বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় ৩৫০-এর বেশি জাতি আছে এবং ৩০০০ এর বেশি উপজাতি আছে। উক্ত জাতির মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে, প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষ অশিক্ষিত, এবং প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। (সূত্র : কে. এস. সিং, ১৯৯৯, পিপল ইন ইন্ডিয়া)

অতএব যদিও আমাদের সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া আছে যে ঐতিহাসিক ভাবে যে সমস্ত জাতির মানুষেরা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে পিছিয়ে আছে তাদের সব রকম ভাবে সাহায্য করতে হবে। যার জন্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে বা হচ্ছে। তবুও পূর্বের চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে এখনও পর্যন্ত ঐ সমস্ত নিচু জাতির মানুষেরা কিভাবে পিছিয়ে আছে এবং সব দিক থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে।

বর্তমান এই গবেষণা পত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা আমরা দেখার চেষ্টা করব বা বৈজ্ঞানিক ভবে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব যে কেন, কীভাবে, কাদের দ্বারা আজও ভারতবর্ষের বুকে একটি অবৈজ্ঞানিক ব্রাহ্মণ্যধারা রয়ে চলেছে। কিভাবে আজও অমানবিক, অনৈতিক জাতিভেদ প্রথা সমাজের বুকে বিরাজ করেছে এবং সব দিক দিয়েই সমাজকে একটা অচলায়তনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যা এই একবিংশ শতাব্দীতে কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

রাষ্ট্র ও সন্ত্রাস

সুজিত কুমার পাঁজা
অধ্যাপক, আসানসোল গার্লস কলেজ, আসানসোল

(ক)

"Oh Liberty! What crimes are committed in thy name." ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বের সময় (১৭৯৩-১৭৯৪) ম্যাডাম রোলাডেগু গিলোটিনে মস্তক দেবার সময় একটা স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি দেখে চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন কথাগুলো। রোবসপীয়ারের নেতৃত্বে ফরাসী রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকদের অবাধ নিধনযজ্ঞের সময়কালকে সন্ত্রাসের রাজত্ব বলে। 'টেরার' (terror) শব্দটি থেকেই টেররিজম বা টেররিস্ট শব্দটির উদ্ভব। উনিশশো চুরাশি সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সচিব জর্জ সুলটজ বলেছিলেন, "সন্ত্রাস হচ্ছে আধুনিক বর্বরতা', সন্ত্রাস হচ্ছে এক ধরনের হামলা, পশ্চিমী সভ্যতা ও মূল্যবোধের জন্য হুমকির আরেক নাম হচ্ছে সন্ত্রাস। অকসফোর্ড অভিধান অনুসারে, সন্ত্রাস মানে ভয়াবহ আতঙ্ক। আর সন্ত্রাসবাদ হল জনগণের উপর ভয়ংকর আক্রমণ চালানো অথবা আক্রমণের হুমকি দেওয়া, মূলত রাজনৈতিক কারণে। সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতিকে বলে সন্ত্রাসবাদ।

(খ)

সন্ত্রাসবাদের ধারণাটি কিন্তু আপেক্ষিক। ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে একদল ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ইংরেজদের চোখে ছিলেন সন্ত্রাসবাদী, আর ভারতীয়রা তাঁদের বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী বলে ভূষিত করেছেন। ওসামা বিন লাদেন আজ আমেরিকার কাছে টেররিস্ট, কিন্তু জর্জ বুশের পিতৃদেব তাঁকে একদা 'Our moral founding father' বলে কাঁধে হাত রেখে হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। আসলে রাষ্ট্রের বৈধ ক্ষমতার বিরুদ্ধে তার আইন কানুন, পুলিশী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যদি কেউ বা কারা চ্যালেঞ্জ জানায় তখনই সে সন্ত্রাসবাদী, আর তার কার্যকলাপ হল সন্ত্রাসবাদ। ভারতে পোটা (POTA) আইনে বলা হয়েছে "Terrorist is one who does terrorist activities." শোষণ আর তীব্র বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যখন মানুষ গণতান্ত্রিক পথে বা সাংবিধানিক পদ্ধতিতে কোন সুরাহা করতে পারে না, তখন একদম বাধ্য হয়েই তারা অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। যারা বিনা বিচারে শাস্তি ভোগ করে, যারা সমিহীন দারিদ্র্যের মধ্যে নিমজ্জিত, ভুখা মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে নিদারুণ কষ্ট সহ্য

করতে করতে যাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, যাদের সামনে ভবিষ্যৎ বলে কিছুই নেই — তারাই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে নাম লেখায়। মানববোমা হিসাবে ব্যবহৃত হতেও তাদের বুক কাঁপে না। আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, কাশ্মীর, কামতাপুরী এমনকি পশ্চিমবাংলার জনযুদ্ধ গোষ্ঠী সম্পর্কেও একই কথা খাটে। এর সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্ত হয় রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যাপারে এক ধরনের 'ফলস কনশাসনেস' (false consciousness), যেমনটা নাকি ঘটেছিল চীনের তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারে।

(গ)

সন্ত্রাসের প্রকারভেদ আছে। সন্ত্রাসের ক্ষেত্র এবং তার ভয়াবহতার গভীরতার উপর ভিত্তি করে সন্ত্রাসকে কয়েকটি ভাগে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়, যেমন— রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, ধর্মীয় সন্ত্রাস, বর্ণবাদী সন্ত্রাস, বেসরকারী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সন্ত্রাস, কিংবা যৌন সন্ত্রাস বা লিঙ্গ ভেদে সন্ত্রাস (যেখানে নারীর যোনিকে আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেওয়া হয়, নারীর শরীরকে পণ্য হিসাবে দেখানো হয়, কিংবা গোষ্ঠীর শুদ্ধতার নামে মেয়েদের উপর নানা ধরনের ফতোয়া চাপিয়ে দেওয়া হয়)। কিন্তু পৃথিবীর এযাবৎকালের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ংকর সন্ত্রাসটির নাম 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস'। রাষ্ট্রীয় সংগঠন, তার পুলিশ আর মিলিটারি বাহিনী দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে মানুষ খুন করতে পারে, তার সাথে অন্যান্য সন্ত্রাসবাদীদের তুলনা চলেনা। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস-এর বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে কিংবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার খাতিরে রাষ্ট্র যে কোন ধরনের অন্যায় অবিচার — যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলেই সে সন্ত্রাসবাদী কিংবা দেশদ্রোহী। এই দুটে 'স্টিগমা' রাষ্ট্র সহজেই যে কারোর উপরে সাঁটিয়ে দিতে পারে। ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা আর কাশীপুর বন্দুক তৈরির কারখানায় কেন্দ্রীয় সি.আর.পি.এফ বাহিনী ধর্মঘটী শ্রমিকশ্রেণীর উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করেছিলে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে। ১৯৭৫ সালে ভারতে জরুরী অবস্থার সময় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। 'রাষ্ট্র মানেই সন্ত্রাস' — এহেন একটা ধারণা নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিক প্রুধোঁ কিংবা মাইকেল বাকুনিনও করে গেছেন। তাই অশুভ রাষ্ট্রশক্তির উৎখাতই বাঞ্ছনীয়।

(ঘ)

রাষ্ট্র যে সদর্প সন্ত্রাস চালায়, একসাথে যত মানুষকে খুন করতে পারে, বোধহয় ততটা আর কেউ পারে না। বিগত কয়েকমাসে ফিলিস্তানী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন যত মানুষ খুন করেছে তার চেয়ে চার গুণ বেশি মানুষ খুন করেছে ইজরায়েলী রাষ্ট্র। অতীতে ব্রিটিশ সরকার যত আইরিশ বা ভারতীয় হত্যা করেছিল, সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে বিখ্যাত আই.আর.এ আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি অথবা আজাদ হিন্দ ফৌজ ব্রিটিশ হত্যা তত করেনি। পি.এল.ও, আই.আর.এ জার্মানির বাদের মেইনহফ, ইতালির রেড ব্রিগেড, কুর্দিস্থানের পি.কে.কে ইত্যাদি সংন্ত্রাসী সংগঠন যত মানুষ হত্যা করেছে, তার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি করেছে বিভিন্ন সন্ত্রাসী রাষ্ট্র — আর্জেন্টিনায়, ব্রাজিলে, চিলিতে, ইন্দোনেশিয়ায়।

(ঙ)

বলা হয়ে থাকে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে কুৎসিততম সন্ত্রাসবাদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর তারই সহোদর ভাই ব্রিটেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ শানিত করে চলেছে। সাম্প্রতিক কালে ইরাকের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হুসেনকে যেরূপ সুপরিকল্পিতভাবে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়েছে তা অভাবনীয়। ইরাক, আফগানিস্তান, চেচনিয়া সর্বত্রই এই সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাস চলছে।

(চ)

প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতে কিংবা আমাদের নিজ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও কি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চলছে? বাতাসে বারুদের গন্ধ, পথে ঘাটে তরুণের তাজা রক্ত, অধিকার রক্ষার লড়াই-এ বুলেটের সামনে খোলা বুক, তথাকথিত প্রগতির নামে ধিক্কার — এ সবই কি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই! উত্তর খুঁজতে, ভারতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে উঁকিঝুঁকি — সমাজ বিজ্ঞানের এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে চালিয়ে যাব

ঋণস্বীকার : (১) 'সময়ের আরশি' পত্রিকা, জানুয়ারি ২০০৫।
(২) তসলিমা নাসরিন — সন্ত্রাস কাকে বলে প্রবন্ধ থেকে।

রিক্সাওয়ালা : কলকাতা মহানগরের একটি প্রান্তিক গোষ্ঠির সামাজিক অবস্থা

শোভন চক্রবর্তী
ড. আম্বেদকর চেয়ার গবেষক, নৃতত্ত্ব বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা মহানগরের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজের উপরের পরিকাঠামো ধরে রেখেছে যে আভ্যন্তরীণ কাঠামো তারা হল কায়িক শ্রমজীবী মানুষ। এদের আমরা বলি দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ। তাদের বৃত্তিগত সার্বিক সংখ্যা আমাদের সঠিক জানা নেই। কলকাতা মহানগরের জীবনযাত্রায় আমাদের প্রতি পদক্ষেপেই প্রয়োজন হয় এই শ্রমজীবী মানুষদের। কিন্তু এদের কথা চিন্তা করার সময় আমরা কতটুকু পাই? এরা প্রকৃত অর্থে শ্রমের বিনিময়ে উপার্জন করেন। যেদিন অক্ষম হন সেদিন তাদের জন্য অপেক্ষা করে রোগযন্ত্রণা, অনাহার আর অপুষ্টি। সামান্য একটু বাসস্থান, যার মধ্যে নেই সুস্থ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নেই সন্তানদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, নেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ। আমার নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা থেকে এই কায়িক পরিশ্রমজীবীদের সামাজিক অবস্থা এবং তাদের সমস্যাগুলি জনসমক্ষে তুলে ধরে এদের উন্নতির পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এই শ্রমজীবী গোষ্ঠিগুলির মধ্যে আমি একটি গোষ্ঠিকে বেছে নিয়েছি যাদের বলা হয় সাইকেল রিক্সাওয়ালা। সাইকেল রিক্সা কলকাতা মহানগরীর বুকে একটি দূষণ বিহীন পরিবহন ব্যবস্থা। এই মহানগরীর গলিপথে এবং আভ্যন্তরীণ রাস্তায় রিক্সাই একমাত্র পরিবহন যা স্থানীয় মানুষ ঘোর বর্ষা থেকে তীব্র দাবদাহে ব্যবহার করে। বর্তমান নিবন্ধেসাইকেল রিক্সাওয়ালাদের সামাজিক অবস্থান ও অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় শিক্ষা

অনিতা চৌধুরী
অধ্যাপিকা, স্যার গুরুদাস মহাবিদ্যালয় (শিক্ষা বিভাগ)

আমরা রবীন্দ্রনাথকে 'সম্পদে সঙ্কটে' স্মরণ করি। আনন্দ বেদনায় তাঁর গান বা কবিতার চরণকে আশ্রয় করি। ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক হিসাবে নির্ভর করি। শুধু উদ্ধৃতি নয়, জীবনচর্চা ও যাপনে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরতে হবে সবিস্তারে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা যাঁর ঈশ্বর প্রেমকে ছাপিয়ে গেছে সেই মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের মূল্যবোধকে এই পণ্য সর্বস্ব, ধনবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার কথা পৌঁছে দিতে হবে মানুষের কাছে।

কাল মহাকাল নামক দক্ষ কারিগরের প্রভাব তথা যুগের চাহিদা, রীতিনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সামগ্রিক পরিবেশে আঁচর কাটে স্বাভাবিক নিয়মে। ভারতের স্বাধীনতার এত বছর অতিক্রান্ত হবার পরও আধুনিক মতবাদে বিশ্বাসী কোন শিক্ষাবিদ্ বা মনোবিদ্ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্র শিক্ষা ধারণা সমূহের এত স্পষ্ট সোচ্চার উচ্চারণে দ্বিধান্বিত হতেই পারেন। সত্যদ্রষ্টা ঋষির সমস্ত কথা সত্য হয়ে বারে বারে আত্মপ্রকাশ করছে।

দেশের সীমাহীন নিরক্ষরতার বেদনা কবি হৃদয়কে যে আঘাত করেছিল 'শিক্ষা সংস্কার' প্রবন্ধে ১৯০৬ সালে সবিস্তারে উল্লেখ করেছিলেন। 'স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধেও একই ধরনের মর্মবেদনার প্রকাশ।

১৯৩০ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ ওই দেশের শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নতি প্রত্যক্ষ করে যেভাবে উৎফুল্ল হয়েছিলেন সে কথা 'রাশিয়ার চিঠিতে' তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, ''রাশিয়ায় এসেছি — না হলে এ জন্মের তীর্থ দর্শন — অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। এরা জেনেছে, অশক্তকে শক্তি দেবার একটি মাত্র উপায় শিক্ষা — অন্ন, স্বাস্থ্য, শান্তি — সমস্তই এরই পরে নির্ভর করে।''

শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পাঠদান পদ্ধতি নিরীক্ষণ করে করিগুরু 'শিক্ষা প্রসঙ্গে অভিমত' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ''অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমন কি উপাধি পায় — অথচ বিদ্যা পায় না। কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে। আমাদের শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়া চলিলাম। শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না। যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত, তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।''

স্ত্রী শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — ''বিদ্যা যদি মনুষ্যত্ব লাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানব মাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে, তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।''

বাল্যকালের যান্ত্রিক বিদ্যালয় জীবনের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথকে পীড়ন করে। সেখান থেকে তিনি পালিয়ে বেঁচেছিলেন বিশ্বপ্রকৃতির উদার আতিথ্যে। তাই একসময় তিনি অনুভব করতে শুরু করলেন আমাদের দেশের গতানুগতিক নির্জীব শিক্ষাকে কিভাবে প্রাণবন্ত করা যায়। আশ্রম জীবনের রূপরেখায় সে এক তপোবনের চিত্র যা ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে মানসমূর্তি হয়েছিল, তা মূর্ত হয়ে উঠল শান্তিনিকেতনে ১৯০০ সালে। এক পূণ্য তীর্থের রূপ দিতে চেয়েছিলেন যেখানে সমগ্র বিশ্ব মিলিত হয়ে অনুভব করবে — 'এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।'

আজকের শিক্ষকদের রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে হবে বারে বারে। 'শিক্ষা ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য ধরা পড়েছে। মানব ইতিহাসের আনন্দময় অভিজ্ঞতার সহিত পরিচয় সাধন কল্পে বিশ্বজনীন প্রকৃতির রূপে শ্রদ্ধাশীল অনুভূতির ধারক বাহক — এই অভিপ্রেত উদ্দেশ্য — পরীক্ষা পড়া মুখস্থর প্রয়াস সেক্ষেত্রে গ্লানি মাত্র ও হানিকর সন্দেহাতীত।

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল : রাজনীতি তত্ত্বের আলোকে

কল্যাণ সান্যাল
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়

প্রায় বিশ্বায়িত একটি আর্থনীতিক শিক্ষাব্যবস্থায় সবকিছুই পরিবর্তনের একটি নতুন স্রোতধারায় অবগাহন সক্ষম হয়ে উঠছে। রাজনীতি কি ব্যতিক্রম হতে পারে? উত্তরটি প্রশ্নের গর্ভেই লুক্কায়িত (নাকি সোচ্চারিত?)। একবিংশ শতাব্দীর ভারত এক নতুন বিশ্বশক্তি হয়ে উঠতে চলেছে, এমন জল্পনা কুশলী প্রচার নিনাদ— এমন কথা অন্তত সরকার পরিচালকরা কেউ মনে করেন না। কিন্তু সেই কুশীলবদের মধ্যে উত্তরণের পন্থাপদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক অনুপস্থিত— একথা বলা যাবে না। এই মুহূর্তে সবিশেষ গুঞ্জরিত হচ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনন্ত সম্ভাবনার কথা। আশা-নিরাশার দোলাচলতার অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন নিশ্চয়। কিন্তু যা প্রায় সবার কাছেই উপেক্ষিত হচ্ছে, তা এর রাজনৈতিক দিক। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলকে যেভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে তা রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র গড়ে তোলার সামিল বলে মনে করা যায়। আর সে কথা যদি সত্যিই মনে করা যায়, তবে রাজনীতিশাস্ত্রের অন্যতম মৌল ধারণা সার্বভৌমত্বর তাত্ত্বিক পরিণতি কী হবে? রাষ্ট্র তার সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিয়েও রাষ্ট্রত্ব রক্ষায় সক্ষম— এমন যদি হয় তা মন্দ হয় না। কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজনীতিশাস্ত্রের নবপাঠ রচিত হবে।

সংকটে উপার্জনক্ষম নারীর স্বাধীনতা

মিঠু নাগ

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন

স্বাধীনতার যাট বছর পরেও লিঙ্গ-বৈষম্য এক সামাজিক ব্যাধি ভার্জিনিয়া উল্ফ্ নারীর একান্ত নিজস্ব space-এর কথা বলেছিলেন, সেখানে সে নিঃসঙ্কোচে মন ও চেতনাকে মেলে দিতে পারে। মেয়েদের এই অস্তিত্বের সন্ধান শুরু হয় উনিশ শতক থেকেই। নারী আত্মপ্রকাশ ও স্বাবলম্বনে পথে পা বাড়ায়। নারীও আজ অর্থোপার্জনকে আবশ্যিক মনে করে। কিন্তু অর্থ উপার্জন করলেই কি নারী স্বাধীন হয়? ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশে নারী-স্বাধীনতা আজও পাঠ্যপুস্তক ও গবেষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এ নিবন্ধে অর্থোপার্জনকারী কর্মরতা মহিলার স্বাধীনতার স্বরূপ অন্বেষণের প্রয়াস রয়েছে। বহির্বাটীতে কর্মরতা মহিলারা বিভিন্ন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ফলে তাদের সম্মুখীন হতে হয় নানাবিধ সমস্যার। প্রথমত উপার্জনের অধিকারী হলেই কি ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী হন নারী? দ্বিতীয়ত বিবাহিতা নারীর স্বামীর পরিবার কি তাঁর উপার্জন ক্ষমতাকে পরিবারের পুরুষ সদস্যের উপার্জন ক্ষমতার সম-মান্যতা দেয়? স্বামীর পরিবারে কর্মরতা মহিলার অবস্থান কোথায়? তৃতীয়ত কর্মস্থলে মহিলারা কি পুরুষের সম মর্যাদা পান? চতুর্থত সন্তানের কাছে কর্মরতা মা এবং কর্মরত বাবা কি সম অবস্থানে বিরাজ করেন? কর্মরতা মা-এর কাছে তাদের চাহিদা ঠিক কী? কর্মরতা নারীও কি আপন কর্মের কারণে সন্তানকে বঞ্চিত মনে করেন? সেক্ষেত্রে তাঁর নিজের কাছে নিজের অবস্থানই বা কোথায়? শেষতঃ কর্মরতা মহিলা কি তাঁর অর্থ-উপার্জনের মধ্যে দিয়ে আত্মপরিচয় ও অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন?

ভারতবর্ষের মত স্বল্পোন্নত অর্থনীতিতে সার্বিক উন্নয়নের জন্য পুরুষের সঙ্গে নারীর সমানভাবে অগিয়ে আসা প্রয়োজন। কিন্তু নারীকে ঊনমানব না ভেবে পূর্ণ মানবের মর্যাদা দিয়ে পুরুষের সমান সুযোগ সুবিধা দেবার জন্য একবিংশ শতাব্দীর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কি প্রস্তুত? আলোচ্য আলোচনাপত্রে কর্মরতা মহিলার সমস্যা ও নানা প্রকার দাসত্বের ওপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজকেই দিতে হবে সমাধানের পথ।

বিশ্বায়ন ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

তনিমা চৌধুরি

অধ্যাপিকা, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, বর্ধমান রাজ কলেজ

আমাদর ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে সমসাময়িক বিশ্বায়নের ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রকৃতি ও পরিধি এই বিশ্বায়নের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশ্বায়ন অবশ্য নুতন কোন ঘটনা নয়। প্রাচীন কালেও মানুষ তার জ্ঞান ও দ্রব্য পরস্পরের সাথে বিনিময় করত। উনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমীকরণ ও আধুনিকীকরণের হাত ধরে যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল— তাকেও আমরা বিস্তৃত অর্থে 'বিশ্বায়ন' বলতে পারি। কিন্তু সমসাময়িক বিশ্বায়নের দক্ষতা, গতি ও ক্ষমতা পূর্বেকার বিভিন্ন সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের তুলনায় অনেক বেশী। যে বিষয়টি বর্তমান বিশ্বায়ন ব্যবস্থাকে বিশেষভাবে গতিময় করে তুলেছে তা হল অভূতপূর্ব বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির উন্নতি বা উৎপাদন পদ্ধতি, যোগাযোগ ব্যবস্তা, মিথস্ক্রিয়া, সামাজিক সংগঠন, এবং আত্তিকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে। শঙর ও নগর সমাজে পরিবর্তনের এই ধারা অতি সুস্পষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের ছোট ও মাঝারি শহরগুলিতে জীবনশৈলীর বিভিন্ন দিকের ওপর বিশ্বায়নের প্রভাব অনুধাবন করাই হল এই গবেষণঅ পত্রটির মূল উদ্দেশ্য। একটু গবীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আজ আমাদের খাদ্য গ্রহণ, বেশভূষা, সাজসজ্জা, আন্তমানবিক সম্পর্ক্য, ব্যক্তিগত পছন্দ, ও বোগের মাত্রা ইত্যাদি প্রযুক্ত, বাজার ও গণমাধ্যম দ্বারা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। শিশু ও যুবসম্প্রদায়ের চিন্তা ভাবনা ও জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে এই প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। সমসাময়িক নগর-সমাজ ও তার প্রান্তিক অঞ্চলে যে বলিষ্ঠ ভোগবাদী শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে তা আমাদের ঐতিহ্যগত ভাবধারা, আদর্শ ও মূল্যবোধর ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সূচিত করেছে। বাজারী মূল্যবোধ ও প্রয়োজন আজ আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে। অবস্য এই ধরনের সাংস্কৃতিক ভূবনীকরণ বা সর্বজনীনতা সত্বেও বিশ্বায়ন পক্ষান্তরে স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় গঠনে সহায়তা করছে।

বিশ্বায়ন ও শিল্পায়ন

দুর্গেশ মুখার্জী
চিত্তরঞ্জন, আসানসোল

সারা বিশ্বে এখন বিশ্বায়নের হাওয়া বইছে। তার সাথে ভারতবর্ষও ব্যতিক্রম নয়। এবং দেরীতে হলেও পশ্চিমবঙ্গ মানে আমাদের রাজ্যতে প্রবলভাবে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের হাওয়া বইছে। সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে কৃষির পরে শিল্পায়নের উপর ইচ্ছা প্রকাশ করে বা পদক্ষেপ নিয়ে কিছু কিছু কাজ শুরু করেছেন। তার ফল সুদুরপ্রসারী।

হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে : ভারতবর্ষের আদিবাসিদের প্রেক্ষিতে একটি বিশ্লেষণ

মানব চক্রবর্তী

দীর্ঘকালীন বসবাসের সূত্রে, সংমিশ্রণের ফলে, নেগ্রিকেটুদের পৃথক অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় যে জনগোষ্ঠী অর্থাৎ কোল সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতে এসেছিল এবং তাদের ভাষা বিন্যাস— তা এখনও বর্তমান। যারা আদিবাসী নামে পরিচিত। এবং নিঃসন্দেহে এরাই ভারতের প্রধানতম প্রাচীন জনগোষ্ঠী। আর্যদের আগমন তার অনেক পরের ঘটনা।

উল্লেখ্য, সাঁওতাল, মুণ্ডা, গন্দ, খদ্, শবর, কুরকু, ভূমিজ, বীরহড়, হো, গোডার, কোরা ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলি কোল রেসেরই পরবর্ত্তী বিভাজন। এই জনগোষ্ঠীর পঞ্চাশ শতাংশেরও অধিক মানুষ আজকের যুগে সাঁওতাল ভাষায় কথা বলে।

আধুনিক সভ্যতার নির্মম রথ কিভাবে এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রসীমানর শেষ প্রান্তে ঠেলে দিয়ে এক অতি লজ্জাকর ও নতুনতর সংজ্ঞায় 'আধুনিক ভারতের সবচেয়ে সস্তার শ্রমিক, এই নামে ভূষিত করেছে তারই উন্মোচন এই লেখা, এই প্রাককথন।

ড. ক্যাম্পবেল, বিহার-উড়িয্যা জার্নালে ১৯১৬ খৃ. মার্চ মাসের সংখ্যায় সাঁওতালদের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে জানা যায় চাই-চম্পাতে বসবাসকালীন সাঁওতালরা মাধো সিং নামে একজন পরাক্রমশালী আধা-বুরহড় দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আইরিকেন্দায় আসে। এখানেও তাদের বসবাসের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। এরপর টাঁড়মাটির এই অঞ্চলে বর্ষণের পরিমাণ খুবই কম হওয়ায় তারা মরুপগাড়া, সেখান থেকে অম্বর, কাঁকের জঙ্গল, বাড়ে, বাবাগাঁও, কদমবেড়া, বেতাওঙ্গা, শিরদেশ ও শিখরদেশে যায়। এই শিখরদেশ থেকে তারা পালগঞ্জ, হাজারিবাগ, ডুমরি অঞ্চল, উত্তর মানভূমের টুন্ডি ও পাঁড়রা এবং তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং বসতি স্থাপন করে।

বিখ্যাত জাতিতত্ত্ববিদ ডালটনও বলেন যে সাঁওতাল জাতির আদি বাসস্থান হিহিরি পিপিড়ি তাতে সন্দেহ নেই। সেখান থেকে তারা হরদ্যুতি যায় এবং খেরওয়ার নামে পরিচিত হয়। তারপর খৈরাগর, হুরাদগাড়ি, এবং চাই ও চম্পাতে দীর্ঘকালীন বসবাসের সূত্রপাত ঘটায়।

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর প্রচরণ সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদ রিস্লের অভিমত দ্রষ্টব্য : The eartiest settlements which Santali tradition speaks of, those in Ahiri-Pipiri and Chai-Champa, lie on the North-Western frontier of the table-land of Hazaribagh and in the direct line of advance of the numerous Hindu immigrants from Bihar. That the influx of Hindu has in fact diriven the Santals eastward is beyond doubt, and the line which they are known to have.

হিহিরি-পিপিড়ি, খোজখামেন, চাই-চম্পা, শিরদেশ শিখর দেশে অবস্থানকালীন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের যে ইতিহাস আমরা জানতে পারি, বা তাদের ঐতিহাসিক, নৃতাত্বিক, ভূতাত্ত্বিক তথ্য নির্ভর যে যুক্তিগুলি আমাদের প্রভাবিত করে থাকে, তারও চেয়ে সুদূর অতীতে, বহু বর্ষ আগে, বা বলা ভাল প্রাক্-ঐতিহাসিক প্রস্তর যুগে মানুযেব বসতি স্থাপনের ও সেই সঙ্গে প্রচরণের যে ইতিহাস জানা যায় তাতে এই তথ্য প্রমাণিত যে ভারতবর্ষের আদিম জনগোষ্ঠী তো বটেই, পৃথিবীরও আদিমতম মানুযের কথা বলতে গেলে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ এসেই যায়।

এক্ষেত্রে, অর্থাৎ প্রাচীন আদিবাসীদের উৎপত্তিস্থল ও জীবন সম্পর্কে জানতে হলে নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করতে হয় এবং এই ধরনের গবেষণাধর্মী কাজের ক্ষেত্রে 'ভাষা' (প্রাচীনতম ভাষা, যার দ্বারা তাদের স্থান-কাল-পাত্র নিরুপণে যথার্থ সাহায্য লাভ করা যেতে পারে) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

যা দীর্ঘ দীর্ঘ যুগের প্রস্তরীভূত ইতিহাসকে নতুন আলোয় তুলে আসতে পারে।

প্রচরণশীল এই আদিম জনগোষ্ঠীর নিত্যনতুন বাস্তুত্যাগের ইতিহাস-ই আমার প্রধান আলোচ্য। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বহুমাত্রিক পরিবর্তনগুলি— সামাজিক, অর্থনৈতিক, (কৃষিভিত্তিক) সাংস্কৃতিক— ইত্যাদি সামনে রেখে আজকের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর 'আইডেন্টিটি কীভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে চলেছে বা একটি গরিমাময় ঐতিহাসিক প্রাচীন জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক দুর্দশার ছবি ফুটে উঠেছে তাদের প্রোটো-অ্যাস্ট্রলয়েড মুখের কুঞ্চিত পেশিতে, তারই ক্ষুদ্র প্রয়াস এই তথ্যালোচনা।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তেমন কোনও প্রারম্ভিক তথ্য পাওয়া যায় না যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আদিবাসীরা বস্তুতই সূচনালগ্ন থেকেই এই দেশে অবস্থান করছিল। বরং একথা ভাবার যথেষ্ট কারণ ও যুক্তি আছে যে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে এই জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দলে, কখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হেতু, কখনও জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে, বা কখনও গোষ্ঠীসংঘর্ষের অনিবার্য পরিণতিতে নানা দেশ ঘুরে মাইগ্রেটেড হয়ে ভারতে পৌঁছেছিল।

ভারতে সর্বপ্রথম আগত আদিবাসীরা হল নেগ্রিটি বা নেগ্রিকেটু। আজকের ভারতবর্ষে তাদেরর সন্ধান পাওয়া যায় না। কালের করালগ্রাস এবং আরও নানাবিধ গোষ্ঠীর সঙ্গে followed in their retreat, corresponds on the whole, with that attributed to them in their tribal legends. (Page 31, Linguistic survey of India Vol. IV by G. A. Grierson)

বোঝা যায় তাঁদের বারে বারে স্থান পরিবর্ত্তনের ইতিহাস নতুন নয়।

কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের বিভিন্ন সময় ভারি শিল্প নির্মাণের কারণেও তাদের বারে বারে স্থান পরিবর্তন করতে হয়ছিল বা আরও সোজা করে বললে বলতে হয় উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল।

সেই উদ্বাস্তু হওয়ার ইতিহাসও সুবিশাল।

প্রশ্ন, আজও কি সেই ধারা অবলুপ্ত হয়েছে? বা হয়নি।

ইতিমধ্যে বদলে গেছে সাঁওতাল গ্রামগুলির মানচিত্র এবং তাদের মানসিকতা। ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে সুদূর সাঁওতাল গ্রামে গিয়ে দেখেছি আজও সেখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই, নেই আলো, পানীয় জল, যাতায়াতের রাস্তা নেই অথচ মাটির বাড়িতে কোন্ মন্ত্রে যে পৌঁছে গেছে কোকোকোলার ছবি। পেপসির ছবি।

এ দৃশ্য আমায় অবাক করলেও স্তম্ভিত করেনি। কারণ এর পরেই জাততাড়া মহকুমার প্রত্যন্ত সাঁওতাল গ্রাম মুর্গাডিতে গিয়ে দেখি দেড়শো লোকের একটা গ্রামে সবাই সামার ডায়ারিয়ায় শয্যাগত। উঠে দাঁড়াবার শক্তি নেই। কিন্তু গাছের ডালে লটকানো শাহরুখ খানের সিনেমার পোস্টার।

পৃথিবী জোড়া বিশ্বায়নের হাওয়া কার শরীরে কোন সান্ত্বনার প্রলেপ দেয় জানি না, সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর তাতে কোনও লাভ হয় বলে জানি না। এটা মনে হয়, সভ্যতার রথ চিরকালই মানুয়ের হাড়গোড়ের উপর দিয়ে চলে।

উন্নয়ন ও লিঙ্গ বৈষম্য

অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ
সমাজতত্ত্ব বিভাগ, বর্ধমান

লিঙ্গগত সাম্যের ধারণা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তথাপি বাল্য বিবাহ, পণপ্রথা, মেয়ে ও শিশু পাচার, মহিলাদের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের মতো অপরাধের ঘটনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো ভারতেও এখন বাড়ছে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী ১৯৯৫ সালে দেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের সংখ্যা ছিল ১০৯২৫৯। ২০০৫ সালে এই সংখ্যা ৪২.৩৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৫৫৫৫৩। বিগত কয়েক দশকে দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাফল্য তাহলে লিঙ্গ অপরাধকে সীমিত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। বিভিন্ন নারী সংগঠন, এনজিও এবং নীতি নির্ধারকদের কাছে তাই মহিলাদের প্রতি হিংসা একটি প্রধান সমস্যা হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যে বিগত তিন দশকে সংগঠিত ভাবে আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রয়াস সত্ত্বেও মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের ঘটনা ও তার মাত্রা জাতীয় অনুপাতের তুলনায় আজ অধিক। শুধুমাত্র সচেতনতার মাত্রার তারতম্যের ভিত্তিতে এই পার্থক্যকে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। বর্তমান গবেষণাপত্রটিতে লিঙ্গ অপরাধের এই চিত্রটিকে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে আলোচনার চেষ্টা হয়েছে এবং এই সমস্যার সম্ভাব্য কারণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

উন্নয়ন ও পরিবেশ/বাস্তু সংস্থান

অনন্ত কুমার বিশ্বাস

অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ, তারকেশ্বর, হুগলী

উন্নয়ন ও পরিবেশেব মধ্যেকার বিতর্ক সমসাময়িক সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির স্বার্থে একদিকে যেমন প্রয়োজন উন্নয়ন, তেমনি এটিও সঠিক যে আজকের পরিবেশের সমস্যার একটি প্রদান কারণ হলো উন্নয়নের প্রচলিত মডেল। বিগত কয়েক দশক ধরে তাই পরিবেশ বিজ্ঞানী, বেসরকারী সংস্থা এবং সরকারী নীতি নির্ধারকদের কাছে দীর্ঘস্থায়ী বা বিকল্প উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অতি আবশ্যিক বলে মনে হয়েছে। বর্তমান গবেষণা পত্রটিতে পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের (কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র) পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে আলাকপাত হয়েছে। এটা সর্বজনবিদিত যে কে.টি.পি.এস পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ চাহিদার বৃহৎ যোগানদার এবং বিদ্যুতের যোগান ছাড়া কোন উন্নয়ন প্রকল্প সফল হতে পারে না। অথচ এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে যে ছাই নির্গত হয় তা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পরিবেশ দূষণ যেমন জল দূষণ, বায়ু দূষণ, এমনকি মাটির উর্বরতা শক্তি নয় করার অন্যতম কারণ। তাছাড়া ছাই মিশ্রিত জল রূপনারায়ণের জলে মিশে ঐতিহ্য গত ইলিস সহ অন্যান্য মাছ, জলজ আনুবিক্ষণিক ইত্যাদি, এককথায় জৈব বেচিত্র ধ্বংস করছে। এছাড়া জলস্তরও নেমে যাওয়ায় সেচ সমস্যা, জমির উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পেয়েছে এবং ঐতিহ্যগত পানচায, ফুলচায ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংস হয়েছে। আবার দরিদ্রতা, ভূমিহীনতা, অভিভাষণ, সামাজিক অপরাধ ইত্যাদি বিবিধ পরিবেশ ও সামাজিক সমস্যারও উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান গবেষণাপত্রে প্রচলিত উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার বা সমাধানের বিযয়ে আলাকপাত করা হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞান পরিচর্চা ও গবেষণা সংসদ এবং দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়, চিত্তরঞ্জন-এর যৌথ প্রয়াসে আয়োজিত সমাজবিজ্ঞান মহাসম্মেলন ২০০৭-কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সুচিন্তিত মতামতে আলোকিত হোক পারিপার্শ্ব। সর্বোপরি এই সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

শ্রী বিনয় মুর্মু
প্রধান

রূপনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে, সর্বশিক্ষা অভিযান সফল করতে, বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর আর্থিক উন্নতি বিধান ও জনগণের সঙ্গে থেকে একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করাই আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত লক্ষ্য।

শ্রীমতি ভবানী মন্ডল — উপপ্রধান
শ্রী জগদীশ মালাকার — প্রধান

জিৎপুর উত্তররামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান মহাসম্মেলন ২০০৭ অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য শুভেচ্ছা জানাই।
এই সমাজবিজ্ঞান মহাসম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সার্থকতা ও সাফল্য কামনা করি।

সেলিম মিঞা
প্রধান

আল্লডি গ্রাম পঞ্চায়েত

* সোনার বাংলা গড়ার কাজে ব্রতী হোন।
* প্রতিটি গ্রামসভা ও গ্রাম সংসদে উপস্থিত হয়ে আপনার মূল্যবান মতামত প্রদান করুন।
* নির্মল গ্রাম গড়তে সকলে এগিয়ে আসুন।

নিখিল দে — উপপ্রধান
আলোক বাউরী — প্রধান

এথোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে সমাবিজ্ঞান বিষয়ে এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে জেনে আমরা আনন্দিত। সম্মেলনে আলোচিত বিষয়গুলিকে পাথেয় করে আমরাও সমাজ মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। এ কথা সর্বজনবিদিত যে সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সর্বাঙ্গীন ফলপ্রসু হতে পারে না।

সেক্ষেত্রে সকলের জন্য শিক্ষা এবং সার্বিক স্বাস্থ্য বিধান কর্মসূচীগুলির সার্থক রূপায়নে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে বিশেষ করে মহিলাদের সাথে নিয়ে সমাজ পরিবর্ত্তনের লক্ষ্যে এই পঞ্চায়েত সমিতি অঙ্গীকারবদ্ধ। এই মহাসম্মেলনের মধ্য দিয়ে সমাজের বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছাক, এই আশা করি।

সাথে এই মহাসম্মেলনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

শঙ্খ সাঁতরা
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
সালানপুর

শিপ্রা মুখার্জ্জী
সভাপতি
সালানপুর পঞ্চায়েত সমিতি



For the first time, STD calls between state capitals at just Rs. 1.20 for 3 minutes with the Hello Capital Plan.

Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Delhi, Dehradun, Gangtok, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Panjim, Patna, Port Blair, Raipur, Ranchi, Shimla, Thiruvananthapuram.

Reliance Hello – Savings across state capitals

	Cost per call (Rs.)		You Save	
Call duration	Ordinary Landline	Reliance Hello	Rs.	%
	Rs. 2.40 / min**	Rs. 1.20/3 mins		
3 minutes	7.2	1.2	6	83%
9 minutes	21.6	3.6	18	83%
15 minutes	36	6	30	83%
30 minutes	72	12	60	83%

Advantage Reliance Hello

Features	Ordinary Landline	Reliance Hello
Phone Book with Caller ID	×	✓
Polyphonic Ringtone	×	✓
SMS	×	✓
Voice Mail	×	✓
Call History	×	✓
Internet	×	✓
Carry it anywhere in the city	×	✓

Say a big Reliance Hello and bye bye to STD!

RELIANCE Hello

Call 3033 3333

Conditions apply. *Local calling @ Rs. 1.20 for 3 mins is applicable only on calls between Reliance Hello phones having "32" no. series, between the cities mentioned above. For more information, visit your nearest Reliance World or Reliance Communication outlet. Internet option available on select phone models only. Scheme applicable on all existing Reliance Hello postpaid plans & prepaid recharge cards except on 795 recharge card. **MTNL Calls between Mum - Del @ Rs. 1.20/3 mins.

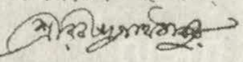
MUMBAI: West Zone :23X18cms

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কল-২০

নিজের সংগ্রহ ও উপহারের সেরা বই

সঞ্চয়িতা ২ ২০০



সম্পাদনা : অরুণকুমার বসু

সঞ্চয়িতা-র বাইরে রবীন্দ্রনাথের সেরা কবিতার আরও একটি সংকলন

অভিধান ও কোশগ্রন্থের মহার্ঘ সম্ভার

আকাদেমি বানান অভিধান
ষষ্ঠ সং ১২৫

প্রশাসন পরিভাষা (৪র্থ সং) ৫০

সাহিত্যের শব্দার্থকোষ ৪০ সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা ৪০ সুভাষ ভট্টাচার্য

বুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ-বাংলা কোশ ১০০ সুকুমার সেন

বাংলা ভাষায় অর্থনীতিচর্চা গ্রন্থপঞ্জি ৫০

বাংলা ভাষায় ইতিহাসচর্চা গ্রন্থপঞ্জি ৮০

ধাতুবিদ্যা পরিভাষা ৫০ গোকুলানন্দ মুখোপাধ্যায়

বিবিধবিদ্যার উজ্জ্বল সংগ্রহ

বাঙালীর সংস্কৃতি (ষষ্ঠ মুদ্রণ) ৩০
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলার চিত্রকলা (২য় সংস্করণ) ১৫০
অশোক ভট্টাচার্য

শিল্পী ও রূপকলা ৪৫ চিন্তামণি কর

মহাকাশ ৪০ জ্যোতির্বিজ্ঞান ৭০
রমাতোষ সরকার

শিশু ও কিশোরদের জন্য

ছড়াসমগ্র ১ম ১০০ ২য় ১০০ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ছড়া এবং ছড়া ৭০ অমিতাভ চৌধুরী

মিষ্টি ছড়া টাপুর টুপুর ৪০
তৃতীয় বিশ্বের কিশোর গল্প সংকলন

জিয়নকাঠি ৮০ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
গল্প-কবিতা-নিবন্ধ-নাটিকের সংকলন

আকাশ প্রদীপ ১৪০
শ্যামল চক্রবর্তী সম্পাদিত



আরো অনেক গল্প-কবিতা সঙ্গে নিয়ে নতুন করে প্রকাশিত হল

আলোর ফুলকি ১২০

কবিতার বই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা
সম্পাদনা : যুগান্তর চক্রবর্তী

গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ (বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়) ৫০
শঙ্খ ঘোষ

কৈফি আজমির কবিতা
ভাষান্তর ও সম্পাদনা : জ্যোতিভূষণ চাকি

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র ১০ খণ্ড প্রকাশিত



অপ্রকাশিত গল্প ও কিশোর রচনা নিয়ে প্রকাশিত হবে একাদশ খণ্ড

কিশোর রচনাসংগ্রহ
সম্পাদনা : পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

উনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিশশতকের প্রথমার্ধের ভাষা-ভাবনা ধারণ করে ৩৭টি প্রবন্ধের সংকলন

ভাষাভাবনা : উনিশ-বিশশতক

প্রসঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ ৮০
পুরাতন পত্র-পত্রিকা থেকে ব্যাকরণ-বিষয়ক ২০টি নিবন্ধের সংকলন

প্রসঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ ২
সমকালীন ভাষা ও ব্যাকরণ-ভাবুকদের আলোচনা সংগ্রহ

সাঁওতালি ভাষার সহজপাঠ ৭০
ধীরেন্দ্রনাথ বাসকে অনিমেষকান্তি পাল

মহার্ঘ প্রবন্ধ সম্ভার

বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সমগ্র ১ম খণ্ড ১৫০

রেজাউল করিমের প্রবন্ধ সংগ্রহ ১৫০

জ্যোতি ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ সংগ্রহ ৭০

যুগের যন্ত্রণা : প্রত্যয়ের সংকট ৭০
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একগুচ্ছ বই

রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সবুজপত্র ৩০
অন্নদাশঙ্কর রায়

ভক্ত ও কবি
অজিতকুমার চক্রবর্তী-রবীন্দ্রনাথ পত্রবিনিময়
সম্পাদনা : রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

কল্যাণীয়েষু প্রশান্ত ১২০
রবীন্দ্রনাথ-প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ পত্রবিনিময়
সম্পাদনা : প্রশান্তকুমার পাল

রবীন্দ্র-অনুব্রতী সতীশচন্দ্র রায় ৯০
সম্পা. পুলিনবিহারী সেন অনাথ নাথ দাস

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ (৩য় মুদ্রণ) ১৫০
সম্পাদনা : অরুণকুমার বসু

রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল পুরস্কার ৬০
সম্পাদনা : বিজিতকুমার দত্ত

কবির অভিঘাত ও কবির নাটক ৩০
কুমার রায়

Tegore a Study 90.00
Dhurjati Prasad Mukhopadhyay

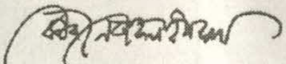
কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ৬০
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আলেখ্য গ্রন্থ

মুক্তির সংগ্রামে ভারত ১২৫

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

অগ্রণী সারস্বত প্রতিষ্ঠান



রচনাসমগ্র

১ম ১৬০, ২য় ১৬০, ৩য় ১৮০, ৪র্থ ২০০, ৫ম ২০০, ৬ষ্ঠ ২০০, ৭ম ২৫০

মোট দাম ১৩৮০ টাকা।

সাত খণ্ড একসঙ্গে ১০০০ টাকা। এই সুযোগ কলকাতা বইমেলা পর্যন্ত বহাল থাকবে।

সংকলন গ্রন্থের দ্যুতিময় সম্ভার

আকাদেমি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ভাষা সংকলন ১২৫

আকাদেমি ভাষণ সংকলন

বাঙালির গান ৭০০ দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত

পুরাতন গদ্যগ্রন্থ সংগ্রহ ২০০
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ

১ম খণ্ড (উনিশ শতকের গণ-আন্দোলন) ২৫০

২য় খণ্ড (উনিশ শতকের নারী-আন্দোলন) ৪০০
সম্পাদনা ও সংকলন : স্বপন বসু

মনস্বী অন্নদাশঙ্কর (২য় সং) ১০০
ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত

বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ ২০০ (১৮১৫-১৮৫৫)
আশিস খাস্তগীর সম্পাদিত

গল্পের বই

প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ (৩য় সং) ১৫০

সোমেন চন্দ নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ ৬০

সম্পর্ক (সম্প্রীতি বিষয়ক গল্পসংগ্রহ) ১৫০
সম্পাদনা : অশোককুমার মিত্র বিশ্বু বসু

সাহিত্যের ইতিহাস ও ইতিহাস নিয়ে

রুশ সাহিত্যের ইতিহাস ২৫০ অরুণ সোম

হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস ৮০ রামবহাল তেওয়ারী

কলকাতা : ইতিহাসের উপাদান
নিশীথরঞ্জন রায়

জানা-অজানা মহাফেজখানা
উদয়ন মিত্র

জীবনী ও আত্মজীবনী

দেশবন্ধু কন্যা অপর্ণাদেবী লিখিত **মানুষ চিত্তরঞ্জন**
নতুন করে প্রকাশিত হল

আমার সাহিত্যজীবন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নজরুল-জীবনী ১৬০ অরুণকুমার বসু

জীবনানন্দ দাশ ১৩০ প্রভাতকুমার দাশ

সত্যজিৎ রায় ১৫০ পার্থ বসু

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮০ জ্যোতিভূষণ চাকি

প্রাপ্তিস্থান : বইঘর : রবীন্দ্রসদন, কফিহাউস, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, মধুসূদন মঞ্চ
দূরভাষ : ২২২৩-৯৯৭৮, ২২২৩-১৯৮৫, ২৩৭৩-০৪০৭ ফ্যাক্স : ২২২৩-০৯৪৬
ই-মেল : bakademi@vsnl.com ওয়েবসাইট : paschimbangabanglaakademi.org